SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal.

Chief Editor : Dr. Jaygopal Mandal
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

ISSN:2394 4889 Vol : III, Issue : VI 31 July 2017

" বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার।
উদিবে অরুণ ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার!
ভারত ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার।"

—কাজী নজরুল ইসলাম

"সবুজ কাগজে সবুজেরা লেখে কবিতা
পৃথিবী এখন তাদের হাতের মুঠোয়।"

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Published by : *Dr. Jaygopal Mandal,* C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara, Hirapur,
Dhanbad, Jharkhand, Phone : 09830633202/09570217070
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, jaygopal_1969@rediffmail.com
sahityaangan@gmail.com, Website : www.sahityaangan.com

সাহিত্য অঙ্গন — ড. জয়গোপাল মণ্ডল

সাহিত্য অঙ্গন

ISSN:2394 4889
Vol : III, Issue : VI
31st July 2017
DIIF Impact Value :1.028
Frequency : Halfyearly

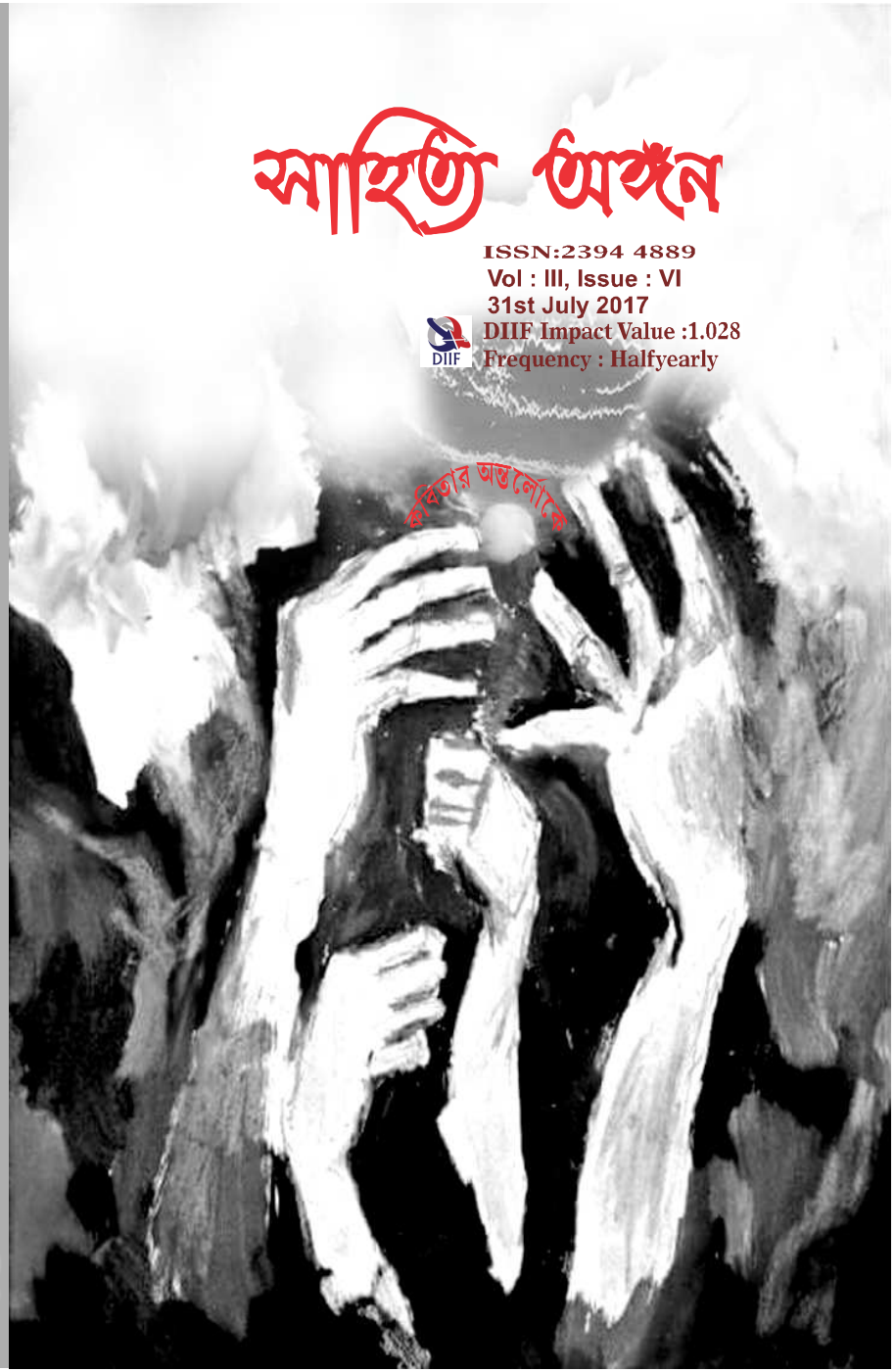

সাহিত্য অঙ্গন

(সাহিত্য আংগন // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028

Vol. : III, Issue : VI, 31st July, 2017

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ

শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal

ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028

Vol. : III, Issue : VI, 31 July 2017

Chief Editor :

Dr. Jaygopal Mandal

C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,

Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

Assistant Editor :

Dr. Subhankar Roy, Dr. KutubUddin Molla, Dr. Samaresh Bhowmik, Dr. Mausumi Saha

Working Editorial Board :

Dr. Sandip Mondal, Dr. Manaranjan Sardar, Jayanta Mistri, Sampa Basu, Dr. Soma Bhadra, Dr. Debashree Ghosh, Dr. Sovana Ghosh, Maloy Mondal

Members from the other Countries :

Dr. Gulam Mustafa (Chittagong University, BanglaDesh)

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, BanglaDesh)

Professor Himadri Sekhar Chakraborty (USA)

Professor Barsanjit Mazumder (USA)

Advisory Board :

Dr. Tapas Basu, Dr. Suranjan Middey, Dr. Prakash Kumar Maity, Dr. Suman Gun, Dr. K. Bandyopadhyay, Dr. M. M. Panja, Professor A. Ghosal, Dr. A. Bhattacharya, Dr. N. Ghosal

© Dr. Jaygopal Mandal

Type Setting :

Manik Kumar Sahu,

Kolkata - 152

Phone : 9830950380

Price : ₹ 200.00

Published by :

Dr. Jaygopal Mandal

C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,

Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

Phone : 09830633202/09570217070

E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, sahityaangan@gmail.com

Website : www.sahityaangan.com

বিষয় তালিকা

তাপস রায়—ঊনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিবিভাষার দ্বন্দ্বে বদ্ধ বিরহী মধুসূদন /৭

সুমিতা চক্রবর্তী—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও কবিতা বিচার/১৫

সুমন গুণ—বাংলা ভাষাচর্চায় গদ্য আর কবিতার অন্তর্ঘাত/৩৩

আনসার উল হক—ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ঃ এক উপেক্ষিত ও বিস্মৃতপ্রায় শিশুসাহিত্যিক/৪০

বিজিত ঘোষ—ফুল ঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা' ও অন্যান্য কবি/৪৭

জয়ন্ত মিস্ত্রী—Kwe Kwj`vm ivq : Dcjväi mZZvq/৫৭

হাবিব সরকার—জীবনানন্দের অন্ধকার চেতনা/৬৮

বল্লরী রায়চৌধুরী—'আমি' 'তুমি' ও 'সে' ঃ জীবনানন্দ দাশের কবিতা/৭৪

মদনচন্দ্র করণ—কবিবর জীবনানন্দ দাশ ঃ বাংলা আধুনিক কবিতার অপার বিস্ময়!/৮০

সোমাভদ্র রায়—কবিতার রূপ রসে সুকুমার রায়/৮৬

দীপঙ্কর আরশ—অব(য়ী বন্ধ্যাত্বের রূপকার - সমর সেন/৯৯

বাসুদেব হালদার—ভাষাগত বিচলনের আলোকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা /১০৮

মধুশ্রী সেন সান্যাল—আধুনিক কবিতা ঃ মেয়েদের কলমে/১২০

মিষ্টু সামন্ত—সত্তাতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় শৈশব অন্বেষণ/১৩১

রাসবিহারী দত্ত—কবিতায় কৃতি-বিকৃতি ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/১৩৬

মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা—জসীমউদ্দীন ঃ পল্লীকথার রূপকার/১৫১

পীযূষকান্তি অধিকারী—কবিতার যোগ-বিয়োগে 'গণিতের শূন্য' ঃ কবি বিনয় মজুমদার/১৬৬

চন্দনা মজুমদার—কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়/১৭৫

শম্পা বসু—শঙ্খ ঘোষ ঃ বাংলাদেশের স্মৃতির আত্মপ্রক্ষেপ/১৮৫

জয়গোপাল মণ্ডল—কবিতার রাজপথে 'অভিশাপ'/২০৭

স্বরাজ কুমার দাশ—'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা/২১৯

মলয় মণ্ডল—সবুজ আলো জেগে থাকে, কবিতার পাশে/২২৭

মৌসুমী সাহা—প্রকৃতির পাঠলিপি ঃ আল মাহমুদের কবিতা/২৩৭

নীপছায়া মণ্ডল—নবারুণ থেকে পুরন্দর ঃ কবির ফ্যাতাড়ু জন্ম/২৪৬

রিজওয়ানা নাসিরা—কবি রাম বসু ঃ মানবতাবাদী ও প্রতিবাদী কবি/২৫৪

মেহেবুব হোসেন—যুদ্ধক্লান্ত নিঃসঙ্গ বিবিক্ত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত/২৬০

পুতুল বৈদ্য—স্বাধীনতা তুমি ঃ শামসুর রাহমান/২৬৫

সুদীপ্ত ঘোষ—বিনয় মজুমদারের কবিতায় গণিত ও বিজ্ঞান ভাবনা /২৭১

নিত্যানন্দ মণ্ডল—শঙ্খ ঘোষের কবিতা ঃ 'অন্ধবিলাপ'/২৭৮

প্রসঙ্গ

হাঁসা মেঘে বৃষ্টি হয়, শ্রাবণের বারি ধারায় নবজন্মের স্ফূর্তি। কিন্তু ভুমণ্ডলের ওপর কুচ্‌কুচে কালো মেঘের পাহাড় ঘুরছে। **মানুষ** হা-পিতোশ করছে, পিপাসার্ত, পায়ের তালুতে কালো কালো দাগ, বদ রক্ত জমাট বেঁধেছে রাজপথে, ম্যাঞ্চেস্টারে, সিরিয়ায়—কেবল হুঙ্কার উত্তর কোরিয়ার, চীন, আমেরিকার— এ বিশ্বে কেবল দাদাগিরি চলছে, নতুন উৎপাত—আই. এস. আই., তীর্থযাত্রীরা মৃত্যুর মুখে—জঙ্গি সংগঠনগুলো কোন্ সূর্য চায়, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিশ্ব-উষ্ণায়নের থেকেও ভয়ংকর। তবুও কবিদের কাব্যে মানুষ স্বপ্ন দ্যাখে, রচনা করে পথ—নতুন নতুন দর্শন শাশ্বত হয়ে ওঠে।

রাজনীতি বড় বালাই, কাউকে ছাড়ে না। গণতন্ত্রের নামাবলীতে ক্ষমতার লালসা লক্‌লক্ করে। কর্মহীন যুবক দিশেহারা, মৃত্যু হয় শৈশবের। যে লোকটা পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে, যে নারী মুখে রক্ত তুলে বাবুর বাড়ি সাজিয়ে তোলে, যে শিশুটা পশুর আঁচড়ে সূঁচবিদ্ধ, যে শ্রমিক কাজ না পেয়ে ভিক্ষার পাত্র হাতে রাস্তায়, যে কৃষক আত্মহত্যা করে—তাদের নিয়ে কোন হুঁশ নেই রাজমন্ত্রীদের, অথচ ধর্ম নিয়ে ভোটের বিপণনে মাতাল। হে জ্ঞানপাপী ধর্ম রক্ষা নয়; সেবাই পরম ধর্ম—সে ধর্মের কোনো নিশান হয় না, কোনো রং হয় না—তার মূর্তরূপ মনুষ্যত্ব।

আজকের জীবন-সংকট—ধর্ম আর রাজনীতি—দুই নামাবলী পরস্পর গলাগলি করে। লড়াই চলছে। মধ্যবিত্তের চৈতন্যের, বিভ্রান্তিও বাসা বাঁধছে, কিন্তু কবি শিল্পীরা হতাশাবিলাসী নন; বহু বর্ণের দৃষ্টিতে নতুন পথের সন্ধানে মগ্ন—যে বলে গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হওয়া যায়, সে তো গরুরও অধম। মাপ্ করবেন গরুকে যাঁরা মাতা মানেন, এই মান্যতার হয়তো দোষ—গরুর দুধেই তো মানব জীবন পালিত হয়, তা বলে রক্ত-মেঘে সবুজ অরণ্য যেন রক্তাক্ত না হয়।

আজকের শিশু জেগে জেগে দানবের ছায়া দ্যাখে, কবরস্থ হয় তান্ত্রিকের ধারালো নখে, নারী যতবার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে—ততবার ভয়ঙ্কর দাঁত-নখ তার ঘুম ভাঙিয়েছে। এবার পঞ্চকন্যা নিজের বিনাশী শক্তি দিয়ে ধর্মের নগ্ন শাসনের শৃঙ্খল খুলে ফেলেছে, জীবন হয়েছে জয়ী। সময়টা ইস্পাতের গরম তাপে যতই গলন্ত হোক না কেন, সূর্যকে যতই কয়লামেঘ ঢেকে ফেলুক—সব মিথ্যে হয়ে যায় মানুষের সংগ্রামে। সত্যি চাঁদের জ্যোৎস্না আর রক্তরাঙা সূর্যাস্তের পর নদীর বাঁকে বাঁকে ফিরে ফিরে আসে নতুন সূর্যোদয়। রঙ ফুটে ওঠে বড় ক্যানভাসে, ঋতুরঙ্গে রঙবেরঙের চালচিত্রে ভ্রমর খেলা করে, কবিতা-গল্প-ছবি জীবনের চলার পথ আলোকিত করে।

বাংলা কবিতায় সে পথের রাজকীয় সন্ধান আছে, তাই এ সংখ্যায় সেই কবিদের কলমের রেখা ধরে ধরে বিশিষ্ট লেখকের গদ্যে মানবতার স্বর্গে যাওয়ার প্রয়াস। মননশীল লেখাগুলিতে সেই চিন্তার প্রকাশ। সেই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রতি পত্রিকার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা রইল।

ড. জয়গোপাল মণ্ডল
৩১ জুলাই, ২০১৭

EDITORIAL

Rain comes out of light cloud, new creation springs out of the heavy rain of the month of Shravan. But the deep black clouds hover over the earth. The people feel the pain of frustration. They are thirsty with the soles wearing black patches, pool of polluted blood cover the royal road– Manchester, Syria North korea, China America creating panic–The world is torn by musclemanship, ISI being the new violent yield. The pilgrims are in jaws of death– What do the warring organizatins want? The national Calamity is more threatening than even global temperature. People dream of a better life in the poetry which nurtures deep philosophies paving ways for a peaceful, cosy, comfortable life.

Politics and humans are inseparable entities Republic is a mere means to an end of fulfilling one's vested interest. An idle youth is like a radarless boat. The ministries do not have any sympathy for those children who are treated inhumanily, the labourers without job and women with painstaking labour for the making a good household and for the troubled farmers meeting their untimely death. However, these political mentors feel no shame using religion for being in powers.

To work for humanity irrespective of caste creed and community is like service to god, which is pure, selfless and full of sacrifice.

Today's trajedy is that politics has embarced religion not for humanity, but for a vested interest of prowerful individuals. The intellectuals are restless to come out of mess by creating an awareness through their art and literature. The poets are never pessimists and are always in creating new apportunities and scopes. One who relies on others' sermon are even worse then the dumb-driven-cattle.

Today's infants are in the shadow of the demons and satans and are being buried by the selfish design of the pagan tantriks. The more the women try to come out of the dark velis the worse their condition become. The five muslim women, by the use of their increadible power, exposed the arbitrary, conservative religious connentions and proved victorios in the battle of life against the evil designs of the conservatives. However powerful is the enemy and the conditions adverse, a revolution with commitment destroys it all (Tin-Talak). I feel proud to quote a great 19th DC English poet P. B. Shelley who said, "If winter comes, can spring be far behind?"

In order to set things right, the Bengali poetry is on incessant research bringe and hope a dawn of peace, pleasure and brotherhood will brighten the whole society by the efforts of the poets and artists.

Dr. Jaygopal Mandal
Chief Editor

Translated from Bengali into English by : **Dr. M. K. Pendey**

তাপস রায়

উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিবিভাষার দ্বন্দ্বে বদ্ধ বিরহী মধুসূদন

কবি অরুণ মিত্র-র লেখা 'বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও আধুনিক কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধে মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আমার একটি ভাবনাকে উসকে দেয়। ভাবনাটা এরকম যে মধুসূদন আমাদের উপনিবেশিক শাসন-সংস্কৃতির একটি প্রতিভূ চরিত্র, যাঁকে শুধুমাত্র ইংরেজদের ভাষা মাধ্যমটিকেই আশ্রয় করতে হয়নি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও তার পুরোধাদেরও সামলে রাখতে হয়েছিল। আমাদের মনে থাকবে হোমার, দান্তে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ, মিলটন-এর কথা। এপ্রসঙ্গ যে কথাটা পেড়ে রাখা জরুরি, যে সমাজ পরিস্থিতি এবং জীবন-পরিবেশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যিক সংবেদনার প্রকৃতি বদলে যায়, সেই বদলটা ১৯ শতকে আমাদের পর্বান্তর ঘটায়নি। আমাদের মনে থাকবে গীতাঞ্জলী-উত্তর রবীন্দ্রকবিতার ইংরেজীমূর্তি সম্পর্কে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর অখুশী হওয়ার কথা। রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখে শব্দ ধরে ধরে অনুবাদ শুনে ওকাম্পোর মনে হয়েছিল নতুন জগৎ খুলে গেছে তাঁর সামনে। কিন্তু পরদিন যখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের উপযোগী করে কবিতাটিকে লিখিত দিলেন, ওকাম্পোর মোহভঙ্গ ঘটল। বললেন, "কাল যা পড়েছিলেন তার অনেকটাইতো দেখছি নেই এর মধ্যে। এমন সব ব্যপার ছেড়ে দিয়েছেন যা ছিল কবিতাটির প্রাণ।" মধুসূদন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রস্মরণ এজন্য যে বাংলাভাষার, তার অক্ষররূপের সাথে যে ভাবটি মিলিত হতে চায় তা ইংরেজিভাষার অনুকুল নাও হতে পারে। আর প্রথম থেকেই মধুসূদন তাঁর ভাবনাকে ইংরেজির দিকে প্রেরিত করে একটি নিশ্চিত বিরহকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

আমরা ১৯ শতকের পর্বান্তরের কথা বলছিলাম, বুদ্ধিবিভাষায় কলকাতা রেনেশাঁর যোগসূত্র সহ। তখন আমাদের কবিরা পর্বান্তরের পাঠ নিচ্ছেন বিদেশী কবিদের কাছ থেকে। বই পড়ে। শেলি, কীট্স, বায়রণ, ওয়ার্ডসয়ার্থদের কাব্য পড়ে অনুসরণ, অনুকরণ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাতে কি সঙ্গতির অভাব ধরা পড়েনি! অর্থাৎ আমাদের স্বদেশী ধর্মসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে বিদেশী ধর্ম-সংস্কৃতির ও প্রেরণার একটা ককটেল ১৯ শতকের বাংলা গ্রহণ করল যাতে আন্তর সংযোগের বিপরীতে আবেগ তাড়না প্রধান। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'-এ ভারতীয় রামায়ণ সরে গেছে, তিনি চাইছেন বড়ো বড়ো করে চরিত্র আঁকতে। গ্রীসদেশের ওরকম যোদ্ধা, দেবতা নির্ভর নয়, আত্মনির্ভরশীল। তাকে ভালো হতে হবে, তাকে ভারতীয় পুরাণের নায়কদের মতো জিতে যেতে হবে এমন কথা নেই। ফলে মিল্টনের শয়তান চরিত্রটির পাশে দাঁড়িয়ে মধুসূদন অনায়াসে

বলতে পারেন, 'He is Satan Himself'। মধুসূদন চেয়েছিলেন একজন গ্রিক যেমন করে লিখতে পারে, তেমন করে রামায়ণ, বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের মতো করে নয়। গ্রিকদের হিরোয়িক কোডকে বাংলায় নিয়ে এলেন। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে 'মেঘনাদবধ'কাব্যের প্রথম সর্গ লিখে ফেলার পর চিঠিতে বলেছেনও, যে তাঁর খুব ইচ্ছে হয় গ্রিক পুরাণের অসাধারণ সৌন্দর্যময় অংশগুলিকে আমাদেরই পৌরাণিক কাহিনির জগতে নিয়ে এসে দৃঢ় ও গভীর করে রোপণ করেন। আপাতত 'মেঘনাদবধ'কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে নিজের খুশী মতো প্রয়োগ করতে তাঁর ইচ্ছে জাগছে এবং বাল্মীকির কাছ থেকে যথাসম্ভব কম ঋণ করাই তাঁর পক্ষে ভালো মনে হচ্ছে।

মধুসূদনের এই বিলেতিয়ানার প্রশ্নে আমাদের মনে করতে হচ্ছে ঐতিহাসিক কোশাম্বির কথা। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে তিনি জানাচ্ছেন, "The most noticeable feature of the Indian city bourgeoisie is the stamp of the foreigner.....The intellectual apes the latest British fashions not only in clothing but even more in the literature and the arts." ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করার জন্য ভৃত্যদের ভাষা গড়ে তুলতে চেয়েছিল, এদেশের মাটিতে সাহিত্য সৃষ্টির উপযুক্ত গরীয়সী ভাষা তৈরির কোনো সদিচ্ছা তাদের ছিল না। হ্যাঁ, ইংরেজ সান্নিধ্যে, তাদের প্রশাসনিক সান্নিধ্যে কিছু প্রতিভার স্পর্শে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের স্ফূরণ আসছিলো। সেটা পোষা কুকুর জীবনের বাইরের যা কিছু সঞ্চয়। এখানে আরো একটু উদ্ধৃতির কাছে আমরা আনত হই "Wherever colonization is a fact, the indigenous culture begins to rot. And among the ruins something begins to be born which is not a culture but a kind of subculture which is condemned to exist on the margin allowed by an European Culture.This then becomes the province of a few men, the elite, who find themselves placed in the most artificial condition, deprived of any revifying contact with the masses of the people." । Rene Maunier তাঁর 'The Sociology of Colonies' গ্রন্থে জাতি সংযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি দুর্বল জাতি তার উপর চেপে বসা অন্য জাতিসত্ত্বাকে অনুকরণ করে। তার হীনমন্যতাবোধ থেকেও কীভাবে উত্তমর্ণের সংস্কৃতি অনুকৃত হয়। মধুসূদন দত্তকে বলতে হয় 'I sing for Albion's distant shore'. উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র ও তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ফসল মেঘনাদবধকাব্য ধরা গেলে দেখা যাবে দেশ থেকে ইউরোপীয় সমাজীবন ও দৃষ্টিভঙ্গির যতটুকু তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আনতে পেরেছিলেন, যতটুকু তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যের জীবনদৃষ্টি সংগ্রহ করেছিলেন

তা কাজে লাগিয়েছেন। মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' আর হোমারের 'ইলিয়ড' থেকে অনেক পংক্তিরও অনুসরণ করেছেন।

ইংরেজ রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রসারের সাথে সাথে ইংরেজ তাদের নিজেদের শিল্পভাবনাকে ভারতে নিয়ে আসে। সমকালীন ভারতের মার্জিত, চির, যেখানে পরম্পরাগত জনপ্রিয় ধর্মীয় সঙ্ঘের সাথে পাশ্চাত্যের বাস্তবতার চিন্তা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে গিয়েছিল, যাকে তুলনা করা যাবে বাজার চিত্রকলার সাথে, বিশ শতক পর্যন্ত যে মনন প্রসারিত ছিল। নকল ও আত্তিকরণ একটি সহজাত প্রবণতা। প্রজা রাজাকে অনুকরণ করে, আবার বিজেতা বিজীত কাছাকাছি যেতে তাদের অনেককিছু অধিগ্রহণ করে—তা প্ররোচনায় হতে পারে বা স্বতঃস্ফূর্তিতে এই মিশ্রণ কোনো চাপ ছাড়াই ঘটে যেতে পারে শুধু যোগাযোগের মাধ্যমে। আবার অন্যদিকে এই অনুকরণ ক্রিয়াটি হতে পারে শাসকের প্রস্তাব বা আরোপের মাধ্যমে। শাসকের প্রম্পটিং ছাড়াই যখন সেটা ঘটে তখন তা স্বতঃস্ফূর্ততায় উদ্ভাসিত। শাসক তার শিল্প-সংস্কৃতি দিতে না চাইলেও প্রজা শুধুমাত্র ভালোলাগা থেকে তা ধার করে না। কিন্তু যখন শাসক শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক তেমন নেই তখন কীভাবে শিল্পী নিজেকে প্রণোদিত করে? এই অন্বেষায় রেনে মনিয়ের তাঁর 'The Sociology of Colonies' গ্রন্থে স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণের তিনটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে বলেন। তা হল—১। প্রশস্তি প্রবণতা, ২। স্বাতন্ত্র্যের অভিপ্সা, ৩। বন্ধনমুক্তির জন্য আন্দোলন। আমাদের জানা উচিত যে নকলনবিশতার সহজাত গুণটি ভারতীয়দের ছিলই। আহসান জান কাইজার-এর 'The Indian Response to European Technology and Culture' গ্রন্থে উল্লেখিত ওভিংটন এর একটি মন্তব্য এখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে "The Indians are in many things of matchless ingenuinity in their several employment; and admirable mimicks of whatever they effect to copy after....The weavers of silk will exactly imitate the nices and most beautiful patterns that are brought from Europe. And the very ship carpen-ters of Surat will take the model of any English vessel, in all the curiosity of its buildings, and the most artificial instances of workmanship about it, whether they are proper for the convenience of burthen, or of quick sailing, as exactly as if they had been the first contrivers. The Tailors here fashion the clothes for the Europeans, either men or women, according to every mode that prevails; and fit up the commodes , and towering Head-dresses for the women with as much skill, as if they had

been an Indian fashion, or themselves had been apprenticed at the Royal Exchange." মধুসূদন দত্তের পুরনো হিন্দু কলেজের বন্ধু বাবু গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেন, "মনে আছে মধু একদিন হঠাৎ তার ধুতি চাদর বাদ দিয়ে পাক্কা সাহেবি পোশাকে ক্লাসে আসা শুরু করল।" এটা উল্লেখ এ জন্যই যে কলোনিয়াল প্রণোদনাটি কতটা তাঁর ভেতর সামাজিক মানুষ হিসেবে ঢুকে আসছিল। ইউরোপীয়দের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সহযোগে নিয়মিত সংযোগ সূত্রটি কলকাতার বিখ্যাত 'বাবু কালচার' নিয়ে উপস্থিত। ১৯ শতকে ভারত বস্তুত বৃটিশ মধ্যবিত্তের সম্পদ আর বৃটিশ মধ্যবিত্তের নৈতিকতায় স্ফূরিত। বৃটিশ দার্শনিক, কবিদের প্রোটেট শোভিত থেকেছে বাংলার রাজা-জমিদার ঘর-বাড়ি। সান্ধ্য বিলাসিতাও নিয়েছে তারা। আব্দুল করিম তাঁর 'Nwab Murshid Quli Khan and his times' গ্রন্থে জানিয়েছেন, ১৯ শতকের প্রথম সিকিভাগ পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজ ও স্থানীয় মানুষজনের সম্পর্কে ও কার্যকলাপে অবন্ধুতা খুব একটা ছিল না। ফলে নতুন উপরে উঠে আসা বাঙালি সম্প্রদায়টি আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য বৃটিশ প্রশাসকদের সাথে মিশে যেতে চেয়ে বৃটিশ জীবনছকটি আত্মীকরণ করল; যেমন তেমন নতুন সামাজিক মান-মর্যাদা বজায় রাখার জন্যও। মীর মোশারফ হোসেন তাঁর 'জমিদার দর্পণ' গ্রন্থে এই তথ্যটির অসাধারণ চিত্র আঁকলেন 'সাহেবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতে আরো ন্যাজ ফুলে ওঠে।' এই নবোত্থিত জমিদার শ্রেণীর আনুগত্য ও তোষামোদের প্রবণতাটি ফলে জীবনশৈলি থেকে শিল্পেও প্রকাশ পেতে থাকল না শুধু তাঁদের বাড়ি ফটকে লেখা হতে থাকল— 'God Save the Queen'। আমরা জানি মধুসূদন ও তাঁর পরিবারের সাথে কলকাতার বৃটিশ যোগাযোগটি কতটা সুদৃঢ় ছিল।

মধুসূদন তাঁর প্রতিভা দিয়ে বাংলা কবিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেও তিনি যে নব্য উপনিবেশিক মানসিকতার বাইরে স্বচ্ছন্দবাক ছিলেন তা কি বলা যায়! ইংরেজি ভাষায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও যখন দেখলেন শাসক দরবারে তাঁর আসন নেই, আসন মেলার উপায় নেই, তিনি ফিরে এলেন সেই বিখ্যাত আকুতি সহ—'রেখো মা দাসেরে মনে'। এতে তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি যত না মমত্ব তার চেয়ে যেন নিজের প্রতিষ্ঠালাভের প্রসঙ্গ বড়ো বেশি করে সামনে চলে আসে। আমরা মানি তাঁর সাহস ও সক্ষমতা। তাঁর ক্লাসিক ও রোমান্টিক মনের মেলবন্ধনের উচ্চাশাটিও বাংলা ভাষায় তিনিই তর্কবাগীশদের অনুশাসনকে তাচ্ছিল্য করেছেন। ঘুমপাড়ানি পয়ারকে ক্রমে লাটে তোলার ইচ্ছাও প্রজ্ঞায় অমিত্রাক্ষর এনেছেন। এবং অনেক পণ্ডিতদের মতে রোমান্টিসিজমের যে পুনর্জন্ম চলছিল ইউরোপে, এদেশে প্রায় কাছাকাছি ছিল তাঁর কবিচেতনা। ফলে বলা যেতে পারে তিনি আধুনিক। ১৮০১ সালে বার্লিনে একটি বক্তৃতায় রোমান্টিসিজমকে শ্লেগেল সমগ্র আধুনিক যুগের চেতনা বলে অভিহিত

করেছিলেন। গোটা উনিশ শতকে সমস্ত ইউরোপের প্রধান ভাষায় রোমান্টিসিজমের আন্দোলন তুঙ্গে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোয় আমরা কোনো চূড়ান্ত শুভ আশা করতে পারি না। এবং মধুসূদন দত্তকে একটি দ্বন্দ্বময় চেতনার প্রতিভু বললেও বলা যেতে পারে। কেন পারে? একেবারে প্রাথমিক সিদ্ধান্তে দেখুন, কীট্স ও মিলটনের মতো কবি হওয়ায় দিকে, মানে ক্লাসিক লিখিয়ে সাফল্যের দিকে নিজেই নিজেকে প্রলোভিত ও প্ররোচিত করেছেন, যা যুগোচিত নয়। অথচ তিনি তাঁর মহাকাব্যেও রোমান্টিক সুরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি, যা ছিল সমকালীন। 'চর্যাপদ' থেকেই বাংলা কবিতার যে স্বভাব ঝোঁক গীতিপ্রবণতা, তা ঠেকিয়ে রাখতে চেয়ে মধুসূদন কবিতাকে শব্দাড়ম্বর ও বিষয় আড়ম্বরে নিয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর পরিক্ষপ্ত চিত্ত সেই গীতিপ্রবণতাকেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। নিজের ধর্ম এবং নিজের ভাষার বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিদ্রোহ এবং শেষে সেখানেই ফিরে আসার আকুলতা, আকাঙ্ক্ষা কি তাঁকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের চরিত্র দেয় নি! এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়তেই পারে ১৯৫৬ সালে প্যারিসে নিগ্রো লেখক শিল্পীদের প্রথম কংগ্রেসে ফ্রানজ প্যানন জাতিতত্ত্ব ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওই যে বলেছিলেন, একটি উপনিবেশে শাসকরা শাসিতকে বাধ্য করে নিজেদেরকে ঘৃণা করতে। নিজের ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতিনীতি, সামাজিক অনুশাসন, নিজের ধর্ম-ইতিহাস—সমস্ত কিছুর উপর অকথ্য ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে। এবং এভাবে একটি জাতির নিজস্ব সামাজিক চালচিত্র ভেসে যায়, মুছে যায়। রবীন্দ্রনাথও ব্যর্থ হয়েছিলেন। নোবেল প্রাইজটা ছাড়া ইউরোপের অন্তরে থেকে যেতে তিনি পারেননি। যে তিনি সাগরপারের কাব্যলক্ষ্মীকে নোবেলপ্রাপ্তির পরে পরেই বন্দনা করেছিলেন, ১৯৩৫-এ এসে তাঁকেই বলতে হয়েছিল 'Jealous sovereign'। তিনি তখন আর চাইছেন না নিজের স্বাভাবিক পরিবেশ ছেড়ে অন্যত্র স্বীকৃতিলাভের চেষ্টার পণ্ডশ্রমটুকু। রবীন্দ্রনাথ বললেনও, "Translations, however clever, can only transfigure dancing into acrobatic tricks, in most casesplaying reason against the majesty of the original. I often imagine apes to be an attempt by the devil of a translator to render human form in the mould of his own outlandish idiom." বুঝেছিলেন কাব্যলক্ষ্মী শুধু নিজের জলহাওয়া ও সংস্কৃতির অর্ঘ্যই গ্রহণ করে।

অন্য ভাবনাটি প্রসঙ্গে একটু গৌরচন্দ্রিকা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে সাহিত্যে, একটু বড়ো স্কেলে—শিল্পে বিজ্ঞাপনদাতারাই ঘোষণা করে দেন কে বড়ো, কে ছোটো, এবং কারা কবি-শিল্পী নন। আর বঙ্গবাসী সে রায় মাথায় করে রাখে। ফলে কবি হবার আগে কবিকে বৈষয়িক হতে হয়। হিসেব টিসেব কষে সাহিত্য-শিল্পের পথে এগোতে হয়। কোন মেশিন কত তেল খায়, কি তেল খায় একজন করিয়ে সাহিত্যিককে তা ভালো

করে জেনে নিতে হয়। তোমার মুরুব্বি নেই, দল নেই, মিডিয়ার শাঁসালো ব্যক্তির সাথে লেনদেন নেই তো জীবদ্দশায় জীবনানন্দ দশা। তো ১৯শতকের প্রেক্ষিতে বিষয়টা একটু নরম-সরম হলেও যশো-প্রতিষ্ঠাকামী মদুসূদন দত্ত এই মুরুব্বি ধরার ব্যাপারে বেশ সচেতনভাবে যে কাজ করেছিলেন বলে মনে হয়, তা হলো খোদ বৃটিশ শক্তির আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করা, এবং চার্চের স্মরণাপন্ন হওয়া। ইউরোপে তখন রেনেশাঁ চলে এলেও চার্চের ভূমিকা তখনও ছিল রাজার রাজার মতো। অর্থাৎ, চার্চের অবস্থান State within the State।

এই ছকের ঝুঁকিটি নিয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি অভিমন্যুর মতো পুরোটা, অর্থাৎ সলতে পাকানোর পরবর্তী কালের প্রজ্জ্বলন প্রসঙ্গটি বুঝতে পারেননি। আমরা এর আগেই বলছিলাম। একটি কলোনিতে তোমাকে শাসক ততদূরই বাড়তে দেবে, যতদূর তুমি শাসকের কাছে দাসের বেশি কিছু নও। কিন্তু ওই আরোপিত গণ্ডিটি ডিঙোলেই বিপদ। প্রতিভাধর মধুসূদন জানতেন না তখনও শাসক হলো লেভিয়েথান, আর ব্যক্তি প্রতিভা হলো সেই কীট, যাকে এক ফুঁয়ে উড়ে যেতে হয়। আমরা অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের অনূদিত শিল্প যখন নোবেল-উত্তর সময়ে ইউরোপে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, সেসময় ইয়েটস, যাঁর ভূমিকাসহ রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাপ্তি, কী ভয়ঙ্কর অসূয়ায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করছেন। আর মধুসূদনকে বিলেত ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল দেশের মাটিতে, মাতৃভাষায়। আর তারপর যেই বাঙালিবাবু বিদ্যাসাগরের কাছে হাত পাততে হল তখন মানসিক অবসাদ অগ্রাহ্য করে কতদিন আর তাঁর আলোকসামান্য প্রতিভা টিকে থাকবে তা ভাবার বিষয় ছিল বৈকি!

অরুণ মিত্র তাঁর প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলা ভাষায় মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টির উদ্যমে কিছু কৃত্রিমতা ছিল। হ্যাঁ ছিল। যে উপনিবেশিক কাঠামোর তিনি অংশ সেখানে স্বভাব স্ফুরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যতই বলা হোক না কেন ইউরোপ থেকে মধুসূদন রোমান্টিসিজমের তারুণ্য এনেছিলেন, যার অভিঘাতে বাংলার ন্যুব্জ সাহিত্য প্রাঙ্গন একলাফে তরতাজা হয়ে উঠেছিল—তা ঠিক নয়। রোমান্টিসিজ ঐতিহাসিকভাবেই ব্যক্তিমানসের মুক্তি ঘটায়, যান্ত্রিকতায় অব্যাহতি দেয়, কিন্তু মধুসূদনের ক্ষেত্রে! এ বিষয়ে শুধুই পুনরুল্লেখ হবে যে উপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় বৃটিশ মুকুটের উজ্জ্বলতম মণি ভারতবর্ষে রাজভাষা বা ইংরেজিটা ছিল মুখ্য। ভারতীয় ভাষা সেখানে ভৃত্য শ্রেণীর। ১৮৩৫-এ মেকলে সাহেবের এ বিষয়ে ঘোষণাও আছে। এবং ইংরেজি ছাড়ার ফলে সমকালে অন্য কোনও প্রভাব দেশীয় বুদ্ধিজীবী বাহিত হয়ে বাংলা ভাষায় ঢোকাও সম্ভব ছিল না। মধুসূদনের ক্ষেত্রেও তাই, বৃটিশ চালচলন, তার মধ্যবিত্ত দোলাচল সংস্কৃতিটি বাংলা ভাষার খাঁচায় ঢোকানো ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র উদ্যম খুব একটা যে ছিল তা কষ্ট-প্রমাণ সাপেক্ষ। উদাহরণ হিসেবে মনে করা যাক মধুসূদন ফরাসি ভাষার

বিখ্যাত কবি ভিক্টর য়্যুগোর উদ্দেশ্যে একটি সনেট লিখছেন। সেখানে শুধু তাঁর যশোলাভের কথা উল্লেখ করলেন, ভিক্টর য়্যুগোর কবিতার মানবিক দিক, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দিক নিয়ে কিছুই বললেন না। অথচ মধুসূদনের ব্যক্তিগত স্বভাব ছিল প্রচলিত আচরণের বিরোধিতা করা। বৃটিশ শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক বলেই কি ফরাসি মুক্ত-চিন্তা সম্পর্কে মতামত এড়িয়ে গিয়েছিলেন! তাহলে কি মনে করা যাবে মধুসূদন কলোনিয়াল আগ্রহের বাইরে ততটা স্বাভাবিক নন? "গাহিব মা বীররসে ভাসি"—উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই একটা দ্বান্দ্বিকতা উদ্ভাসিত হয় না কি! 'গাহিব মা' শোনার সাথে সাথেই আমাদের মনে একটা হার্দ্য, আপ্লুত সমর্ধ্বণ ভঙ্গি ভেসে ওঠে। এর সাথে ঠিক বিপরীত 'বীররস' উত্থাপন মাত্রই যেন ছৌনাচের মুখোশ থেকে বড় বড় দুটি চোখের যুদ্ধং দেহী মনোভাব ফুটে উঠল। যার নিচে সহজ সরল আদিবাসী দুটি নগ্ন পায়ের কোনো যোগাযোগ নেই।

আমার আরেকটি ভাবনা ছিল যে, বাংলা ভাষার যে আদল, যে হার্দ্য ভৌগোলিক, ও সামাজিক কাঠামোর প্রতিমুখ ও পরম্পরা সে, তাতে খুব একটা ওজস্বিনী বিষয়, খুব দৃপ্ত ব্যাপার-স্যাপার তেমন যায় না। তা হলে মধুসূদন দত্ত কীভাবে, কেন তা গ্রহণ করেছিলেন। এটা কি সময়ঘটিত ব্যাপার যে, পরাধীন মানবাত্মার কান্নার বিপরীতে, বারবার হেরে যাবার বিপরীতে মানসলোকে একটা জয় দেখতে চেয়েছিলো বাঙালি! মেঘনাদের চরিত্রের বীর্যবত্তায় নিজেদের পরাধীন মানসের মুক্তি চেয়েছিল! না কি শুধুমাত্র নতুন কাব্য আস্বাদনের রোমাঞ্চ যেখানে শব্দসম্ভার ও শব্দঝংকারে যুদ্ধের ঝলমলে সৈন্য সমাবেশ! এটা বলা যায় মধুসূদন সচেতনভাবে বৃটিশ বিরোধিতা বা স্বাধীনতার কথা 'মেঘনাদবধ' কাব্যে বলতে চাননি। যেভাবে তাঁর সমকালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বা নবীনচন্দ্র সেন জাতীয়তাবোধকে তাঁদের কাব্যে স্থান দেন। আসলে মাদ্রাজ প্রবাসের ফলে দক্ষিণী ঐতিহ্য অনুযায়ী রাবণের ভিন্ন মূর্তির সাথে ইউরোপীয় মহাকাব্যের বীরত্বগাথায় তাকে গেঁথে তোলার বিশাল কল্পনা মধুসূদনের গৌরবপিপাসু অনন্ত প্রতিভার সাথে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর বাগাড়ম্বর কাব্যভাষা, তার কী হবে! তাঁর পয়ারভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে, শব্দবন্ধে, ক্রিয়াপদের নবীন গঠনে শক্তি ও উজ্জ্বলতার মূর্তি যে ভাষা তা বাঙালীকে চমৎকৃত করলো ঠিকই—কিন্তু তাতে স্বতঃস্ফূতি কই! অনেক কম প্রতিভার অধিকারী হয়েও এই স্বতঃস্ফূর্তি দিতে পেরেছিলেন বলেই বিহারীলাল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন। একবার ভাবা যাক, "হায় ইচ্ছা করে/ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে/পশি, এক্ষণের জ্বালা জুড়াই বিরলে।"—এই ভাষা কোনো সাধারণ বাক্‌ব্যবহারে প্রকাশ পেতে পারে! অথচ মধুসূদনের থেকে ২২ বছরে বড়ো ফরাসী কবি ভিক্টর য়্যুগোর কাব্যভাষা ফরাসীদের আজও খুব কাছের। এই সঙ্গে যে ভাবনা আসে তা হ'ল, মধুসূদন অমিত

প্রতিভার অধিকারী হয়েও সময়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। যে সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিতে পাশ্চাত্যের কাব্যসাহিত্য ক্রমে রূপায়িত হয়েছে তার সাথে আমাদের সমাজ বিবর্তনের কোনো মিল ছিল না। উনিশ শতকে ইংরেজ শাসন দেশ-অতিক্রমী এক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের ঠেলে দিতে আরম্ভ করেছিল বটে, কিন্তু আমাদের জাতিগত বাস্তব অবস্থা পাশ্চাত্যের মতো ছিল না। ফলে অনুকরণ ইচ্ছা ও বিভ্রান্তি।

মধুসূদন সুনিশ্চিতভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেমন তাদের জীবন ও ধর্মাচারণ বেছেছিলেন, তেমনি তাদের সাহিত্যিকরাও তাঁকে বিপুল আকর্ষণ করেছিল এবং ইংরেজি ভাষায় লিখেই তিনি সম্মান অর্জন করতে চেয়েছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি যদি তাঁর যথার্থ মমত্ব থাকতো তবে মাত্র বছর ছয়েকের বাংলা সাহিত্যচর্চার কালে তিনি এতগুলো বিষয় একসাথে ধরতেন না। তাঁর বিশাল প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি বাংলা ভাষার সঙ্গে আত্মিক সংযোগটি তেমন দেখাতে পারেন নি। বাংলা ভাষা, বাংলা কবিতার সমস্যা এবং বাংলা কবিতার রূপান্তরের জন্য তাঁর ভাবনাচিন্তা ও পরিকল্পনার কথা বন্ধু, সুহৃদদের কাছে লিখিত চিঠিতে জানা যায়। কিন্তু বিস্ময়ের, বাংলা কবিতা ও ভাষা নিয়ে বাঙালি বন্ধুদের কাছে লিখিত সেসব চিঠি ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। তাঁর নিজের ঘোষণা দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। তিনি বলেছিলেন, তাঁর কাব্যসৃজনের চালিকাশক্তি ছিল যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা আর শিক্ষিত সমাজকে চমৎকৃত করার বাসনা। এবং ফলে অভিপ্রায় ছিল, কবিতার অলঙ্কার-আভরণ মনোহর করে গড়া। এসবে তো তিনি সফল। কিন্তু জীবনের শেষে এসে তিনি সময়ের এই ট্রাজিক বেদনাটি বুঝেছিলেন বলেই আত্মোচ্চারিত হয়েছিলেন, "হায়রে ভুলিবি কত আশার কুহক ছলে।" এবং তিনি লেখা বন্ধও করেছিলেন সেই বোধের নিস্পৃহতায়। ১৯শতকে একটি উপনিবেশিক শাসনে মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গের এইরূপ আমরা বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ করে শেষ করব—"প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিঃশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে ভাই, আর কান্না কেন? তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না"। (কমলাকান্তের দপ্তর)।

■ তাপস রায়—কবি ও প্রাবন্ধিক

সুমিতা চক্রবর্তী

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও কবিতা বিচার

বস্তুবাদ এক বিশ্ববীক্ষা। জগতের স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণা—এক সিদ্ধান্ত। এই মতবাদে 'বস্তু' বা 'ম্যাটার' বিশ্বের প্রধানতম ও সর্বাতিশায়ী অস্তিত্বের একক। বস্তুর তুলনায় বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে মন, ভাবনা, আদর্শ, কল্পনা, আত্মা, অলৌকিকত্ব, আধ্যাত্মিকতা, অধিবিদ্যা ইত্যাদির স্থান অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুবাদীরা মনে করেন—পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার নির্দিষ্ট কারণ আছে। প্রতিটি অস্তিত্বের (Being) আছে দেশ, সময়, অবয়ব, ঘনত্ব, স্পন্দন, কাঠিন্য, তাপ, জাড্য, স্থায়িত্ব এবং গতিবেগ। প্রতিটি অস্তিত্বের আছে নিজস্ব ইনারশিয়া (inertia) বা স্থিতাবস্থা।

এই অভিমতটি বহু প্রাচীন। গ্রিস-এ, খিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দে মনে করা হত—দুই আদি অস্তিত্ব হল পরমাণু ও মহাশূন্য। পরমাণুর বিচিত্র গতিময়তা ও মিশ্রণের ফলেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। সৌরমণ্ডলে কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—পরিবর্তিত হয় মাত্র। এই মতের আদি প্রবক্তা বলা হয় ডিমোক্রিটাস-কে (Democritus, ৪৯৪-৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। কথিত আছে যে তাঁর গ্রন্থ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল প্লেটো-র নির্দেশে। তাঁর অভিমত ছিল, এই মহাশূন্যে গতিময় অবস্থায় থাকে অসংখ্য বিভাজন-আযোগ্য পরমাণু। তাদের সংযুক্তির ফলেই যাবতীয় দৃশ্যবস্তু গড়ে ওঠে। পরমাণু বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণা। ডিমোক্রিটাসকে আধুনিক বিজ্ঞানের গুরু বলা হয়। তিনি বলতেন যে অকারণে এবং অপ্রয়োজনে কিছুই ঘটে না। প্রতিটি অস্তিত্বের আছে কারণ ও যৌক্তিকতা। ডিমোক্রিটাস নিরীশ্বরবাদী ছিলেন; মনে করতেন দেবতারা থাকে কেবল মানুষের বিশ্বাসের জগতে। তিনি আত্মা মানতেন না। তাঁর উপদেশ ছিল—মানুষের হওয়া উচিত নির্ভীক, প্রশান্ত এবং আনন্দিত -চিত্ত।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম অব্দেই এমপেডোক্লিস (Empedocles, ৪৯৩-৪৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মনে করতেন—মাটি, জল, বায়ু এবং তেজ—এসবই পরমাণুর বিভিন্ন বিন্যাস। পরমাণুগুলি মহাশূন্যে নিরন্তর গতিময় অবস্থায় বিরাজ করে। পরমাণুগুলি কখনো মসৃণভাবে মিলিত হয়, কখনো তারা খুব ভালোভাবে মেলে না—কোনোভাবে জুড়ে থাকে মাত্র। এরই ফলে পৃথিবীতেই সুষম এবং বিষম পদার্থের উদ্ভব হয়। এমপেডোক্লিস কিন্তু ঈশ্বর মানতেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই পরমাণুগুলি এইভাবেই মিলিত হয়। এমপেডোক্লিস আত্মা এবং জন্মান্তরও মানতেন। দেখা যাচ্ছে বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসকে মিলিয়ে দেবার যে-প্রবণতা আধুনিককালেও লক্ষ করা যায়—তারও জড় প্রাচীনকালে ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় অব্দে এপিকিউরাস (Epicurus, ৩৪২-২৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর দর্শনে মনে করা হয়—বস্তু (Matter) এবং শূন্যতা (void) সমন্বয়ে পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। শূন্যতায় সঞ্চরণশীল অসংখ্য পরমাণু আছে। সেগুলির আছে ঘনত্ব (density) অবয়ব (shope) এবং পরিমাপ (size)। পরমাণুগুলির কম্পন, সংঘাত এবং মিশ্রণও আছে। তাঁর মতে আত্মা নির্মিত হয় অতিক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম সুগোল পরমাণু দিয়ে। আত্মার সংযোগে শরীরে এক ধরনের সংবেদনা, (sensation) জাগে। তিনিও অবশ্য দেবতায় বিশ্বাস করেছেন। তবে তাঁর মতে দেবতারা মহাশূন্যে বাস করে এবং নরলোকের সঙ্গে দেবতাদের কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের যুক্তিবাদী জ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত দেব-বিশ্বাসের একটা রফা করার মনোভাব এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হয়তো এইটুকু বিশ্বাসের কথা না বললে ডিমেক্রিটাস-এর মতো এমপেডোক্লিস এবং তাঁর গ্রন্থ ধ্বংস করে দেওয়া হত।

এপিকিউরাস-এর মতে বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে সত্যকে জানা সম্ভব। তাঁর মতে জীবনের উদ্দেশ্য হল ব্যাধিমুক্তি এবং মনের প্রশান্তি। সুস্থ জীবনের মূল হল মেধাবী মনন (intellect)। এই ইনটেলেক্ট আসে বাস্তবসম্মত প্রজ্ঞা থেকে। তার ফলে সদর্থক জীবন লাভ করা যায়।

এপিকিউরাস-এর সুখের ধারণা অনেকটাই হিতবাদী ধারণার পূর্বসূরি। মানুষকে সেবা করার মধ্য দিয়ে সুখ অনুভূত হতে পারে—একথা তিনি বলেছেন। তাঁর মতে—মৃত্যু সুখের। কারণ তা শারীরিক ক্লেশ ও যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। এপিকিউরাস-এর দুই শতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত হন বুদ্ধদেব। বৌদ্ধ দর্শনের বাণী এপিকিউরাস-এর উপদেশের মধ্যে যেন ধ্বনিত হয়।

এপিকিউরাস সম্পর্কে অনেক রটনা আছে। যেমন, তিনি অহংকারী, খাদ্যলোভী এবং নারীসঙ্গপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু সেসব রটনা যে সত্য তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রাক খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে রোমক সাম্রাজ্য সমৃদ্ধ ও সমুন্নত হয়ে উঠতে থাকে। গ্রিস-এর মতোই জ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার পীঠভূমি হয়ে উঠেছিল রোম। কিন্তু গ্রিস-এর তুলনায় রোমক চিন্তন-মনন ও জীবন-দৃষ্টির বিশেষ ধবনটিতে রাজকীয়তা, ভোগবাদ, অধিকারবোধ, বাসনা-সংরক্ত আকাঙ্ক্ষার প্রসার ছিল অনেক বেশি। তারই অনুক্রমে রোমক দর্শনবিদ টাইটাস লুক্রেশিয়াস ক্যারাস (Titus Lucretius Carus, খ্রিস্টপূর্ব ৯৪-৫৫ অব্দ) বস্তুবাদী জীবনবীক্ষার সঙ্গে ভোগবাদের সম্পর্ক সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে চেয়েছিলেন। এপিকিউরাস-এর উদ্দেশে লুক্রেশিয়াস প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করে বলেছেন যে, বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অভিমত গ্রহণযোগ্য। সীমাহীন মহাশূন্যে অসংখ্য পরমাণু গতিশীল অবস্থায় থাকে। পরমাণুগুলি সাবয়ব ও ঘনত্বময় (solid), অদৃশ্য ও

অনশ্বর। পরমাণুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বস্তু এবং বিশ্ব। তাঁর মতে অনেকগুলি বিশ্ব আছে। পৃথিবীতে কিছুই বিনষ্ট হয় না। তাঁর মতে আত্মা বস্তুরই প্রকারভেদ এবং দেহের সঙ্গে আত্মার মৃত্যু। আত্মার চিরন্তনত্ব মানেন না তিনি। লুক্রেশিয়াস মনে করেন—ধর্ম -বিশ্বাসের কোনো যুক্তি নেই এবং তা অন্যায়। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ধর্মবিশ্বাস ও মৃত্যুভয় থেকেই বিশ্বে যাবতীয় অশুভ (evil)-এর উৎপত্তি হয়। মানুষকে মৃত্যুভয়-শূন্য হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। এবং বলেছিলেন —যুক্তিবাদ ও মনন দ্বারাই জীবনকে শুভময় করে তোলা যায়।

লুক্রেশিয়াস-কে প্রগাঢ় ভোগবাদী রূপে চিত্রিত করবার প্রবণতা লক্ষ করা যায় বিদেশে ও এদেশের অনেক লেখায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি নরনারীর প্রেম-সম্পর্কের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন এই আকর্ষণ মননবিহীন ও আবেগসর্বস্ব। লুক্রেশিয়াস-এর লেখায় নরনারী সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার বিশদ বিবরণ আছে বলেই তাঁর সম্পর্কে ওই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ওই বিবরণ দান করেছেন সম্পর্কটির অ-মননশীলতা উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য। এবং দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনকে নিন্দা করবার জন্য। লুক্রেশিয়াস যথার্থই বস্তুবাদী এবং যুক্তিবাদী ছিলেন। সমকালের প্রেক্ষিতে তাঁর নাস্তিক্যবাদী অভিমত যথেষ্ট আক্রমণাত্মক ছিল বলেই তাঁর বিরুদ্ধেও সমকালীন প্রতি-আক্রমণ হয়ে উঠেছিল তীক্ষ্ণ।

এতক্ষণ আমরা পাশ্চাত্য দর্শনে বস্তুবাদ সম্পর্কিত ধারণার কিছুটা পরিচয় গ্রহণ করলাম। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দ থেকে প্রথম অব্দ পর্যন্ত কাল পরিসরে এই বস্তুবাদী চিন্তা বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতেও এক বেদবিরোধী বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভব ঘটেছিল। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের আবির্ভাবের কাল নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তার উদ্ভব ঘটেছিল খ্রিস্টজন্মের অন্তত পনেরো শো বছর আগে।

প্রথমেই পুরাণ কথিত ঋষি কপিল-এর উল্লেখ করা যায়। পুরাণে ও মহাভারতে প্রাচীন ঋষি বলে তাঁর উল্লেখ আছে। তিনি ঋষি কর্দম এবং দেবহুতির পুত্র। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে তিনিই ষাট হাজার সগর-সন্তানকে ভস্ম করেছিলেন। কিন্তু ঋষি কপিলের অস্তিত্বের প্রমাণও সুদৃঢ়। কারণ তাঁকে সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা বলা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জগৎ পঁচিশটি পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। সংখ্যা উল্লেখ করে বিষয়টি নির্দেশ করেছিলেন বলেই তাঁর দর্শনের নাম সাংখ্য। তিনিও মনে করতেন পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা বস্তুর বিনাশ সম্ভব নয়। পঞ্চভূত ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে বলে তিনি মনে করেছেন। যে কোনো সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্য তিনি তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। —প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান এবং শব্দ। এই শব্দ অর্থে তিনি প্রাচীন শাস্ত্র তথা বেদকে নির্দেশ করেছেন—মনে করা যেতে পারে। কপিল ঈশ্বরের কথা বলেননি। মানুষের অন্তঃ

করণকে স্বীকার করেছেন। এবং বলেছেন অন্তঃকরণের বিলীনতাই হল মানুষের মুক্তি। পার্থিব অর্থে তাকেই মৃত্যু বলতে পারি।

বৃহস্পতি নামে এক উল্লেখও নামও পুরাণে পাওয়া যায়। যাঁর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যথার্থ কোনো সময় নির্দেশ করা যায় না। তবে চার্বাক-এর দর্শনে বার বার তাঁর উল্লেখ আছে। পুরাণে বলা হয়েছে বৃহস্পতি দ্বিতীয় মন্বন্তরে জীবিত ছিলেন। বৃহস্পতিকে বেশ প্রখর নাস্তিকতাবাদী বলা যায়। তিনি বলেছিলেন অগ্নিহোত্র, বেদ অধ্যয়ন, দণ্ডগ্রহণ (সন্ন্যাস), ভস্মলেপন—এই সবই নির্বোধ ও কাপুরুষদের উপযোগী কাজ। যজ্ঞে কোনোই ফল হয় না। ইহলোকের সুখই মানব-জীবনের শেষ কথা। এই বৃহস্পতি দেবগুরু নন। পৌরাণিক ঋষি বলে কথিত।

চার্বাক-এর নাম আমাদের কাছে বহুল পরিচিত। তিনি বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর দর্শনেই বৃহস্পতির প্রসঙ্গ বার বার পাওয়া যায়। চার্বাক-এর মতে পঞ্চভূত থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি; পরলোক বা ঈশ্বর কিছুই নেই। প্রমাণ হিসেবে অনুমানের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না তিনি। প্রত্যক্ষ প্রমাণই তাঁর কাছে একমাত্র প্রমাণ। ইহ-জীবনের সুখই জীবনের অন্তিম লক্ষ্য বলে তিনি মনে করেন। "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—এই সুপরিচিতি শ্লোকটি তাঁর নামে প্রচলিত। বস্তুত লুক্রেশিয়াস-এর তুলনায় চার্বাককেই প্রকৃত অর্থে ভোগবাদী বলা যায়।

অতঃপর আমরা দর্শনবিদ কণাদ-এর নাম উল্লেখ করব। তাঁর ঐতিহাসিকতার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলা হয়েছে। তাছাড়া বৈশেষিক দর্শন নামে সু-বিশ্লেষিত শাস্ত্রের প্রণেতা তিনি। তাঁকে রাখা যায় পাশ্চাত্য পরমাণুবাদী দর্শনবিদ্‌দের পাশে। তিনি বলেছেন যে, ছয়টি ভাব পদার্থ আছে। সেগুলি যথাক্রমে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। বিশেষ নামের এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেছেন বলেই তাঁর প্রণীত দর্শনকে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়। তাঁর মতে দ্রব্য নয় প্রকার—পঞ্চভূত-এর পাঁচটি দ্রব্য এবং কাল, দিক, আত্মা এবং মন। দ্রব্যের দূরত্ব ও নৈকট্যের জ্ঞান হল দিক, ছোটো ও বড়োর জ্ঞান হল কাল; কৃতজ্ঞানের বোধ পাওয়া যায় আত্মায়। এবং সুখ-দুঃখের অনুভব-কেন্দ্র হল মন। কণাদের মতে গুণ চব্বিশটি—রূপ, রস, গন্ধ পরিমাণ, সুখ, দুঃখ, পাপ, ধর্ম ইত্যাদি। কর্ম পাঁচরকম—উৎক্ষেপ, অবক্ষেপ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন। সামান্য দুই প্রকার—জাতিবিশেষ এবং সাধারণ ধর্ম। সমবায় অর্থে নিত্য সম্বন্ধ। বিশেষ একটি অতিরিক্ত পদার্থ। কণাদ দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেছেন—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। তিনি শব্দ অর্থাৎ বেদ-প্রমাণ স্বীকার করেননি।

ভারতীয় চিন্তাধারায় কণাদই কণাবাদ বা পরমাণুবাদ-এর প্রথম প্রবক্তা। তাঁর মতে পরমাণু সংযোগেই বিশ্বের উৎপত্তি। পরমাণু হল সৎ স্বরূপ এবং নিত্য পদার্থ। তার অস্তিত্বের অন্য কোনো কারণ আর নেই। জ্ঞানের অনুশীলন প্রত্যক্ষ বস্তু থেকেই সম্ভব।

কণাদ-এর দর্শনে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নেই। যদিও বেদের স্বীকৃতি আছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বেদ অনুসরণ করবার কথা নেই। ভারতীয় চিন্তনে জড়তত্ত্বের তথা বস্তুবাদের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রের প্রবক্তা ও প্রচারক কণাদকেই বলা যায়। গীতায় বৈশেষিক দর্শনের উল্লেখ আছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শন-চিন্তায় কোনো সময়ই বস্তুবাদী ধারণা অতীন্দ্রিয় লোকবিশ্বাসী আধ্যাত্মিক ধারণাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি।

মধ্যযুগের ইউরোপ (৫০০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দ) ছিল প্রধানত রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের যুগ্ম-শাসনে রুদ্ধশ্বাস এক সমাজ। রাষ্ট্রিক বিধিনিষেধ ও পাপের ভয় দেখিয়ে, সাধারণ মানুষকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা হয়ে উঠেছিল মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান শ্রেণির কুক্ষিগত। রাজা এবং যাজকদের মধ্যেও ছিল নিজেদের এক লড়াই। সেই লড়াই-এ সাধারণ মানুষ বিপন্ন এবং অসহায় হয়ে পড়ত। মুক্ত জ্ঞানচর্চাকে কোনোভাবেই উৎসাহ দেওয়া হত না। চাপিয়ে দেওয়া হত শাসনতন্ত্র এবং যাজকতন্ত্রের বিধি-বিধান। বস্তু-প্রমাণনির্ভর যুক্তিবাদকে এই ক্ষমতাবান শ্রেণি সমূলে ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করত। তারই পরম্পরায় আমরা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতেও ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ), কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২খ্রিস্টাব্দ)-র মতো বিজ্ঞানীদের লাঞ্ছিত হতে দেখেছি যাজক ও শাসকশ্রেণির বিধানে। তার উপর খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী থেকেই পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান তুর্কি-সাম্রাজ্যের অধিপতিরা অবিরত চালিয়ে গিয়েছিলেন ইউরোপীয় ভূখণ্ড অধিকারের অভিযান। যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির ব্যয়ভারও বহন করতে হত সাধারণ মানুষকেই। ফলে বস্তুবাদের ধারণা—যার ভিত্তি ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যুক্তি এবং বাস্তববোধ—তার চর্চা হয়ে পড়ল স্তিমিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাধান্য পেতে লাগল যাজকতন্ত্র নির্দেশিত অধ্যাত্মবাদের ধারণা এবং ধর্মীয় সংস্কার।

ইউরোপে মানবতাবাদী পুনর্জাগরণের (রেনেসাঁস) সূত্রপাত চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিতে। দান্তে, পেত্রার্ক, বোক্কাচ্চিও-র সমবেত আবির্ভাবে—একথা সর্বজ্ঞাত। কিন্তু হঠাৎ একদিনে এত সমুন্নত মানবীয় চেতনার উদ্ভাস ঘটে না। জমি কর্ষিত হতে শুরু করেছিল অন্তত দুই শতাব্দী আগে থেকে। রোমক সম্রাট কন্‌স্টানস্টাইন (২৮০-৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ) খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমৃদ্ধ গ্রিক নগর বাইজানটিয়াম জয় করবার পর নিজের নামে তার নাম রাখেন কনস্টান্‌স্টিনোপল। বিদ্যানুরাগী সম্রাট এই নগরটিকে পূর্ব ইউরোপীয় ভূ-খণ্ডে এক অতি সমৃদ্ধ জ্ঞানচর্চা-কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন। একাদশ শতাব্দী থেকে তুর্কি সেনাবাহিনী কন্‌স্টান্‌স্টিনোপল জয় করবার জন্য অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। তার ফলে ওই সময় থেকেই কনস্টান্‌স্টিনোপল-এর বিভিন্ন জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র থেকে পণ্ডিত ও মনীষীরা তাঁদের গবেষণার ফল ও পুঁথিপত্রসহ ছড়িয়ে পড়তে থাকেন ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে। অনুরূপ পরিস্থিতিতেই একদিন ভারতীয়

বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শনের পুথিগুলি চলে গিয়েছিল নেপালে। এই বিকেন্দ্রিকরণের ফলে দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই সমগ্র ইউরোপ জুড়ে জ্ঞানচর্চার এক আবহ অনুভূত হতে শুরু করেছিল। ১৪৫৩ সালে শেষ পর্যন্ত কনস্টান্‌স্টিপোল-এর পতন হয়। কিন্তু তার আগেই রেনেসাঁস-এর আলো ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপ জুড়ে। মুক্ত জ্ঞানচর্চার বিস্তারের ফলে অযৌক্তিক সংস্কার শিথিল হতে শুরু করেছে একটু একটু করে। মানবতন্ত্র আবার সর্বাধিক মূল্য পেতে শুরু করেছে মানুষের মনে। রেনেসাঁস-এর তিন ইতালীয় উদ্‌গাতার রচনাতেই আছে তার প্রমাণ। রেনেসাঁস-এর কাল ইউরোপের ইতিহাসে নির্দিষ্ট করা হয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিক মানব সভ্যতার মূল্যবোধে রেনেসাঁস-এর প্রভাব চিরস্থায়ী হয়েছে।

রেনেসাঁস পর্বে কিন্তু মধ্যযুগীয় কুসংস্কার কিছুটা শিথিল হলেও ঈশ্বর-বিশ্বাসের স্থান ছিল প্রশস্ত। রেনেসাঁস-এর মানবতাবাদ, আদর্শবাদ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে সর্বার্থে মানবতন্ত্রী বললেও তাকে কিন্তু ঠিক বস্তুবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেই একটু একটু করে আবার বস্তুবাদী চিন্তার জাগরণ ঘটতে থাকে। এইসময়ে বস্তুবাদী চিন্তনের বিস্তারের সঙ্গেই ঈশ্বর, চিরাচরিত নৈতিকতা এবং বস্তুবাদকে মিলিয়ে দেখারও একটা প্রবণতা ছিল।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ চিন্তাবিদ টোমাস হব্‌স (Thomas Hobbes, ১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দ) বিজ্ঞান অনুশীলন করেছিলেন। তিনি দেবদূতদের অস্তিত্ব, ধর্মীয় অনুশাসন এবং আত্মাকে অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু ঐশী শক্তিকে তিনি স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে সংবেদনা (সেন্‌সেশন) হল বহির্বস্তু দ্বারা মুদ্রিত মানসিক রূপাবয়ব। ভাষা হল সেই রূপায়বগুলিকে শব্দে ও সংজ্ঞায় ব্যক্ত করবার ক্ষমতা। সেই অর্থে তাঁকে বস্তুবাদী বলতে পারি। তিনি স্মৃতি, বোঝার ক্ষমতা (আন্ডারস্ট্যান্ডিং) ও যুক্তি (রিজন্)-কে স্বীকার করেছেন। আবার কল্পনাকেও স্বীকার করেছেন। তাঁর ধারণায় যুক্তি হল যান্ত্রিক ও বস্তুস্বরূপ বিশ্ব (মেটিরিয়াল অ্যান্ড মেকানিক্যাল) থেকে সযত্ন শ্রমে গড়ে তোলা মানসিক শক্তি।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দর্শনে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ফরাসি দর্শনবিদ রনে দেকার্ত (Rene Descarte, ১৫৯৬-১৬৫০খ্রিস্টাব্দ)। তিনি বলেন বস্তু এবং আত্মা দুইয়েরই অস্তিত্ব আছে। তাঁর মতে বিশ্বে আছে দুরকম পদার্থ—পরিসর সমন্বিত পদার্থ (Extended Substance) এবং চৈতন্যময় পদার্থ (Thinking Substance)। মানুষের মধ্যে এই দুই পদার্থ রহস্যময়ভাবে মিলিত হয়। দেকার্ত-ই প্রথম বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের (বস্তুবাদী অভিজ্ঞতা ও চিন্তন বহির্ভূত অর্থে) যুগ্ম অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং দ্বৈতবাদ বা ডুয়ালিজ্‌মকে স্বীকৃতি দেন। মধ্যযুগে দর্শন অর্থাৎ যৌক্তিক শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত চিন্তনপদ্ধতি আর ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে এক ধরনের

অবিচ্ছেদ্যতা স্বীকার করা হত। কিন্তু এই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় দর্শনবিদ্‌গণের চেষ্টাতেই 'দর্শন' বিষয়টি অনেকটা ধর্মীয় সংস্কারের অনুশাসন থেকে মুক্ত হল। এই কারণেই এই সময়ের চিন্তন-পদ্ধতির বিবর্তনকে যুক্তিবাদী আন্দোলন বা র‍্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট বলা হয়।

রেনেসাঁস-এর কালে মানুষ ধর্মভয় এবং ধর্মের উৎপীড়ন থেকে কিছুটা মুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্তুবাদী ধারণা আরও প্রসারিত হতে থাকে। অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণা (ফাইন পার্টিকল্‌স্‌) সংমিশ্রিত হয়ে আত্মার উদ্ভব—এই অভিমত সেই সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বস্তুবাদী চিন্তার প্রভাব ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। এই শতাব্দীতে একদিকে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বহুবিধ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে অলৌকিকতা ও ঈশ্বর-নির্ভরতা অনেকটা কমে যায়। অন্যদিকে সোশ্যালিজম-এর বিস্তারের ফলে তার একটি ধারায় যে সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তার উদ্ভব ঘটে উনিশ শতকের মধ্যভাগে তার নিরীশ্বরবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী মানস-প্রবণতা বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

অষ্টাদশ শতকের প্রধান দর্শনবিদ্‌, জার্মানির ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)কে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্ন তুলতে দেখি তাঁর "ক্রিটিক অব্‌ পিওর রিজন্‌" (১৭৮১) গ্রন্থে। যুক্তি থেকে জ্ঞানে পৌঁছনো যায় কিনা, 'রিজন্‌' থেকে 'নলেজ'-এ পৌছনো সম্ভব কিনা—এই প্রশ্নটি তুলেছেন তিনি। তিনি প্রথম বলেন যে, মানুষ যা দেখে তা বস্তুর স্বরূপ নয়। তা হল বস্তু সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা। তাঁর মতে জ্ঞান হতে পারে দু-রকম—বিশ্লেষণী জ্ঞান (অ্যানালিটিক্যাল) যার সঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। আর সংশ্লেষণী জ্ঞান (সিন্থেটিক)—যা অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। তবে অভিজ্ঞতা যে সর্বদাই ব্যক্তির মন্ময়তার সঙ্গে যুক্ত—এই সত্যটি তিনিই প্রথম স্পষ্ট করে দেন। ফলে তাঁর লেখাতেই সেই বিশ্লেষণী চিন্তন-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় যা বিরুদ্ধ ভাবনাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ ডায়ালেক্টিক বা দ্বান্দ্বিকতার প্রাথমিক চিন্তাসূত্রকে তিনিই প্রথম গভীরতর জীবন-দর্শনের সঙ্গে, বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের সম্মিলিত জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন। যুক্তিবাদ (রিজন) ও পরম্পরাসিদ্ধ সামাজিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান (এম্পিরিজম্‌)—এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের কথাও বলেন তিনি। তার আগে ডায়ালেক্টিক বা দ্বান্দ্বিকতা বলতে প্রধানত বাক্‌চর্চার একটি পদ্ধতি এবং চিন্তার বিরোধ ও স্ববিরোধকেই সাধারণভাবে বোঝাত। বস্তুবাদী চিন্তক রূপে কান্ট-এর স্থান অতি উচ্চে। বিজ্ঞানই হল জানা (knowing) আর মেটাফিজিক্স বা অধিবদ্যা হল ভ্রান্ত, অনুমানভিত্তিক ধারণা (false speculative thinking)—একথা তিনি বলেছিলেন।

কিন্তু আমরা এ-ও দেখতে পাচ্ছি যে, চিন্তন পদ্ধতির দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কেও তাঁর

মনে জিজ্ঞাসা ও ভাবনার উদয় হয়েছিল। তিনি সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ে কিছু লিখেছিলেন। তাঁর সমকালে এবং তাঁর পরে আরও অনেকেই জীবনদর্শন-ভাবনার সঙ্গে এই দ্বান্দ্বিতার ধারণাকে মিলিয়ে দিতে শুরু করেন।

ইতিহাসের এই পর্বে এসে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিকতার ধারণা পরস্পর-সন্নিবদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করল। এতক্ষণ আমরা বস্তুবাদী দর্শনের উন্মেষ ও বিকাশের ধারা অনুসরণ করেছি। দ্বান্দ্বিকতার ধারণাটির প্রাচীনত্বের সন্ধানও আমাদের করতে হবে।

কথোপকথন বা মত বিনিময় তথা 'ডিসকোর্স' ব্যাপারটি খুবই প্রাধান্য পেত প্রাচীন গ্রিক ও রোমক শিক্ষিত সমাজে। চিন্তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর উন্মোচিত হয়, চিন্তনের পরিসীমা বিস্তৃত ও বিকশিত হয় মত বিনিময় ও বিতর্কের দ্বারাই—এই সত্য অনুভব করেছিলেন তাঁরা। যে -কোনো কার্যক্রমের ভিত্তি যদি বহু মতের বিচার ও সমন্বয়ের দ্বারা গঠিত না হয় তাহলে সেই কাজ হয়ে দাঁড়ায় স্বৈরতন্ত্রী। একথা বুঝেছিলেন বলেই প্রাচীন গ্রিস ও রোমের প্রশাসন ব্যবস্থায় এক ধরনের গণতন্ত্র ছিলই। আর ছিল সেই গণতন্ত্রীয়তার সঙ্গে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্রের নিত্য সংঘাত। যাই হোক, মত বিনিময়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করবার ফলেই বাক্‌চর্চাকে একটি শিল্প, কলাবিদ্যা ও প্রশিক্ষণযোগ্য বিষয় বলে মনে করতেন তাঁরা। বাক্‌চর্চা শিক্ষণের সূত্রেই 'ডায়ালেকটিক' বা 'দ্বান্দ্বিকতা' শব্দটি প্রথম প্রযুক্ত হয় গ্রিক ভাষায়। আদিতে শব্দটির অর্থ ছিল—যৌক্তিক চিন্তন-পদ্ধতির সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়া। পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থে বিভিন্ন ব্যঞ্জনা দেখা দেয়। একটি অর্থ হয়ে ওঠে—অভিজ্ঞতার সাহায্যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। যা নিছক সাবয়ব অস্তিত্ব—তারই দৃষ্টান্তের সাহায্যে নিরবয়ব চিন্তন বা দর্শনকে মনের মধ্যে স্পষ্ট করে তোলা। অভিজ্ঞতালব্ধ যাবতীয় দৃষ্টান্ত, বিশেষত সামাজিক ক্ষেত্রে—একই জাতীয় হয় না। অথচ তত্ত্বের থাকতে হবে সার্বজনিক ভিত্তি। কাজেই এই বিরোধী দৃষ্টান্তগুলিকে তুলে ধরে, ব্যাখ্যার পথে স্ববিরোধকে অতিক্রম করে তত্ত্বে পৌঁছনো—এই পদ্ধতির একটি নাম হল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। ক্রমে, অষ্টাদশ শতকে, চিন্তন-পদ্ধতিকে দেখা হল একটি ধারণা ও তার বিরোধী ধারণার অবিরত সংঘাতের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা এক গ্রহণযোগ্য তৃতীয় ও পূর্ণতর ধারণার প্রতিষ্ঠার প্রযুক্তি হিসেবে। অর্থাৎ থিসিস ও অ্যান্টিথিসিস-এর সংঘর্ষের ফলে জাত সিনথিসিস-এ পৌঁছনোর পথ রূপে যে চিন্তন-প্রক্রিয়া গৃহীত হল তাকেই দ্বান্দ্বিক চিন্তা-পদ্ধতি বলা হতে লাগিল।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে জিনো (Zeno, জন্ম ৪৯০ খ্রিস্টপূর্ব) নামক এক চিন্তাবিদ স্বতোসিদ্ধ ধারণাগুলির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে থাকেন। বস্তুর অস্তিত্ব, নিরন্তর গতি, বস্তুর বহুত্ব ইত্যাদি স্বতোসিদ্ধের উপরেই কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনের বহু তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবটাই স্বতোসিদ্ধ। কিন্তু জিনো এই ধারণাগুলি সম্পর্কে নানাধরনের

প্যারাডক্স অর্থাৎ স্ববিরোধী প্রতিকল্প উদ্ভাবন করেন। জিনো-র প্যারাডক্স বহুখ্যাত। তাঁকেই দ্বন্দ্বিকতার ধারণার আবিষ্কর্তা বলেছেন অ্যারিস্টটল। স্ববিরোধকে বুঝতে হবে শর্ত দিয়ে। প্রশ্ন তোলা, তর্কের পথে চিন্তার বিবর্তন এবং সম্ভাব্যতার যুক্তিকেও বোঝবার ও স্বীকার করবার পথ খোলা রাখা চাই। বিশ্ব-স্বরূপকে কেবল বস্তুর অস্তিত্ব দিয়ে নয়, নিরবয়ব চিন্তনের পথেও অনুভব-গম্য করা দরকার। খুব স্থূলভাবে বললে দাঁড়ায়—বস্তুবাদ হল বিশ্বের সাবয়ব অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের পথে বিশ্বস্বরূপের ব্যখ্যা। আর, দ্বান্দ্বিকতা হল বস্তুবিশ্ব ও বস্তু সম্পর্কের নিহিত সংঘাত, বিরোধ ও স্ববিরোধের বিশ্লেষণ প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে জগৎ-অস্তিত্ব ব্যাখ্যার প্রয়াস।

বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিকতা—এই দুই ধারণার সমন্বয় কান্ট-এর চিন্তায় প্রথম দেখা দেয় তা আগেই বলা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যেসব সিদ্ধান্ত (জাজ্‌মেন্ট) বস্তুজগতের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যায় (ট্র্যান্‌সেন্‌ডেন্টাল) তার মধ্যে ভ্রান্তি (ইলিউশন) থাকে এবং সেই ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক (ন্যাচারাল) ও অবশ্যম্ভাবী (ইনএভিটেবল)। কান্ট-এর চিন্তার মধ্যে থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস—এই দুটি ভাবনা-স্তর পাই। কিন্তু সংশ্লেষ ধারণা তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না।

সিদ্ধান্ত, প্রতিসিদ্ধান্ত এবং সংশ্লেষ—চিন্তা-পদ্ধতির এই ত্রিস্তর কাঠামো যাঁর লেখায় পাই তিনিও এক প্রখ্যাত জার্মান দার্শনবিদ যোহান্ গ্যাটিলিয়ে ফিখ্‌টে (Johann Gattilieb Fichte, ১৭৬২-১৮১৪)। তিনি এক ধর্মভীরু পরিবারের সন্তান ছিলেন। প্রথম জীবনে পড়েছিলেন ধর্মশাস্ত্র। প্রখর বিশ্লেষণী বুদ্ধি থাকার জন্য ক্রমে তিনি যুক্তিবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। কান্ট তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ধর্মভাবনা ও যৌক্তিকতার সমন্বয় সাধন করবার চেষ্টা করেন তিনি। ক্রমে তিনি এত বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে থাকেন—নৈতিকতা এবং চরম সুনীতিই হল ধর্ম—ধর্ম তার বেশি কিছু নয়—যে, কার্যত তিনি হয়ে ওঠেন নাস্তিকতার প্রবক্তা। মৎ-ময়তা (সাবজেকটিভিটি), পরিণত সত্তা (ফাইনাইট এবং ইগো), সত্তা-বহির্ভূত পদার্থের (নন্-ইগো) মধ্যে দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব আছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। তিনি ইতিহাস-দর্শনের কথা বলেন (ফিলজফি অব্ হিস্ট্রি)। সেই দর্শনের মূল তত্ত্ব হল—জীবনের ইতিহাস আদর্শ আর প্রবৃত্তির মধ্যে দন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রবৃত্তির উপর যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই মানবসভ্যতা উন্নত হয়—এই অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধিসম্মত ঘোষণা ফিখটেই করেছিলেন। দুটি সিদ্ধান্তকে সমন্বয়িত করে সংশ্লেষিত ধারণা বা সিনথিসিস-এ আসা যায়—তা ফিখ্‌টে বলেছিলেন। কিন্তু ধারণার মধ্যেই যে বিরোধী ধারণা এবং সিদ্ধান্তের মধ্যেই প্রতি-সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা থাকে—তা ফিখ্‌টে ভাবতে পারেননি।

ডায়ালেকটিক প্রসঙ্গে হেগেল-এর নামই বারবার উঠে আসে কারণ এই চিন্তন-পদ্ধতিকে তিনি অভূতপূর্ব এবং বিস্তার ও নতুন মাত্রা দান করেন। হেগেল

(Georg Wihelm Friedrich Hegel, ১৭৭০-১৮৩১) প্রথম বলেন যে সমস্ত কিছুর মধ্যে আছে স্ববিরোধ (কন্ট্রাডিকশন)। প্রতিটি অস্তিত্ব অভ্যন্তরীণ বিরুদ্ধতার (ইনার অপোজিশন) মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। হেগেলও কিন্তু সম্পূর্ণ বস্তুবাদী ছিলেন না। তিনি আত্মসত্তা (স্পিরিট) মানতেন। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থের নাম ফেনোমেনোলজি অব্ স্পিরিট' (১৮০৬)। আইডিয়া ও ভাবাদর্শের জগৎও স্বীকার করতেন তিনি। স্বীকার করতেন চরম সত্য বা সুপ্রিম রিয়েলিটি-র অস্তিত্ব। তিনি মনে করতেন মানুষের আত্মসত্তা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে স্ববিরোধ অতিক্রম করে সমুন্নতি (হায়ার ইউনিটি) অর্জন করতে পারে। হেগেলই বলেন—দ্বান্দ্বিকতা কেবল একটি চিন্তাপদ্ধতি নয়, তা এক জগৎস্বরূপ প্রক্রিয়া (ওয়ার্ল্ড প্রসেস)। এটি সর্বাতিশায়ী এবং নিত্যবিবর্তনশীল একটি পদ্ধত। তিনি বলেন, বিরোধ ও স্ববিরোধ আছে বলেই অগ্রগতি আছে। অগ্রগতির জন্যই এই বিরুদ্ধতা থাকা দরকার।

উনিশ শতকের সমগ্র চিন্তন জগতে হেগেল-এর সুবিপুল প্রভাব পড়েছিল। একদিকে অস্তিত্ববাদী দর্শনবিদ সোরেন কিয়ের্কেগার্ড; অন্যদিকে নবীন সমাজতত্ত্বের উদ্‌গাতা কার্ল মার্কস—দুজনেই হেগেল-এর দর্শন থেকে নিজেদের চিন্তার বীজ আহরণ করেছিলেন। পার্থক্য ছিল এই —হেগেল যেখানে ছিলেন আত্মসত্তা ও আইডিয়ায় বিশ্বাসী, সেখানে কিয়ের্কেগার্ড স্থাপন করেছিলেন জগৎ ও সমাজ-আবদ্ধ ব্যক্তিমনের অসহায়তার যন্ত্রণাকে; মার্কস ও এঙ্গেলস সেখানে রেখেছিলেন সমাজ-বিবর্তনের ধারণাকে। কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিলেন সকলেই।

বস্তুবাদী চিন্তনের বিবর্তনে প্রত্যক্ষতাবাদী বা পজিটিভিস্ট দর্শনেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত হবে জ্ঞান—প্রত্যক্ষতাবাদী দর্শনের এই হল মূল কথা। এই দর্শনের সমর্থকেরা সকলেই অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাসী ও বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন। এঁদের মধ্যে ফরাসি দর্শনবিদ কোঁত (Auguste Comte, ১৩৯৮-১৪৫৭) বিশিষ্ট তাঁর সমাজ-ধারণার জন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন—প্রকৃত বিজ্ঞানবোধ থেকে সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে। বিজ্ঞান ও ইতিহাসবোধ মিলিত হয়ে গড়ে উঠবে নতুন মানববিজ্ঞান। তাকেই প্রকৃত সমাজবিদ্যা বলা উচিত। ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতাবাদের প্রবক্তাও তিনি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ছাড়া কোনো তথ্যই যথার্থভাবে অনুধাবন করা, তাঁর মতে, সম্ভব নয়।

বস্তুবাদ, দ্বান্দ্বিতা এবং আদর্শবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে উনিশ শতকের বহু চিন্তাবিদ গভীরভাবে ভেবেছিলেন। উনিশ শতক একদিকে বিজ্ঞানের বহুবিধ আবিষ্কার ও নব প্রযুক্তির যুগ। অন্যদিকে রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বের প্রসারের যুগ। রোমান্টিকতার ধারণায় আধ্যাত্মিকতার অনেকটাই স্থান আছে। উনিশ শতকীয় বস্তুবাদী চিন্তক রূপে আমরা মার্কস ও এঙ্গেল্‌স-এর সমকালীন দুই চিন্তাবিদের উল্লেখ করব।

জার্মান দর্শনবিদ ফয়েরবাখ্ (Andreas Ludwig Feurhach, ১৮০৪ - ১৮৭২) ধর্ম নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। খ্রিস্টধর্মকে 'অমানবিক' বলে ঘোষণা করায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ধর্মের বহুবিধ ভ্রান্তি ও স্ববিরোধ তিনি দেখিয়েছিলেন। বস্তুবাদী অস্তিত্বই তাঁর কাছে প্রকৃত অস্তিত্ব। তা সত্ত্বেও ধর্ম এবং ঈশ্বর-ধারণাকে তিনি মানবজীবন থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করেননি। ফয়েরবাখ বলেছিলেন—মানুষের ইচ্ছা, কল্পনা, অনুভূতি, আবেগ ও নিজেকে সমুন্নত করে তোলবার আকাঙ্ক্ষার সমন্বয়েই ধর্মের জন্ম হয়। ঈশ্বরধারণা পশু থেকে মানুষকে পৃথক করে। ঈশ্বরধারণার মধ্যে মানুষ মানবতার নির্যাসকে সন্ধান করে। দর্শনকেও তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন—ভাববাদী দর্শন ও বস্তুবাদী দর্শন। এই ভাববাদী ঝোঁকের জন্য ফয়েরবাখ সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে সমালোচিতও হয়েছিলেন।

অপর চিন্তাবিদ্ ছিলেন লোট্‌জে (Rudolph Hermann Lotze, ১৮১৭ - ১৮৮১)। তাঁর চিন্তনেও ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়ের প্রয়াস আছে। তিনি অধিবিদ্যায় (মেটাফিজিক্স) বিশ্বাস করতেন কিন্তু অলৌকিকতায় (সুপারন্যাচারাল) নয়। অধিবিদ্যার ধারণা বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্যের বাইরে যেতে পারে না বলে মনে করতেন তিনি। অধিবিদ্যাকে মনে করতেন মানুষের নীতি ও আদর্শ। মানুষের সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক চেতনায় বিজ্ঞান ও ধর্ম, যুক্তি ও সত্তা, জ্ঞান ও মূল্যবোধ—সবই সংমিশ্রিত থাকে বলে মনে করেছেন লোট্‌জে।

উনিশ শতকের মধ্যবিন্দু থেকে দ্বিতীয়ার্ধের কালপর্বে মার্কস এবং এঙ্গেলস ছিলেন সম্পূর্ণ বস্তুবাদী সমাজতত্ত্ববিদ। তাঁদের ভাবনায় বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মিলিত হয়ে গড়ে উঠল এক সম্পূর্ণ বিশ্বধারণা। আধুনিক পাঠকের কাছে বহু পরিচিত এই ধারণাটির ব্যাখ্যায় আমরা যাব না। সূত্রাকারে অভিমতটির বিন্দুনির্দেশ করে আমরা কবিতার প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করব।

* সমাজের উদ্ভব, গঠন ও বিবর্তন জগতের বাস্তব পরিস্থিতিরি উপর নির্ভরশীল। তা দ্বান্দ্বিকতার পথে, বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে অগ্রগতিমান।

* বাস্তব পরিস্থিতি ও গতি সর্বদাই অলৌকিকতা ও কাল্পনিকতা থেকে মুক্ত।

* বাস্তব পরিস্থিতি বলতে মূলত বোঝায় জীবনযাপনের অপরিহার্য প্রক্রিয়া সমূহ। যথা উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রম বিভাজন, ক্ষমতার বন্টন, সম্পত্তির অংশ নির্ণয়, রাষ্ট্রিক ও পারিবারিক প্রশাসনতন্ত্র।

* মানবস্বভাব ও চৈতন্য এই পরিস্থিতির উদ্ভাবন।

* এই সবকিছু গতিশীল, পরিবর্তনশীল। গতিপথে বিরুদ্ধ উপাদানের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য। সংঘাত অতিক্রম করবার অর্থই অগ্রগতি।

মার্কস ও এঙ্গেলস-এর পরেও এই বিশিষ্ট দর্শনের ক্ষেত্রে বহু চিন্তাবিদ এসেছেন।

রুশ চিন্তাবিদ প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) একটু কম আলোচিত হন। কিন্তু তাঁর চিন্তনের বৈশিষ্ট্য বেশ লক্ষ করবার মতো। 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' শব্দবন্ধের প্রথম প্রবক্তা এঙ্গেলস। 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেন প্লেখানভ। আর একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ গ্রামসি। এখন তাঁর মতামত বহু আলোচিত হচ্ছে। তবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল দার্শনিক তত্ত্বে তাতে কোনো পরিবর্তন আসছে না।

আমাদের এই আলোচনায় মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের কোনো স্থান নেই। মার্কসবাদ সম্পর্কিত কোনো প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্যও নয়। আমরা দেখতে চেয়েছি—বিশ্বের দর্শন-ভাবনার সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিকতা— এ দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা কীভাবে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে তারই এক সংক্ষিপ্ত গতিপথ। এই দুটি ভাবনা অষ্টাদশ শতক থেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে আমাদের মনে গৃহীত হয়ে গেছে।

মানুষের চিত্ত যা কিছু গ্রহণ করে তারই প্রকাশ দেখা যায় তার সৃষ্টির ভুবনে। তার শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণার এই পরিগ্রহণ একালের বাংলা কবিতায় কোনো বিশেষ অভিমুখীনতা ও রূপবন্ধের জন্ম দিয়েছে কিনা তাই আমাদের সন্ধেয়।

কবিতা বিচিত্ররূপ। সব কবিতাকেই একই ছকে ফেলা যায় না। তা করবার চেষ্টাও অনুচিত। জীবনে যা আছে তা শিল্পেও থাকতেই হবে, এমন দাবি এখানে আংশিক। কারণ জীবন এক অনাদ্যন্ত ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। তারই খণ্ড অংশ নির্বাচন করে নিয়ে লেখা হয় কবিতা। বিশেষত লিরিক—যা, জীবনের একটি খণ্ডের মধ্যে উপলব্ধির পূর্ণতা বিম্বিত করবার লক্ষ্য নিয়ে রচিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুণেই মহাকাব্য, উপন্যাস, নাটক এমনকী গান থেকেও আলাদা হয় ভাষিত ও পঠিত কবিতা।

কবিতা লেখা হতে পারে একটি উপলব্ধির মুহূর্তকে অবলম্বন করে। সেই মুহূর্তটি প্রেক্ষিতের আপেক্ষিকতায় চলমান হলেও শিল্পদৃষ্টিতে অনেক সময়ে একাগ্র লক্ষ্য-নিবদ্ধতায় স্থিরবিন্দুর মতো প্রতিভাত হতে পারে। লিরিক অনেক সময়েই সেই উপলব্ধি-বিন্দু-বলয়িত হতে পারে। সে-জাতীয় কবিতায় দ্বান্দ্বিক গতির সন্ধান খুব সফল হবে না। আবার খুব ছোটো কণিকা-কবিতার মধ্যেও জীবনের এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত হয়। অণু-কবিতা বা কবিতিকা (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) এই সংঘাত-বিন্দু ও তার উত্তরণকে বিশেষভাবেই পরিস্ফুট করতে চায়। এই আবর্ত ও গতি সার্থক অণু-কবিতার আকর্ষণ। দীর্ঘ ও মাঝারি-দীর্ঘ কবিতায় এই দ্বান্দ্বিক গতি খুবই দেখা যায়। আমরা যদি এই দৃষ্টিকোণকে সজাগ রাখি, তাহলে দেখব—একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, তার বিরুদ্ধশক্তি, বিরুদ্ধতা-অতিক্রমী গতি এই ত্রিস্তর নির্মাণ অজস্র কবিতায় পরিকল্পনা-কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত। অনেক সময়ে তা কবির সুচিন্তিত পরিকল্পনা। অনেক সময়ে তা কবির সচেতন চিন্তন ব্যতিরেকেই স্বতো-উদ্ভাসিত হয়। তা অস্বাভাবিক

নয়। কারণ এই দ্বান্দ্বিক গতি একটি বিশ্ব-স্বরূপ প্রক্রিয়া বলে মনে করেছেন বস্তুবাদী দার্শনবিদেরা। ব্যক্তিগতভাবে কারোর মনে সেই চেতনা যদি না-ও থাকে, তার ভাবনা, তার মনের অস্তিত্ব—এই প্রক্রিয়া-বহির্ভূত হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত মন ও চৈতন্যকে বস্তুবিশ্ব থেকেই উৎপাদিত বলে যখন তাঁরা মনে করেছেন।

(১) প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই;
সূর্য উঠি বলে তারে, ভাল আছ ভাই?

(২) কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।।

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' সংকলনভুক্ত এই দুটি ছোটো কবিতায় আমরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শনকে কবিতায় প্রয়োগ করবার দৃষ্টান্ত পেতে পারি। দুটি কবিতাই বস্তু-পৃথিবীর অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেছে এবং একটি পরিস্থিতির বাস্তবতার মধ্যে শুরু হয়েছে কবিতার ক্রিয়া। সেই ক্রিয়াশীলতার অব্যবহিত পরবর্তী স্তরে এসেছে বিরুদ্ধতা। ছোটো ফুলটিকে আক্রমণ করেছে অন্যেরা; সন্ধ্যারবির কাজ গ্রহণ করতে রাজি হয়নি কেউ। তারপরেই এসেছে বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করেছে এমন ভিন্নতর ক্রিয়া। সূর্য স্বাগত জানিয়েছে ছোটো ফুলটিকে। তাকে দিয়েছে বিরুদ্ধতা অতিক্রম করবার শক্তি। মাটির প্রদীপ সূর্যের কার্যভার গ্রহণ করেছে। অল্প হলেও দূর করেছে অন্ধকার। এইভাবেই জীবন অগ্রসর হয়েছে প্রগতির পথে। যদি বলেই ফেলা যায়—এই দুটি কবিতাকণার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে সোশ্যাল রিয়েলিজ্‌ম-এর তত্ত্ব—তাহলে তা খুব একটা ভুলও হবে না। নামহীন ছোটো ফুল আর মৃৎপ্রদীপে সমাজের পিছিয়ে পড়া বর্গের প্রতীক খুঁজে নিতে পারি আমরা। দ্বিতীয় কবিতার মাটির প্রদীপ স্পষ্টতই ঘোষণা করেছে সংগ্রাম। যদিও তার ভাষাটি বিনম্র।

কিছুটা দীর্ঘ কবিতায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী গতির পর্যায়ক্রম আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি সেই কবিতার পরিকল্পনায় কোনোরকম সমাজ-ভাবনার প্রবণতা থাকে তাহলে বিষয়টি হয়ে ওঠে খুবই স্বচ্ছ। 'চিত্রার'-র অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি দেখি। কবিতার প্রথম স্তরে একটি বাস্তব সমাজচিত্র—যদিও সময়টি অতীতকালের। ব্রাহ্মণ বালকেরা ঋষি গৌতমের আশ্রমবাসী ছাত্র। তারা পাঠ গ্রহণ করতে বসেছে। দৃশ্যটির প্রশান্তি ভেঙে দেয় এক আগন্তুক বালক। সেও ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে চায়, কিন্তু পিতৃপরিচয় জানে না। ব্রাহ্মণসন্তান না হলে ব্রহ্মবিদ্যা শেখার অধিকার নেই তার। বিরোধের

শাসন-তর্জনী তুলে ধরে আছে সমাজ। বালকটি জানতে পারে যে, সে অবৈধ সন্তান। বিরুদ্ধ পরিস্থিতি কঠিনতর হয়। কিন্তু সে মিথ্যাভাষণ করে না বা পালিয়েও যায় না। ঋষি গৌতমের কাছে সত্য কথাই জানায়। তাপস বালকগুলি তখন তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছে। ধিক্কার জানিয়েছে। বিরুদ্ধশক্তি হয়েছে প্রবলতর। কিন্তু ঋষি গৌতম তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার সত্যবাদিতার সদ্‌গুণকে গ্রহণ করেছেন ব্রাহ্মণত্ব বলে। রবীন্দ্র রচনায় অবশ্য প্রায়শই শ্রেণি-সংঘাত ও শ্রেণি-সংগ্রামের পর্যায় প্রদর্শিত হয়নি—বিশেষত কবিতায়। কিন্তু বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিকতার পর্যায়টি অনেকক্ষেত্রেই পরিস্ফুট। বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিকতাকে সমাজবীক্ষণের একটি দৃষ্টিকোণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন প্রধানত মার্কস ও এঙ্গেলস্। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিকোণকে একতম মনে করেননি। অত্যন্ত আগ্রহে যে গ্রহণ করেছিলেন—তা-ও বলা যায় না। তাঁর কবিমানসে দ্বন্দ্বোত্তরণের যে চলিষ্ণুতা ও শক্তি লক্ষ করা যায় তার সঙ্গে ঐশী প্রত্যয়ের সুস্থতা মিশে থাকে। তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় রেনেসাঁস-পর্বের হব্‌স ও দেকার্ত-এর কথা, যাঁরা বস্তুবাদকে স্বীকার করেছিলেন, আবার আধ্যাত্মবাদকেও অস্বীকার করেননি। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতায় দ্বন্দ্বোত্তরণের পর্বটিকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় না। কিন্তু মনের মুক্তির দিক থেকে তা প্রগতিপথের যাত্রিক হয়ে ওঠে। 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় মৈত্র মহাশয়ের জলে আত্মবিসর্জন তেমনই একটি দৃষ্টান্ত। তা শরীরের মৃত্যু, কিন্তু হৃদয়ের বিস্তার। বাইরের পরাজয়, অন্তরের অমরতা।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতিভাসকে নিয়ে এসেছেন। 'সোনার তরী'-র 'ঝুলন' কবিতা একটি সুন্দর উদাহরণ। এখানে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের ক্রিয়া থেকে শুরু হয়েছে কবিতা। সেখানে অন্ধকার রাত্রি, সঘন বর্ষা, সমুদ্র উত্তাল, প্রবল ঝড়— 'আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল'। কিন্তু এই বিরোধ বহির্বিশ্বের নয়। সংগ্রাম চলেছে মনের মধ্যেই —স্ববিরোধ। কবির প্রাণসত্তার স্বাধীনতার সঙ্গে সাবধানি সাংসারিকের আত্মবিরোধ। কবি ও সাংসারিক সেখানে একই ব্যক্তি। এই আলোড়নের মধ্যে নিজেকে তিনি অনুভব করেন—'নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে হৃদয় নাচে'।

চতুর্থ স্তবকে, যেন ফ্ল্যাশব্যাক-এ কবি ফিরে দেখেন মনের অতীতকে। যখন দিন কেটেছে নিশ্চিন্ততায়, সুখে, বিলাসে, তথাকথিত শান্তিতে। কোনোভাবেই বিচলিত হয়নি মন। তাকে বলি সুখের স্থিতাবস্থা। কিন্তু সেই পরিস্থিতিই ডেকে আনে ভিতরের বিরুদ্ধতা। 'শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরাণ আলসরসে,/ আবেশবশে।/পরশ করিলে জাগে না সে আর/কুসুমের হার লাগে গুরুভার,....।' অতঃপর নিজের সঙ্গে নিজেরই আত্মার সংঘাত—যার চলচ্ছবিতে কবিতার শুরু। আলোড়ন প্রশমিত হয়নি, কিন্তু কবিহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে সংশয়। চিনে নিয়েছে নিজের সম্মুখ পথ—"প্রাণেতে

আমাতে মুখোমুখি আজ/চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,.....” এই মনোমুক্তির সন্ধান, এই প্রগতি বিহারের ঠিকানা রাখেন হৃদয়বান কবি আর সহৃদয় পাঠক। শ্রেণি-সংগ্রামের দ্বান্দ্বিকতা এখানে বাস্তব ঘটনার বিবরণের মধ্যে নিহিত নেই। তবু এই কবিতাও দ্বান্দ্বিকতার তো অবশ্যই, বস্তুবাদেরও কবিতা। কারণ মন ও চৈতন্য বস্তুবিশ্বেরই উৎপাদন—একথাই বলেছেন ধ্রুপদী বস্তুবাদীরা।

অন্য ধরনের একটি কবিতার দিকে তাকাই। দীর্ঘ কবিতা—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘অর্কেস্ট্রা’। বিদেশের কোনো এক রঙ্গালয়ে অর্কেস্ট্রা শুনতে গেছেন কবি। বাদন শুরু হয়। কবির মনে সমান্তরাল ধারায় বহমান থাকে এক তপ্ত অথচ স্নিগ্ধ প্রেমের স্মৃতি। একটি পরিস্থিতির বিন্দু থেকে অর্কেষ্ট্রা, কবির মন আর কবির স্মৃতির সম্মিলিত চলা শুরু হয়। এই গতিপথ সরল ও একমুখী নয়। কখনও আশা, কখনও নৈরাশ্য, বিপন্নতা আর প্রসন্নতা পর্যায়ক্রমে কবির মনকে আলোড়িত করে। স্রোত ও প্রতিস্রোত দ্রুত পথ পরিবর্তনে বাধ্য করে কবিচিত্তবকে। দ্বান্দ্বিক গতির চমৎকার নিদর্শন এই কবিতা। ক্রমে অর্কেস্ট্রার ঐকতানে প্রশান্তি নেমে আসে। কবির হৃদয় সেই প্রশান্তিতে নিমজ্জিত হতে গিয়েও অনুভব করে তার বেদনা অন্তহীন হয়ে আছে। গতি শেষ হল না। মনকে যেতে হবে আরও দীর্ঘ পথ। এইভাবে কবিতা শেষ হয় কিন্তু ‘সাঙ্গ করি না হইল শেষ’-এর অনুভব থাকে জাগ্রত। দীর্ঘ কবিতাটির সামান্য অংশ উদ্ধার করছি—

“ত্রিযামা রাতি চাহিয়া বৃথা যারে,
জাগিল ধরা বিজন ফুলশেজে,
.....
সে আসে ওই, সে আসে ওই দূরে,

ললাট তোমার দিনের আশিষে দীপ্র;
নয়নে তোমার অমর প্রাণের লাস্য;
নিঃশ্বাস তব প্রণব আবেগে ক্ষিপ্র;
তুমি প্রসন্ন অধরার স্মিত হাস্য।।

খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেন, ‘তোমার প্রেমে
নই কি আমি প্রথম আগন্তুক?”
অবাক বিষাদ এল তোমার চক্ষে নেমে;
রক্তে ভাঁটা ফিরিয়ে নিলে মুখ।।
লুপ্ত হল আধারবিন্দু বিশ্ব হতে;

খিল খসাল নাস্তি পুনর্বার;
ভাগ্যরবি চলল ছুটে পাতালপথে;
চতুর্দিকে আদিম অন্ধকার।।

স্পর্ধা মোর পড়েছে টুটে;ভ্রান্তি মোর গিয়েছে;
দৃপ্ত শির পঙ্কে লুটে তোমার চরণাম্বুজে;

মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে,
আমার অমরা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।।

গভীর আবেশে নিমীলিয়া আসে চোখের পাতা।
বিধির আশিস মুকুটিত করে যুগল মাথা।।

...শান্তি-শান্তি-শান্তি চারিধারে!
কেবল অন্তর মোর উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকারে।।

প্রেম-অনুভব কেন্দ্রিক দ্বান্দ্বিক গতিময় কবিতা একাধিক লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ।। তুলনায় তাঁর রাষ্ট্রিক-চেতনার কবিতা, সমকালের সমাজজীবন-উপলব্ধির কবিতাগুলি একমুখী ও নৈরাশ্য-প্রধান। এ-কারণে প্রগতিভাবনার বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক গতিপথের চলচ্চিত্রটি তাঁর লেখায় অনেক সময়েই অনুপস্থিত। যে-পাঠক ও সমালোচকেরা তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে কবিতায় এক নির্দিষ্ট সমাজভাবনা ও প্রগতিচিন্তা প্রত্যক্ষ দেখতে চাইতেন তাঁরা সুধীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে খুব উৎসাহিত ছিলেন না। সমর সেনের কবিতাও তাঁরা অনেকেই পছন্দ করেননি।

একই কারণে জীবনানন্দের কবিতা নিয়েও সংশয় ছিল তাঁদের। নৈরাশ্যের সুগভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত চেতনা-স্তর নিয়ে অনেক কবিতাই লিখেছেন জীবননানন্দ —যেখানে কবিচিত্তকে মনে হয় নিষ্ক্রিয়, পরাভূত এবং জীবনসংকটের মোকাবিলা করবার পরিবর্তে পলাতক। তাঁর উপলব্ধিকে মনে হয় বড়ো বেশি আত্মমগ্ন ও ব্যক্তিগত।

এই সমালোচনা সর্বাংশে ভ্রান্ত বলে মনে করি না। ভুলটা ছিল অন্য জায়গায়। সংগ্রামের উদ্দীপনা ও প্রগতির প্রত্যয় সংকেতিত না করলে ভালো শিল্প হতেই পারে না—এই বিশ্বাসটাই ছিল আংশিক। পরবর্তী যুগের মার্কসবাদী শিল্প-তাত্ত্বিকেরা এই আংশিকতা কাটিয়ে উঠেছেন। কবিতার আকাশ এখন সর্বত্র বহু বিস্তৃত।

জীবনানন্দের কোনো কোনো কবিতায় (‘ক্যাম্পে’, ‘তিমির হননের গান’) কিন্তু বস্তুবাদী জগৎ-ভাবনা; জীবন, সমাজ ও ব্যক্তিমনের দ্বান্দ্বিক গতি; সংগ্রামের নিত্যতা

এবং সংগ্রাম উত্তরণের পথে প্রগতি-যাত্রার প্রয়াস আশ্চর্য সাফল্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। একটি কবিতার দৃষ্টান্ত দেখি। 'বনলতা সেন'-এর ১৯৫২ সালের সংস্করণের অন্তর্গত 'সুচেতনা'। কবি জানেন সুচেতনা তথা শুভবোধের অস্তিত্ব আছে। এই পরিস্থিতি হল প্রথম পর্যায়। তারপর দ্বিতীয় স্তবক থেকেই শুরু হয় কঠিন বিরুদ্ধতা—'আমারই হাতে হয়তো নিহত/ভাইবোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;"—অনন্ত স্ববিরোধ। তবু সংগ্রামও অনির্বাণ—'তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।' মনের মধ্যে প্রত্যয় —'এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।' প্রত্যয়ের সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন দায়িত্বভারের দুরূহতার বোধ। 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।' কবিতার শেষ দুই পঙক্তি দ্বান্দ্বিক চেতনার অতুলনীয় অভিব্যক্তি—'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়'।

অমিয় চক্রবর্তী চিরকাল ছিলেন মানবসভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন একজন শিল্পী। তাঁর কবিতায় হতাশার সুর প্রায় নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি উৎখাত করেছে বহু মানুষকে। মানুষ তবু ঘর গড়ে তোলে দূর দূর দেশে গিয়ে। আপন করে পরকে। হার মানে না কিছুতেই। এই দৃশ্যাবলি ও ভাষ্যমালা তাঁর বহু কবিতায় প্রাপ্তব্য। 'ইতিহাস' ও 'চেতন স্যাকরা'—দুটি কবিতাই স্মরণ করতে পারি। 'চেতন স্যাকরা'-য় এই প্রত্যয় এক প্রতীকের রূপাবয়বে ব্যক্ত। সেই চেতন স্যাকরা। আপাতদৃষ্টিতে গরিব, আধবুড়ো লোকটি; নালার উপর ছোটো কুঁড়ের দাওয়ায় কাচের বাক্সে রাখা তার হাতের তৈরি গয়না। সে কবিতার শেষে প্রতিভাত হয় সুন্দরের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা এক মানুষ রূপে। চতুষ্পার্শ্বের সব মালিন্য, দীনতা, চতুরতার ঊর্ধ্বে। সে সেই জাগ্রত চৈতন্য, যে সুন্দরকে নির্মাণ করে নেয় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ছেনে। মনের সোনার কারিগর। চেতন স্যাকরা।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই গতিস্পন্দন সর্বাধিক। তিনি শিল্পী হিসেবেও এ বিষয়ে ছিলেন সচেতন। তিনি সমাজ-প্রগতির চালক শক্তিরূপে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিসর্জন দেননি শিল্পীর স্বাধীনতাকে। সেই সময়ের মার্কসবাদী শিল্পভাবনার সূত্রে জেগে ওঠা বিতর্কের কথা তাঁর প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হয়। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকেই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য মনে করা হত। লুকাচ, গোর্কি, কডওয়েল, ঝানভ, আরাগঁ এই অভিমতের পক্ষে ছিলেন।

সাহিত্যের উপর এই অনুশাসন প্রসঙ্গে ঝানভ্-এর কড়া মনোভাবকে ও অভিমতকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় ওঠে চল্লিশের দশকের মধ্যভাগে। শিল্প-সংরূপের নান্দনিক সমগ্রতার ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে। এই অভিমতের সমর্থক ছিলেন গারোদি, কিছুটা ফিশার, পরবর্তীকালে গোল্ডমান ও অ্যাডর্নো। বিষ্ণু দে ছিলেন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol. III Issue-VI

এই স্বাধীনতার পক্ষে। ছিলেন তরুণতর সমর সেন। এইসব প্রসঙ্গ এখন বহু আলোচনার ফলে সকলেই জ্ঞাত আছেন।

কিন্তু বিষ্ণু দে আন্তরিক বিশ্বাসেই ছিলেন প্রগতিবাদী। মানব-সভ্যতার অগ্রগমন সম্পর্কে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিতে কবিতা বিচারের ক্ষেত্রে যে কাঠামোটির সন্ধান আমরা করছি—

(১) কবিতায় সমাজবাস্তব, জনশ্রেণি, শিল্পীমনের পরিস্থিতি ও ধারা—

(২) দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত। এই বিরুদ্ধতা স্ববিরোধের সত্যও হতে পারে—

(৩) সংগ্রাম অতিক্রান্ত অগ্রসরণের অন্তত একটি পদক্ষেপ।

এই ছক বিষ্ণু দে-র বহু গুরুত্বপূর্ণ কবিতায় পাব—বিশেষ করে ১৯৪১-এ প্রকাশিত 'পূর্বলেখ' থেকে ১৯৬৩ -তে প্রকাশিত 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পর্যন্ত রচিত কবিতাবলিতে ('টপ্পাঠুংরি', 'ক্রেসিডা', 'পদধ্বনি', 'জন্মাষ্টমী') এই পরিকল্পনার বিচিত্র নান্দনিক বিস্তার লক্ষ করা যায়। 'সন্দ্বীপের চর'-এর অনেক ছোটে। কবিতাতেও এই বিন্যাস পাই। পূর্ববর্তী কবিতা-গ্রন্থ 'চোরাবালি'-র 'ঘোড়সওয়ার' আর 'ওফেলিয়া'—দুটি কবিতাই এই জীবনদৃষ্টি তথা শিল্পবোধের রূপাধার হয়ে উঠেছে। সুবিখ্যাত 'ঘোড়সওয়ার'-এ উদ্দীপ্ত, প্রত্যয়-বিভাসিত সম্মুখ-যাত্রার ও যুদ্ধজয়ের অনুষঙ্গ ও উপলব্ধিই প্রধান। কিন্তু 'ওফেলিয়া'-র তমিস্রা-করুণ সংকট-নৈরাশ্য অতিক্রমী অন্তঃশক্তিতেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উপলব্ধির যথার্থতর প্রকাশ।

পরবর্তী পর্বের আরও কোনো কোনো কবির লেখায় এই মানস-অভিজ্ঞতার পর্যায়বিন্যাস খুঁজে পাই। তা বৃহত্তর আলোচনা-সাপেক্ষ। আধুনিক কাল পর্যন্তও এইভাবে অনুভব করবার মতো কবিতা অনেকেই পাব। এই উপলব্ধিকে কাব্যলগ্ন করার মতো কবিমানসের উপস্থিতি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এক জীবনজিজ্ঞাসা। আশা ও নৈরাশ্য, শক্তি ও ক্লান্তি, উন্মেষ ও তথাকথিত অবসান—জীবনবোধের এই সমগ্রতার অন্তস্তলে এই উপলব্ধির স্থান। কোনো নিশ্চিত 'অবসান' নেই এই প্রগতি-ভাবনার। 'এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা'; 'সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি/দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা'— এই জীবনসত্যই উঠে আসে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন থেকে।

■ ড. সুমিতা চক্রবর্তী—প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বনামধন্য কবি ও প্রাবন্ধিক

সুমন গুণ

বাংলা ভাষাচর্চায় গদ্য আর কবিতার অন্তর্ঘাত

'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন-পৌষ, ১৩৬৪ সংখ্যায় 'সরকারি ভাষা কমিশনের বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' জানিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। এখনও পর্যন্ত ভাষার দহন ও অহঙ্কার রক্ষায় বাংলায় লেখা সেরা গদ্য এটি। ভাষার আসল জোর কোথায় তা জানিয়ে তাঁর দুর্মুল্য গদ্যে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'ভাষা কোনো উপায়মাত্র নয়, ভাষাই উৎস, চিন্তা থেকে ভাষা নির্গত হয় না, ভাষাই চিন্তাকে জন্ম দেয়।'

এই কথাটি আমার নানা সূত্রে প্রায়ই মনে পড়ে। বিশেষ করে নানাজনের লেখা নানা বিষয়ে বাংলা গদ্য পড়তে পড়তে বুদ্ধদেবের কথার মর্ম টের পেয়ে সচকিত হয়ে উঠি।

রবীন্দ্রনাথের পরে, বাংলা গদ্যের কিছু প্রকাশ্য ঘরানা আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর ঘরানাটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। সফলতা বা প্রতিষ্ঠার নানা সংজ্ঞাঘটিত জটিলতা আছে। সেসবে না গিয়ে এটুকুই শুধু বলা যায় যে, গদ্যে একটা প্রাঞ্জল মুনশিয়ানা রক্ষা করে বলার কথাটা বজায় রাখা এক ধরনের গদ্যের বৈশিষ্ট্য। এই গদ্যে শব্দ নিয়ে, শব্দের নানা কুশলী সম্ভাবনা নিয়ে উত্তেজক চর্চা থাকে। গদ্য এখানে আলাদাভাবেও লক্ষ্যণীয়। এমনও বলা যায় যে, গদ্যের স্বাদুতা যাতে টোল না খায়, সেদিকে নাছোড় মনোযোগ থাকে লেখকের। এই মনোযোগের রকমফের থাকে, মাত্রার কমবেশি থাকে, কিন্তু গদ্যের সুডৌল একটা ছাঁদ অক্ষুন্ন রাখাটা এই ধারার সব গদ্যভঙ্গির একটা মৌলিক লক্ষণ বলে মেনে নেওয়া যায়।

এখানে একটা কথা বলার আছে। এই ধরনের গদ্য লেখার জন্য কিন্তু সহজাত কবজির দরকার হয়। এটা চেষ্টা করে হয় না। উল্টোদিক থেকে বলা যায়, মননচর্চার সহযোগ ছাড়াও এই ঘরানার গদ্য প্রাথমিকভাবে তৈরি করে ফেলা সম্ভব। আমি এই লেখায় মূলত বলছি কবিদের গদ্যের কথা। যাঁর হাতে এই ধরনের গদ্য আছে, তিনি চিন্তাশীলতার স্রোতের ধার দিয়ে দিয়ে তাঁর গদ্যকে গড়িয়ে দিতে পারেন। স্রোতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখে অবিকল সাবলীলতায় সেই গদ্য মহাকালের দিকে এগিয়ে যাবে।

কাজটা যে কত অসম্ভবরকম কঠিন, সেটা বাংলা ভাষার পরিশ্রমী লেখকদের বিপুল গদ্যচর্চার দিকে তাকালেই মালুম হয়। আর তখনি মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর কথা। কত অকাতরে শব্দ খরচ করে চলেছি আমরা। অনুভবের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে, বক্তব্যের মান্যতার দিকে মন না দিয়ে পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছি। বুদ্ধদেব বসু কথাগুলি

বলেছিলেন অন্য প্রসঙ্গে। ষাটের দশকের শেষদিকে সরকারি ভাষা কমিশন ২৬১ পাতার ঢাউশ বিবৃতিতে সব 'আঞ্চলিক' ভাষাকে একদিকে ঠেলে দিয়ে হিন্দিকেই যোগাযোগের ভাষা হিসেবে শীলমোহর দিতে চাইলেন। কিন্তু ভাষা যে নিছক যোগাযোগের নিরীহ মাধ্যমই নয়, তা যে সাহিত্যের সৃষ্টির একটি সূত্রও, তা কমিশনের সদস্যরা বুঝতে চাননি। ভাষা যে অর্থে মাধ্যম, সে অর্থে তো সব ইতর প্রাণীরও ভাষা আছে। শারীরিক ও মানসিক নানা প্রয়োজনেও তো আমরা 'সাড়া' দিই। এইসব তাৎক্ষণিক যোগাযোগের পরেও ভাষার যে-সামাজিক ভূমিকা, তার দিকেই তাকিয়ে থাকেন সমাজের কর্তারা। ফলে সারা ভারতে একটাই ভাষা চালু করে দিলে কাজের সুবিধে হবে, একথা সহজে তাঁরা ভেবে ফেলতে পারেন।

এই ভাবনার উৎস মনের যে-প্রকরণ, সেখান থেকেই ভাষা সম্পর্কে এক সহজ উদাসীনতার জন্ম হয়। গদ্যও হয়ে ওঠে নিরুত্তেজ, পরিবহনহীন।

গদ্যকে দিয়ে কথা বলানোর জন্য গদ্যের দিকে তাকাতে হয়। হাতের কাছে যে-শব্দ আসছে তাকে নেবার আগে থামতে হয়, মেপে নিতে হয় তার ওজন, তার ধার কতটা না বুঝে চেলে দিলে সর্বনাশ অবধারিত। এটা, এই সচেতন রচনার ব্যাপারটা, দুভাবে হয়। একটার কথা তো বললাম, সহজাত গদ্যরচনার হাত থাকলে এটা ভেতর থেকে হয়ে আসে। বুদ্ধদেব বসুর সূচনাপর্বের লেখাগুলি বাদ দিয়ে যে কোনও সময়ের যে-কোনও রচনা পড়লেই এই ঘরানার শীর্ষ চেনা যাবে। আর কিছু না পড়ে আবার শুধু 'ভোজনশিল্পী বাঙালি' নিয়ে বসলেই হবে। রকমারি বাঙালি রান্নার ঢালাও বর্ণনা পড়তে পড়তে রসনা সরস হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ বুদ্ধদেবের গদ্যভঙ্গির অনুপম স্বাদুতা। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে খাবার বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি একবার, আমি দুর্বলতম স্মৃতিশক্তি নিয়ে সেই আপ্লুত বর্ণনার একটা অংশ এখুনি লিখে দিতে পারি ঃ

'আজ থালা-বাটি সব নিকষ-কালো পাথরের, সেই কালোর উপর জুঁই ফুলের মতো শুভ্র অন্ন শুভ্রতর হয়ে শোভা পাচ্ছে, বাটিতে-বাটিতে সুসজ্জিত ব্যঞ্জন থেকে নানান ধরনের অনুকূল গন্ধ উঠছে।'

বুদ্ধদেবের এই অনুকূল গদ্যভঙ্গিটির উৎস আসলে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গদ্যেরও এমন পরিশীলিত গতিময়তা আছে। বুদ্ধদেব নিজে এই লক্ষণটি খেয়াল করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প' প্রসঙ্গে লিখেওছিলেন তা ঃ

'এই ধরণের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে যুক্তি অথবা তথ্যে ভ্রান্তি ধরা পড়লেও রচনাটি অনাহত থাকে, কেননা তাদের মৌলিক অনুভূতিটি প্রমাণনির্ভর নয়, সংক্রামক, অতএব চিরকালই মূল্যবান।'

বাংলায় এই স্বয়ম্ভর গদ্যের চর্চার একটা সম্মানিত ধারা আছে। আমাদের মান্য বেশ

কয়েকজন গদ্যশিল্পী এই ঘরানার আওতায় আছেন। শঙ্খ ঘোষ, মনীন্দ্র গুপ্ত সহ আরও কয়েকজনের গদ্যে, সুবীর রায়চৌধুরীর ভাষায় বলা যায়, সেই 'গৃহিণীপনা' পাই, যা তাঁদের ভাষাকে 'সপ্রাণ বাংলা' করে তুলতে পেরেছে। শঙ্খ ঘোষের এই সেদিনের বই 'বটপাকুড়ের ফেনা' পড়তে পড়তেও টের পাচ্ছি, তাঁর গদ্যের মধ্যে সবসময় মেধাবী আহ্লাদ জাগ্রত থাকে, তার ডানা মেলার আওয়াজ। শঙ্খ ঘোষ-এর জার্নাল আমরা আগে পড়েছি, কিন্তু এই বইটির লেখাগুলি আরো উদ্দীপ্ত, উৎসুক ও আত্মস্থ। লেখক নিজে 'ক্ষণিক ভাবনা' বললেও, (এক অর্থে সব ভাবনাই তো, এই মুহূর্তের প্রেক্ষিতে ক্ষণিক) এই বইয়ের অনেকগুলি লেখায় ধরা আছে সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে মনস্ক চর্চাও। কোনো লেখাই খুব বড়ো নয়, কিন্তু অনুভূতির সচ্ছল অনুবাদ রূপবান প্রতিটি রচনাই। হয়তো, ছোটো বলেই আরো নির্ভার, সমাধানহীন হতে পেরেছে লেখাগুলি। আর এই লেখার মধ্যে যে ভাবনা, তা যেহেতু 'সকলের জন্য নয়', 'একেবারেই তা নিজের কাছে, নিজের জন্য', তাই বিভিন্ন মৌলিক ঘরানায় তা লেখা হয়ে উঠতে পেরেছে। কখনো কাহিনির ছন্দে, সংলাপের বিন্যাসে, জিজ্ঞাসার কৌশলে এক-একটি লেখা এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন লেখক যে সবটা মিলিয়ে এই বইয়ের শৈলির প্রতি একটি অভিমতহীন কৃতজ্ঞতা তৈরি হয়। এই বইয়ের লেখাগুলির সংলাপের একটা নিঃশব্দ বৈশিষ্ট্য আছে। সংলাপ সাধারণভাবে এখানে যতটা লেখকের বক্তব্য জানানোর জন্য বসানো, ততটা বক্তার প্রতি অনুগত নয়। অনেক সময় আধপাতা বা তারও বেশি জুড়ে বলে যান কেউ, কিন্তু পড়তে যে অস্বস্তি হয় না, তার কারণ লেখক নিজে কথার জোড়গুলিকে খুলে খুলে দেন, জায়গামতো বেসামালও করে দেন কখনো কখনো, ফলে উদ্দেশ্যপূরণের এক একটি ধাপ পার হতে হতে পাঠক বিষয়ের ভেতরে ঝাঁপ দিতে পারেন। কখনো একটি চিঠি, কখনো কোনো মানুষ, তার ব্যবহার, সদ্য-পড়া কোনো লেখা, হঠাৎ মনে পড়া কোনো ঝলক—সব নিয়ে ডালপালা মেলে দিয়েছে এই বইয়ের অবধারিত লেখাগুলি, যা, আমার বিবেচনায়, বুদ্ধদেবপ্রবণ বাংলা গদ্যের ধ্রুপদি নজির।

কিন্তু, বাংলা গদ্যের আরও একটি প্রবল প্রবণতা আছে। আর সেই ঘরানার মাথায় আছেন বুদ্ধদেবেরই সতীর্থ, জীবনানন্দ দাশ। এই চলনটির শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে, 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে। কথা আর ঘটনার মাঝামাঝি গোত্রের লেখা বলে এই লেখায় প্রবন্ধ আর কাহিনির মেশানো ছাঁদ ছিল, যার একটা রূপ নক্সা নামে পরিচিতি পেয়েছে। প্যারিচাঁদের ভাষায় কোনও গোলগাল বাঁধুনি নেই, তথাকথিত সাধু চলিতের বেড়া-দেওয়া সাবধানতা নেই, এই কথায় 'গৃহিনীপনা' নেই। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে পরিপাটি করে তুলতে চেয়েছিলেন, এখনও পর্যন্ত বাংলা গদ্য যখনি সুঠাম হয়ে উঠতে চেয়েছে, তখনি বিদ্যাসাগরের কাছে হাত পাততে হয়েছে। বুদ্ধদেবের ঘরানাটি এই

পর্বের। কিন্তু প্যারিচাঁদের ভাষা এগিয়েছে ভেতরের দিকে, অগোছালো আর আত্মমনস্ক ভঙ্গিতে।

'কবিতার কথা'র যে-গদ্যভঙ্গি, তার মধ্যে কোনও সচেতন সৌকর্য নেই। নাম-প্রবন্ধটির অপরিচিতি সূচনা বাক্য দুটি আবার পড়ুন ঃ 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি——কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।'

তিন-চার লাইনের একটি বাক্যে চারবার 'তাদের' বলতে এখানে দ্বিধা হয় না, কারণ পরিপাটি করে বলার বদলে এখানে লক্ষ্য বক্তব্যের সর্বস্ব ভাষায় ধরিয়ে দেওয়া। এই ঘরানার লেখায়, বরং, একটা অন্য উদ্যম থাকে ভেতরের ঘনায়মান ভাষারহস্যের তল খোঁজার। 'কবিতার কথা' পড়তে পড়তে টের পাওয়া যায় যে টানা এগোনো যাচ্ছে না, থেমে থেমে, ভেবে পরের লাইনে, তার পরের লাইনে যেতে হচ্ছে। ঠিক যেভাবে বিনয় মজুমদারের স্বকণ্ঠে কবিতাপড়া শুনেছিলেন শঙ্খ ঘোষ। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই থেমে যাচ্ছিলেন বিনয়, কোনও কোনও শব্দ পড়ছিলেন একাধিকবার, এমনভাবে, যেমন নিজেকেই শোনাচ্ছেন তিনি। বিনয়ের গদ্যের ধরনটিও তাঁর কবিতার মতোই। স্বগত ও স্বয়ংক্রিয়। এই গদ্যের কোনও প্রসাধন নেই, নেই সযত্ন চর্চার উল্লাস। কথাই টেনে রাখছে বলাকে। ভেতরের দিকে। ভেতরে ভেতরে এই টান রক্ষা করেই চলে বিনয়ের গদ্য। কখনও হয়তো চলেই না। একটি বিষয়কে ধরেই শুধু একের পর এক মোচড়ে তার সবটুকু টেনে নেবার তাগিদে একটা বৃত্ত রচনা করে। এটাই এই গদ্যের ধরন। বিনয়ের দুটো একটা গদ্যের অংশ তুলে এটা বোঝা যেতে পারে ঃ

'ধরো, আমি একটা কবিতা পড়লাম। তারপর সেই কবিতা থেকে মনে মনে আবৃত্তি করলাম——'আমি ফাগুন এলে কুড়িয়ে নেব'। সঙ্গে সঙ্গে আমি কবির মুখ দেখতে পাচ্ছি—হাবরা প্লাটফর্মে। এইবার আমি মুখ বুজে কথা বলা শুরু করলাম এই বিপ্লবের সঙ্গে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'বিপ্লব, ভাই শুনতে পাচ্ছ?' বিপ্লব জবাব দিল 'হ্যাঁ, দাদা, শুনতে পাচ্ছি'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'ইন্দ্রনীল নাকি তোমার কাছে থাকে?' বিপ্লব জবাব দিল 'না না ইন্দ্রনীল আমার সঙ্গে থাকে না।'

আমি শিমুলপুরে বিছানায় বসে লিখে যাচ্ছি। আর বিপ্লব আমার থেকে কুড়ি মাইল দূরে হাবরায়'।

বিনয় যা বলতে চান, তাকে সাজানোর কোনও ইচ্ছেই তাঁর নেই। কথাটিকে দ্রুত পাঠকের কাছে ধরে দেবার জন্য তিনি ঝুঁকে আছেন। শুধু তাই নয়, বিনয়ের কবিতায় যা একটু কম সঞ্চারিত, সেই মজা আর কৌতুকের মেশানো রসায়নটি বেশি ধরা পড়েছে তাঁর গদ্যে। আর, একেবারে শান্ত ছদ্মবেশে। পড়ে প্রথমে ধরাই যাবে না যে

কী নিপুণ ঠাট্টা করলেন তিনি। এমনিতেই বিনয়ের গদ্যে ডায়েরির একটা ধরন, সরাসরি কথা বলার একটা প্রকাশ্য কৌশল আছে। কিন্তু তা যে অন্তর্ঘাতমূলক, তা সহজে মোটেই টের পাওয়া যাবে না।

জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতা নিয়ে ভরাট এক আলোচনা আছে বিনয়ের। নিখুঁত সে-লেখা। একেবারে গাণিতিক বিন্যাসে সাজানো লেখাটিতে ১ ২ ৩ করে জীবনানন্দের কবিতাটিতে কী কী 'আছে', আর 'নেই' তা বড়ো করে বলা আছে। এটাই বিনয়ের গদ্যের, তাঁর কবিতার মতোই একটি চেনা লক্ষণ। কিছুদিন আগে বেরোনো একটা গদ্যের লাইন তুলছি ঃ

'আমরা যাঁর ছত্রছায়ায়, এ নিয়ে বন্ধুদের দ্বিমত থাকতেই পারে, বর্ধিত হলাম, তিনি, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী'। (কালো সরস্বতী উদয় পশ্চিমে ঃ বাপী সমাদ্দার, আত্মপ্রকাশ)

এই ভঙ্গিতে কোনও সরল গতিশীলতা নেই, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আবার, ভেতরের টান বজায় রেখে কথা বলার নিশঃব্দ তাগিদ আছে। এই তাগিদ এই ধরনের গদ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার মতো প্রাথমিক একটা অসহযোগিতা থাকে কাঠামোয়। যে-দুজন কবি আমাদের সময়ের বাংলা কবিতাকে তৈরি করলেন, তাঁদের একজনের কবিতার ভাষা, অন্যজনের গদ্যভঙ্গির মিশ্র নির্যাস ধারণ করে বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় প্রকরণটি হয়ে উঠেছে। অমিয় চক্রবর্তী আর জীবনানন্দ দাশ। আমার মনে হয়, এখনও পর্যন্ত বাংলা কবিতার চলনও এই দুই কবির ঘরানা মেনে চলছে। একজনেরটা বোঝা যায়, প্রকাশ্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর বিনয় মজুমদার-এর ঠেক হয়ে সেই ধারা এই সময়কে ছুঁয়ে আছে। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী আছেন পাতায় পাতায়। ভেতরের দিকে ঘরবাড়ি তুলে কিছু লেখা অন্তর্লীন থাকতে চায়। মেঘের ছায়ায়, অন্ধকারে তারা ঢেকে রাখে বর্ণপরিচয়। এমন কবিতা তার গদ্য আমাদের কম লেখা হয়নি। কবিতায় এই ঘরানার শীর্ষে আছেন অমিয় চক্রবর্তী। এই গঠনের সফল এই যে, নানা ছন্দের নির্যাস এনে এখানে মিশিয়ে দেওয়া যায়। 'মুক্তক' নামটি এই প্রবণতা অনেকটাই ধরিয়ে দেয়। যেমন 'বিনিময়'-এ ঃ

তার বদলে পেলে—
সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল—
ফুলে নোয়ানো ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরলো হৃদয়তল—
একলা বুকে সবই মেলে।

পাঁচ, ছয় আর শেষ লাইনে এসে যেভাবে হোঁচট খেতে হয়, সেটা মনে রাখতে বলছি। রেখে, ধরা যাক, 'উদ্দেশ্যে' নামে বিনীত একটি কবিতা পড়ি ঃ

আস্তে সূর্যাবর্তে সরে
দিনের অক্ষরে
প্রাণ—
রাঙা ভোর সন্ধ্যাগ্নিতে ধ্রুব অবসান;
দিয়েছিলে এই দিনে অফুরন্ত দান।

মেজাজের দিক থেকে এই দুটি কবিতার ছন্দের মধ্যে কোনও বিরোধ আছে বলে মনে হচ্ছে? না। কারণ কবির মেজাজে অক্ষরবৃত্ত বাসা বেঁধে আছে। আর আছে বলেই 'তার বদলে পেলে' কিংবা 'একলা বুকে সবই মেলে'র মত ধরন অন্য গোত্রের কবিতায় সহজে ঢুকে যায়, তাতে কবিতার কিছু এসে যায় না। আর, খেয়াল করলে দেখা যাবে, গদ্যছন্দ অক্ষরবৃত্তের হাত ধরেই নির্বিঘ্নে চলতে পারে। অন্য কোনও ছন্দ গদ্যছন্দের এত কাছে ঘেঁসতেই পারে না। তাই এর মেজাজের সঙ্গে বাংলা গদ্যের একটি বিশেষ প্রকরণ তুলনীয় হয়ে ওঠে।

বলার কথা হলো, এই প্রকরণটি, তার সব স্তরান্তর নিয়ে আমাদের সময়ের ভিন্নধর্মী কবি-লেখকদের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। কথা উঠবেই, ভিন্নধর্মী বলতে কী বোঝায়? আমি ব্যাখ্যায় যাবো না। শুধু একটি নাম বলবো। দেবেশ রায়। তাঁর প্রতিটি গদ্যের মধ্যে ভাবনার বহুতল ওঠাপড়া এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, গদ্যে যে-স্বাদুতার আয়োজন আমরা বুদ্ধদেব বসুর ঘরানার গদ্যে পাই, তা একেবারে ছারাখার হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির মনন তাঁর লেখায় ভাষা পায়। গদ্যের ভেতরে ভেতরে শান্ত অন্তর্ঘাত রক্ষা করেন তিনি, উপন্যাসের এমন দরাজ অথচ সংহত শৈলি তাঁর আয়ত্ত্বে যে বিভিন্ন কলামাধ্যমের বাইরের ফারাক নীরবে তুচ্ছ করে তাঁর রচনা হয়ে ওঠে সময়ের স্থাপত্য, অনুভূতির প্রচ্ছদ। প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধদেব বসুর গদ্য বিষয়ে বলেছিলেন ঃ 'মুক্তছন্দ গদ্যের প্রকৃষ্ট নমুনা'। আমি কিন্তু কথাটি জীবনানন্দ, আলোক সরকার, দেবেশ রায়, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল সহ আমাদের ভাষার আরও অনেক শমিত কুশীলবের গদ্যসম্পর্কেই বেশি গ্রাহ্য বলে মনে করি। ঈষৎ দ্বিধাজড়িত সাংকেতিকতা নিয়ে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও এই ঘরানারই অন্তর্গত হয়ে আছেন। বীতশোক ভট্টাচার্যের গদ্যের কথাও এখানে বলা যায়, কিন্তু তাঁর গদ্য ভাবনা আর ভঙ্গির এক অনিশ্চিত ওঠাপড়ায় আক্রান্ত বলে আমার মনে হয়। তবে মননশীলতার আর একজন মরমী উপাসক রণজিৎ দাশের গদ্য বাংলা ভাষায় একটি মৌলিক ঘরানাকে প্রতিষ্ঠিত করছে। এই সঙ্গে সকৌতুক অথচ মনস্ক, কৌতূহলী কিন্তু বিবেচনাময় তাঁর বিন্যাস। জীবনানন্দের 'শব' কবিতাটির আলোচনা তিনি এইভাবে শুরু করেন ঃ 'এই কবিতাটির সামনে হলেই আমার হ্যামলেট নাটকের

কথা মনে হয়। মৃণালিনী ঘোষালের সব যেন বাঙালিনী ওফেলিয়ার শব। জলে ভাসছে, আধুনিকতার আদিপুরুষ হ্যামলেটের সমস্ত ধূর্ততা আর দার্শনিক পাগলামির মূল্য ধরে দিতে, জলে ভাসছে ওফেলিয়া———মৃণালিনী ঘোষাল—মানুষের ইনোসেন্সের শেষ প্রতিমূর্তি হয়ে'।

পুরো কথার মধ্যে যে-স্বাভাবিক সমৃদ্ধি রয়েছে, তা তাঁর লেখাকে অন্য সব ঘরানার গদ্য থেকে আলাদা করেছে। শিল্পের নানা মাধ্যমের মধ্যে যে-নিপুণ চলাচল, সে-সম্পর্কে সক্রিয় ভাবে মনস্ক অনেক ভাবুকের কথাই আমরা জানি। উনিশ-বিশ শতকে বিশ্বসংস্কৃতির বিভিন্ন আন্দোলনের যাঁরা পুরোধা ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি যোগ ছিল, অনেকেই ছিলেন নানা শাখার প্রতি তন্ময়ভাবে উৎসাহী। বাংলাতেও অনেক লেখকের কথা আমরা জানি, যাঁরা একাধিক কলাচর্চার সঙ্গে নিজেদের নানা ভাবে যুক্ত রেখেছেন। এই সময়ের লেখকদের মধ্যে এই বিষয়ে রণজিৎ দাশ নাম সবার আগে মনে আসে।

এখানে একটা কথা বলার আছে। বিভিন্ন ঘরানার লেখকেরা যে সবাই সবসময় অনিবারণীয়ভাবে একরকম গদ্যই লিখে গেছেন তা কিন্তু আমি বলতে চাইনি। বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর'-এর কথা পাঠকদের আমার আগেই মনে পড়েছে, আমি জানি।

■ ড. সুমন গুণ—বিভাগীয় প্রধান, তুলনামূলক সাহিত্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

আনসার উল হক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ঃ এক উপেক্ষিত ও বিস্মৃতপ্রায় শিশুসাহিত্যিক

রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব এড়িয়ে যে কয়েকজন সাহিত্যিক আপন সময়ের অগ্রবর্তী হয়ে শিশুসাহিত্য রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। ছোটোদের সাহিত্য নিয়ে, সাহিত্যে স্বকীয় ভাবনা নিয়ে তিনি মেতেছিলেন সারাটি জীবন। বলা যায়, শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে মানুষ গড়ার কারিগর। শিশুসাহিত্যকে বিজ্ঞান ভাবনায় জারিত করার প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। তিনি মনে করতেন, শিশুসাহিত্য হল শিল্পের তাজা মশলা আর শিশু-মানসিকতার উপযোগী উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস। এক্ষেত্রে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কিংবা রবীন্দ্র-ভাবনা থেকে শিশুসাহিত্যকে তিনি একধাপ এগিয়ে দিলেন।

বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশে বিষ্ণু শর্মার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, সোমদেবের কথাসরিৎ সাগর যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু শিশুসাহিত্যিকের সৃষ্টি; সাহিত্য উপাদানে ভরপুর। তবে উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্য গড়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। গতানুগতিক স্রোতের বিপরীতে থেকে যিনি ছোটোদের ভিত গড়ার প্রেরণা জুগিয়েছেন, তিনিই ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ।

ইতিহাস তখন ভারতের প্রতিকূল। বিজ্ঞান-চেতনায় তখনও ভারতের নবজাগরণ আসেনি। সেইসময় কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রসার, উন্নতিলাভ করছিল। সাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞান-চেতনা ও বিজ্ঞান-মনস্কতার অভাববোধ বেশ ভালোভাবেই পরিলক্ষিত। তখন বাংলা ভাষাভাষী শিশু-কিশোরদের উপযোগী সাহিত্যে বিজ্ঞান-ভাবনার প্রচলন যে কয়েকজন লেখক করেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

তাঁর জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তিনি বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মর্যাদার আসনে বসিয়ে ছোটো বড়ো সবার মধ্যে বিজ্ঞান-ভাবনাকে সহজেই চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানকে কল্প-বিজ্ঞানের মজায় মুড়ে তিনি, বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মনের মধ্যে যে আসন পেতে বসেছিলেন, যেভাবে আনন্দের সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন, তা এক কথায় দুরূহ ছিল। কিন্তু সেই দুরূহ কাজ তিনি অতি সহজেই সমাধান করে ছোটোদের মন জয় করেছিলেন।

ছোটোদের জন্য বিজ্ঞানের লেখা লিখতে গেলে কী কী জিনিস মাথায় রাখা দরকার রূপকথা আর বিজ্ঞান—কার কোথায় অবস্থান, তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ নিজেই ঃ

'শিশুসাহিত্যে বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা লেখার জন্য অনেকে অপ্রাকৃত ঘটনার সাহায্য নেন, আমি পারতপক্ষে নিইনা। আমাদের চারপাশে যে সব ঘটনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তা থেকেই...প্লট পাওয়া যেতে পারে। প্রথম কথা বিজ্ঞানভিত্তিক হলেও সেটা আসলে গল্প হওয়া চাই। সাহিত্যের মূল্য থাকা চাই, না হলে তা অচল।....বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখতে গেলে বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলি অগ্রাহ্য করা চলবে না।... বিপরীত কিছু আনতে হলে, তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ অবশ্যই দেখাতে হবে। না হলে তাকে বিজ্ঞানভিত্তিক বলা যাবে না। সেটা হবে ফ্যান্টাসি বা রূপকথার সমগ্রোত্রীয়।.... আমি তা লিখি না, লিখতে পারি না।'

আমরা লক্ষ্য করেছি, সাম্প্রতিক সময়ে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষের মধ্যেই বিজ্ঞান-মানসিকতা গড়ে উঠেছে। তা কোনো দেশে বেশি, কোনো দেশে কম। কোনো দেশে একটু আগে, আবার কোথাও বা একটু পরে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে অতি সহজেই বা স্বাভাবিক ভাবেই একটা নতুন অঙ্গিকের বা স্বাদের কথা সাহিত্যে আমদানি হয়েছে, যাকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞাননির্ভর গল্প বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প। আবার কেউ কেউ বলেন 'কল্পবিজ্ঞান'। বিজ্ঞানের স্বপ্ন ডানায় কিছুটা রঙিন কল্পনা মিশিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করলে পাঠকদের পড়ায় আগ্রহ তৈরি হয়—তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি কলম ধরলেন কল্প-বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে, ছোটো বড়ো সবার জন্য। জ্ঞান পিপাসু, আনন্দ পিপাসু আর মজারু শিশুদের জন্য তিনি একটা রঙিন সাহিত্যের উঠোন বানিয়ে দিলেন। যেখানে খেলবে শিশুরা, তাদের অভিভাবকরা আর তাদের ভাবনার চারাগাছ ধীরে ধীরে মহীরূহে পরিণত হবে। এমন ভাবনায় জারিত হয়ে যিনি সাহিত্যের টানে জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করলেন, তিনি সাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ছিলেন এক নিপাট ভদ্রলোক। মন ছিল সরল, অন্তর ছিল উদার। বরেণ্য সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের কথায় ঃ

"গত ৫০ বছরে আমি ক্ষিতীনকে কখনও কোনো অসহিষ্ণু, অশালীন বা অযোগ্য কথা বলতে শুনিনি। বরং দরকার হলে ভদ্রভাবে স্পষ্ট কথা বলতে পারত। কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল বুঝবার ক্ষমতা তার ছিল। মনটা ছিল ফুলের মতো কোমল। যে তার স্নেহের স্পর্শ পেয়েছে সে আর তা এ জীবনে ভুলবে না। তার উদার দৃষ্টির আলোতে, সরকারি পৃষ্টপোষকতা ছাড়াই, গত ২৭ বছরে তার হাতে একপুরুষ লেখক তৈরি হয়েছে।.....ক্ষিতীনের কোনো বড়মানুষি ছিল না।"

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। তাঁর পিতা বিশ্বেশ্বর নারায়ণ ভট্টাচার্য ছিলেন একজন ডাকসাইটে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও স্বনামধন্য সুসাহিত্যিক। এসব সামলেও মানুষের মুখে মুখে ফেরা লোকজীবনের গান সংগ্রহ করেছিলেন। ছোটোদের নিয়ে ভাবনায় শেষ ছিল না তাঁর। তাই তো তিনি তাদের কথা ভেবে প্রকাশ

করলেন 'রামধনু' পত্রিকা। প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো নামি এক কলেজের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন তিনি, সাউথ সাবার্বন স্কুলেও তিনি ক্ষুরধার মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে এম এ পাশ করেন। অধ্যাপনায় ডাক আসতে থাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে। অধ্যাপক হিসেবে চাকরি বেছে নিলেন কলকাতার নামকরা আশুতোষ কলেজ। পরে যোগমায়া দেবী কলেজে। তাঁর বাবাও ছিলেন সে সময়কার এক তেজি ও মেধাবী ছাত্র। এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—বাবা বিশ্বেশ্বর নারায়ণ ভট্টাচার্য খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৯ সালে (এখন থেকে ১২৮ বছর আগে) একসঙ্গে তিন বিষয়ে অনার্স ফার্স্টক্লাস পেয়ে প্রতিযোগিতামূলক বি.সি.এস. পরীক্ষা দিয়ে মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তাঁর মন পড়ে রইল সাহিত্যের পাতায়, ছোটাদের মনের গোপন কোণে। তাঁর পরিচিত বিষয় বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন শিশু-কিশোর সাহিত্যসাধনায়। বিজ্ঞানের বারুদ মেখে তাঁর কলম হয়ে উঠল তলোয়ার। ঝলসে উঠল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ভূত-পেতনির বিরুদ্ধে আর সর্বোপরি বস্তাপচা সাহিত্যভাবনার বিরুদ্ধে। তাই তো তিনি লিখতে লাগলেন ভুরি ভুরি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা। তবে আনন্দের বিষয়, বড়োদের জন্য বেশ কিছু লিখলেও সারাজীবনই ছোটাদের সাহিত্য নিয়ে মেতেছিলেন। বালক-বালিকাদের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা কোনো শিশুসাহিত্যিক তাঁর চেয়ে বেশি করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই বিজ্ঞান বিষয়ক। তাঁর লেখার ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল আর অনাড়ম্বর। রচনার সৌকর্যের চেয়ে তিনি গুরুত্ব দিতেন বিষয়ের দিকে। সেদিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেদিকেই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বিজ্ঞান বুড়ো'-তে (প্রথম প্রকাশ ১৯২৭) বিজ্ঞানের অত্যাশচর্য আবিষ্কারের কাহিনি ছেলে-মেয়েদের কাছে একেবারে ঘরোয়া গল্পের মতো করে বলবার চেষ্টা করেছেন। একথা অবশ্যই সত্যি, এরূপ আবিষ্কার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সে-সময়ের পূর্বে আর দেখা যায়নি। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের চারিত্রিক গুণাবলির কিঞ্চিৎ যদি সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যিকরা পেতেন, সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হত। সে সম্পর্কেও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণকে সামনে রেখে লীলা মজুমদার স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন ঃ

"সাধারণ লেখকরা অন্যান্য প্রতিভাবান বা খ্যাতিসম্পন্ন অন্য লেখক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু, সম্ভবত কিঞ্চিৎ ঈর্ষাপরায়ণও বটে। ক্ষিতীন ছিল ঠিক তার উলটো। পার্থিব লাভ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন বলে ওসব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায়নি। গুণী লেখক দেখলে তাঁকে হিংসে করা দূরে থাক, যেভাবে সম্ভব তার সহায়তা করত তা তাঁর সাফল্যের অহ্লাদে আটখানা হত। এবং সবচাইতে বড়ো কথা নিজের কাগজে রাশি রাশি

জনপ্রিয় লেখকের রচনা ছেপে লাভবান হবার চেষ্টা না করে, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নবীন অজ্ঞাত লেখকদের পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরত। অনেক সময়ই সার্থক ভাবে। শিশিরকুমার মজুমদার, উজ্জ্বল মজুমদার প্রমুখ তার প্রমাণ।"

শিশু মাসিক পত্রিকা 'রামধনু'-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর পিতা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। কিন্তু তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিলেন এই পত্রিকার পরতে পরতে। তাঁর দাদা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এই পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তবে তাঁর অগ্রজের মৃত্যুর পর তিনিই আমৃত্যু এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। এখানেই বের হতে লাগল কল্পবিজ্ঞানের গল্প। আপন মনের মাধুরী মেশানো ছোটোদের মনের কথা। সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। 'রামধনু'-র সূচনা সংখ্যায় লেখা হয়েছিল 'আকাশের রামধনু দেখায় সূর্যের কিরণ। আমাদের রামধনু দেখাইবে জ্ঞানের কিরণ।' আগেই বলেছি, শিশু ও কিশোর সাহিত্যে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও বলিষ্ঠতা দানের জন্য তিনি নতুন নতুন লেখকদের উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক সেকথা ঃ

"নতুন লেখকদের রচনার মধ্যে আমি প্রতিভার সন্ধান যখনই পেয়েছি, তখনই তাদের আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করে এসেছি। বিশেষ করে যাদের মেধা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়েছে। শুধুমাত্র বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প উপন্যাসের জন্য নয়, সব ধরনের বইয়ের জন্যই। আমি উৎসাহ দিয়েছি নতুনদের। 'রামধনু'-তে এদের সবার লেখাই আমি সযত্নে ছেপেছি। যেমন ধরা যেতে পারে—নিশীথরঞ্জন রায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী), সুকুমার দে সরকার, শিশিরকুমার মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, লীলা মজুমদার, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, আশাপূর্ণাদেবী, শৈল চক্রবর্তী কিংবা সুনির্মল বসু প্রমুখদের লেখা।"

মানুষ প্রতিনিয়ত চোখের সামনে দেখছে বিজ্ঞানের রকমারি কলাকৌশল, ছোটোরা দেখছে বিজ্ঞানের মজাদার আবিষ্কার। দৈনন্দিন জীবনে নানারকম বৈজ্ঞানিক তথ্যের কার্যকরী প্রয়োগ কীভাবে করা যায় ভাবতে লাগলেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ। ভাবনা পরিণত হল বাস্তবে। তাঁর কলম থেকে এল ঝড়, মনের গুপ্ত কোণ থেকে বেরিয়ে এল গুপ্তধন। এভাবে আবিষ্কার হল, 'ফুটোস্কোপ', 'ফিরিঙ্গির গড়', 'রঙ্গিলা পাহাড়ের নীলকুঠি', 'ভাগুবাবু ও ফটিকগির রহস্য', 'কুরুকুয়াভিয়ের মন্ত্রপূত পাহাড়'-এর মতো অসম্ভব ভালো কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনিবার্য ভাবে গড়ে উঠল বিজ্ঞান-মানসিকতা। বিজ্ঞানের দিকে বাড়ল ঝোঁক, উৎসাহ আর কৌতূহল। ছোটোদের সবুজ মনে বিজ্ঞানবোধ জাগাতে তিনি লিখে ফেললেন, 'বিজ্ঞানের বুড়ো', 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা', 'ধূমকেতু', 'মেঘনাদ', 'আবিষ্কারের গল্প', 'মহাকাশের কথা' কিংবা 'তুষারলোকের রহস্য' ইত্যাদি বইগুলি। শিশুসাহিত্যে তাঁর ঐতিহাসিক কীর্তির কথা অবশ্যই উল্লেখ

করা প্রয়োজন। 'ছোটদের বিশ্বকোষ' সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তিনি অবহেলিত বাংলা শিশুসাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মোট ছয়টি খণ্ডের এই বিশ্বকোষ ছোটোদের কাছে তো বটেই, বড়োদের কাছেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মূল্যবান। কিছু স্কুলপাঠ্য বইও তিনি লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য ঃ বিজ্ঞান প্রবেশ (৭ম শ্রেণি), বিজ্ঞান প্রবেশ (৮ম শ্রেণি), বিজ্ঞান কাহিনী (৮ম শ্রেণি), Elements of Chemistry of H. S. Students, Inogranic Chemistry for B. S.C Students ইত্যাদি। এইসব বইয়ের মূল ভিত্তি ছিল একেবারেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। কল্পবিজ্ঞানের নামে অবাস্তব আর কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে জীবনে একটিও যুক্তিহীন গল্প লেখেননি তিনি।

অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্যকাহিনী কিশোর কিশোরীদের মনকে আকর্ষণ করে, সর্বযুগেই করে আসছে। বয়স্ক ব্যক্তিরাও তো তাদের শিশুমনকে সহজেই হারিয়ে ফেলে না। তাই ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের এই বিজ্ঞাননির্ভর শব্দগুলো আরও আকর্ষণীয় হয়ে সব শ্রেণির পাঠকের কাছে সহজেই পৌঁছে যায়। গতানুগতিক রহস্য গল্পের সঙ্গে বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষাপ্রদ এই গল্প অনেকটা ফারাক তৈরি করে পাঠকদের ভাবায়। বাস্তবতার নিকোনো উঠোনে সরাসরি দাঁড় করিয়ে দেয়। একটা কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বিজ্ঞানের প্রাথমিক নিয়মকানুন ও মূল সূত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি কোনোদিন তাঁর গল্পগুলোকে নিছক রহস্যকাহিনি হিসেবে দাঁড় করাননি। গল্পের মাধ্যমে তিনি শুধু পাঠকের অপার কৌতূহল সৃষ্টি করেননি, বিজ্ঞানের জাদুকরি শক্তির দিকে আকৃষ্ট করে শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছেন। 'বিজ্ঞানবুড়ো' তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের বই। বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন ঃ

"বিজ্ঞানকে এখানে কল্পনা করা হয়েছে—রূপকথার সেই শুভ্র জাদুকর রূপে। জাদুকর যেমন তাঁর জাদুর কাঠি ছোঁয়াইয়া আশ্চর্য-আশ্চর্য অবিশ্বাস্য সমস্ত ব্যাপার ঘটাইয়া তোলে, বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শেও কি তেমনি অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড—যা আগে কেউ কল্পনায়ও আনিতে পারিত না—নিত্য তাই ঘটিতেছে না।"

আগেই বলেচি, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য সুষ্ঠুভাবে 'রামধনু' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু 'রামধনুর'র সম্পাদক হিসেবে যতখানি পরিচিত তার চেয়ে বেশি পরিচিত বিজ্ঞানের গল্পের লেখক হিসেবে। তাঁর মতো সুন্দর রসালো ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের কথা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে খুব কম লেখকই লিখতে পেরেছেন। আসলে তিনি তো সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যেই বড়ো হয়ে উঠেছেন। প্রসঙ্গত, তাঁর বাবা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের 'মানিকচাঁদের গান', 'গোপীচাঁদের গান' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অন্যদিকে তাঁর দাদা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও হাসির গল্প লিখে একসময় ছোটো ও বড়োদের আসর জমিয়েছিলেন। যেহেতু বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর বদলির চাকরি তাই বালক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণকে বিভিন্ন স্কুলে পড়তে হয়েছিল। শেষ

পর্যন্ত কলকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এস সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করলেও অধ্যাপনায় ছিল তাঁর অনীহা। অধ্যাপনা করার জন্য কয়েকটি কলেজ তাঁকে অনুরোধ জানালেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অধ্যাপকের পদ গ্রহণ না করে তিনি ব্যবসা করবেন বলে মনস্থির করেন। এবং বেশ কিছুদিন পর যথারীতি তিনি ওই দোকান বিক্রি করে দেন। এরপর 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতেন না। পরে অবশ্য আশুতোষ কলেজে ও যোগমায়া দেবী কলেজে অধ্যাপনা করেন।

সারাজীবন ধরে শিশু-কিশোর সাহিত্যের সেবা করে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য পেয়েছেন মানুষের শ্রদ্ধা। চিরায়ত ওডিসি ও ইলিয়াড দেশকালের সীমা অনেক আগেই অতিক্রম করেছে। নানা ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। ছোটাদের মতো করে সহজ সরল ভাষায় ওডিসি ও ইলিয়াডের ভাবানুবাদ করেছিলেন তিনি। দু-হাত ভরে কুড়িয়েছেন বোদ্ধা পাঠকের সম্মান। পদক লাভ তো সাহিত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। তবুও শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পেয়েছেন ভুবনেশ্বরী পদক, ফটিক স্মৃতি পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার ইত্যাদি। 'কৌটিল্য' ও 'রসোদর শর্মা' এই দুই ছদ্মনামেও তিনি সাহিত্যের বাগানে তাজা তাজা ফুল ফুটিয়েছেন। সেই তাজা ফুলের সৌরভ তাঁর টাউনসেন্স রোডের বাড়ি 'শিশুসাহিত্য পরিষদ'-এ সবসময় ম-ম করত। তিনি পঁচিশটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ তিনি সবসময় প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ লেখকদের সুযোগ করে দিতেন 'রামধনু'-তে। এখানে একসময় চুটিয়ে লিখেছেন—লীলা মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, অশাপূর্ণা দেবী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, রবীন্দ্রলাল রায়, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বন্দে আলী মিয়া, স্বপন বুড়ো প্রমুখ। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ পাঁচ খণ্ডে 'ছোটদের বিশ্বকোষ' সম্পাদনা। এ কাজ করতে তিনি অবশ্য শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক সময় 'সাহিত্য' শব্দের মানে খুঁজতে আমরা হিমসিম খাই, সঠিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হোঁচট খাই। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যকে সামনে রেখে লীলা মজুমদার 'সাহিত্য' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সাহিত্যগুণসম্পন্ন মানুষের সঠিক আসন নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"সাহিত্য শব্দটার মানেই হল যা সঙ্গে সঙ্গে যায়। রক্তের মধ্যে 'জিন' আর চিন্তার মধ্যে ধারাবাহিকতা, এই দুটি হল মানুষের সঙ্গে সাথী। চিন্তার ফসলই হল যে কোনো দেশের সেরা সম্পদ। তাই আমাদের গুণীজনের কোনো রচনাকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে হয় না। বই করে ছেপে বের না করলেও ফালি করে রক্ষা করলে ভালো হয়। আজ যাকে হেয় মনে করা হচ্ছে, কাল হয়তো তার-ই আদর বাড়বে।"

শিশুসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা সর্বজনবিদিত। শিশুসাহিত্যকে তিনি চোখের মণির মতো আগলে রাখতেন, শিশুসাহিত্যিকদেরকে উৎসাহ দিতেন। ছোটোদের সাহিত্যের একটা রূপরেখা বেঁধে দেওয়ারও চেষ্টা তিনি করেছিলেন। শিশুসাহিত্যে 'রূপকথা' কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়, সে সম্পর্কেও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ "কথাটা ঠিকই, পৃথিবীর সব দেশেই ছোটদের জন্য রূপকথা লেখা অনেক হয়েছে। শিশুদের কল্পনা শক্তিকে উসকে দিতে 'রূপকথা' ও 'ভূতের গল্পের' জুড়ি নেই—তাই তার আকর্ষণও চিরকালের। অবশ্য চাঁদের বুকে যখন মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে, তখন চাঁদের বুড়ির চরকা কাটার গল্প তাদের আগের মতো আর টানবে না। তবে, নতুন যুগের উপযোগী অবলম্বনের আশ্রয় করতে হবে। আজকাল কল্পনা-ভরা সায়েন্স ফিক্সন লেখা হচ্ছে, প্রাণী জগতের কথাও লেখা হচ্ছে। অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীতে পরিচয় মিলেছে ভূতত্ত্বের, অর্থাৎ শিশুসাহিত্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত হচ্ছে।"

তাঁর লেখাই প্রমাণ করে আজও তিনি প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রয়াত হন ৩ জুন, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে। বিজ্ঞানকে সাহিত্যপদবাচ্য করে তোলার পিছনে যে মানুষটির অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধনা কল্পবিজ্ঞানের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, সেই সাহিত্যসেবী ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য একশো বছর পরেও আমাদের হৃদয় জুড়ে বসে আছেন। সমকালীন সাহিত্যিকের অনুরকরণ না করে কিংবা চলমান বাংলা সাহিত্যের বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব এড়িয়ে সুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি এক সার্থক শিল্পী, কিংবদন্তী, তাঁর অমর সাহিত্যসৃষ্টির জন্য, শিশু-কিশোরদের প্রয়োজনীয় মজার মজার বিজ্ঞাননির্ভর রহস্যগল্প রচনার জন্যও তিনি বেঁচে থাকবেন সব শ্রেণির পাঠকের মনে, শিশু-কিশোরদের অন্তরে।

■ আনসার উল হক—শিশু সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

বিজিত ঘোষ

ফুল ঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা' ও অন্যান্য কবি

প্রকৃতি আর তার অপরিহার্য অঙ্গরূপে ফুল। এমন কবির সংখ্যা নিতান্তই কম, যাঁরা ফুল নিয়ে কবিতা লেখেননি। সরাসরি ফুল নামে, ভুরিভুরি উপমা, রূপক ইত্যাদিতেও বিভিন্ন কবির কবিতায় ফুলের কথা বারবার এসেছে।

প্রায় সব কবিই ফুলকে মোটামুটি একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন। ফুল হল সৌন্দর্য, মাধুর্য আর স্নিগ্ধতার প্রতীক। অনেক কবিরই ফুল সম্পর্কে এমনই একটা সাধারণ ধারণা। বলাবাহুল্য, ধারণা এক হলেও বিভিন্ন কবির প্রকাশগুণে একই ফুলও ভিন্নতর রূপ পেয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি শ্রীমধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), তাঁর কাব্যগ্রন্থ চারটির কথা বাদ দিলেও, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)-র মধ্যে 'কবি', 'আশ্বিনমাস', 'নিশা', 'নন্দনকানন', 'উদ্যানে পুষ্করিণী' প্রভৃতি কবিতাগুলিতেও ফুলের রূপ, স্নিগ্ধতা, কোমলতা, কমনীয়তা, সর্বোপরি তার অপরূপ সৌন্দর্যই প্রকাশিত হয়েছে। আর রূপক উপমা ইত্যাদি তো মধুসূদন অসংখ্যবার এই সৌন্দর্যময়ী ফুলকে ব্যবহার করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলাদেশে যথার্থ গীতিকবিতার যাত্রা শুরু হল। এলেন রবীন্দ্রনাথ অভিহিত 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৪৬-১৮৯৪)। তারপর একে একে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৬৮-১৯২৪), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৬৪-১৯১৮), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৬৮-১৯২৪), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) প্রমুখ। উল্লেখ্য এই যে এঁদের প্রায় অধিকাংশের কাব্যেরই অন্যতম উপাদান হল প্রকৃতি। স্বভাবতই ফুলও। আর এঁদের কাছে ফুল সৌন্দর্যেরই প্রতীকরূপে দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন তো শুধু 'ফুল' শীর্ষকই একাধিক কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। লিখেছেন 'ফুলবালা' (১৮৭৯), 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০), 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২), 'পারিজাতগুছ' (১৯১২)। গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'ফুলরেণু' (১৮৯৫) এবং 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮) কাব্যগ্রন্থ দুটির নামোল্লেখও প্রাসঙ্গিক।

উনিশ শতকের এই Lyric-এর ধারার মধ্যেই আবির্ভাব ঘটলো রবীন্দ্রনাথের। তাঁর হাতেই পেলাম গীতিকবিতার পূর্ণ সমৃদ্ধির ইতিহাস। প্রকৃতির অসংখ্য ফুল তাদের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আর সৌন্দর্য নিয়েই হাজির হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাছে। 'কল্পনা' (১৩০৭ বৈশাখ) কাব্যগ্রন্থের 'বসন্ত' কবিতাটিতেই ফুলের রূপ আর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে কবিকে যেন আত্মহারা হতে দেখি—

সে চম্পক সে বকুল, সে চঞ্চল চকিতে চামেলি স্মিত শুভ্রমুখী,
তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক উন্মিতা
একান্ত কৌতুকী.....
বকুলে চমকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি যুগান্তরে—
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহু কলিস্বরে।

'বনবাণী'-র (১৩৩৩-১৩৩৪) 'নীলমণিলতা' কবিতাটিও ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি, ফুলকে তাঁর আপন অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসা জানিয়েছেন—

অপরূপ পুষ্পোচ্ছ্বাসে, হে লতা, চিনালে আপনাকে
বেল জুঁই শেফালিরে জানি আমি ফিরে ফিরে ফিরে
কত ফাল্গুনের কত শ্রাবণের আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা
চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা
নাগকেশরের গন্ধ সে যে কোন বেণীবন্ধে বাঁধা।

'স্ফুলিঙ্গ'র ২৪ সংখ্যক কবিতাটিতেও ফুলের এই শোভা, সৌন্দর্যের কথাই বলেছেন কবি—

'আপন শোভার মূল্য
পুষ্প নাহি বোঝে, সহজে পেয়েছে যাহা
দেয় তা সহজে।'

এই সৌন্দর্যময়ী ফুলের গন্ধের কথা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে ২৮ সংখ্যক কবিতাটিতেও, 'আপনি ফুল লুকায়ে বনছায়ে/গন্ধ তার ঢালে দখিনবায়ে'। সৌন্দর্যের প্রতীক পুষ্প অরণ্যের শোভা তার স্নিগ্ধ মিষ্টি সুবাসে অরণ্য হয়ে ওঠে পুলকিত তাই পুষ্পের মুকুলেই অরণ্য আশ্বস্ত—'পুষ্পের মুকুল/নিয়ে আসে অরণ্যের/আশ্বাস বিপুল'। ('স্ফুলিঙ্গ'-র ১৩৭ সংখ্যক কবিতা)।

পুষ্পের সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ। তাই এই ফুলের ঝরে যাওয়া কবির হৃদয়ে বাজে—

ফুল ছিঁড়ে লয়
হাওয়া
সে পাওয়া মিথ্যে
পাওয়া
আনমনে তার পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে
যাওয়া

সে সেই ধুলার
ফুলে
হার গেঁথে লয়
তুলে
হেলার সে ধন
হয় যে ভূষণ
তাহারি মাথার
চুলে।'

সৌন্দর্য, মাধুর্য, স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তার প্রতীক হিসেবে কবি ফুল ও নারীকে এক করে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বিচিত্রতা'র (১৩৩৮)-র 'পুষ্প' কবিতাটি একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। এখানে তিনি নারী ও ফুলকে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত করে দেখেছেন। ফুল সুন্দরের প্রতীক। আর ভালোবাসার প্রতীক নারী।

'আজ, সখী, বুঝিলাম আমি/সুন্দর আমাতে আছে থামি/তোমাতে সে হল ভালোবাসা।'

'শেষ সপ্তক' (১৩৪২) কাব্যগ্রন্থের 'আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে' কবিতাটিতেও ফুলের এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-মাধুর্যের কথাই ঘোষিত হয়েছে বারবার। আর 'পুনশ্চ' (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের 'বাসা' কবিতাটি তো ফুলেরই রূপ-রঙের এক অপরূপ সজ্জা। বিদেশি ফুলের মধ্যে কবি সৌন্দর্যের অভাব দেখেননি। এ প্রসঙ্গে মনে আসে সেই ক্যামেলিয়া ফুলের মিষ্টি সৌন্দর্য। যার অপরূপ রূপ সাঁওতাল কালো মেয়েকেও করে সুন্দর—

'বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া/সাঁওতাল মেয়ের কানে, কালো গালের উপর আলো করেছে।' ('পুনশ্চ'—'ক্যামেলিয়া')

নজরুল ইসলামও (১৮৯৯-১৯৭৬) ফুলের নামে তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'দোলন-চাঁপা'র 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতায়, তিনি 'পলাশ' অশোক, শিমুল ঘায়েল'—একথা বললেও ফুলের সৌন্দর্যকে কখনো অস্বীকার করেননি। সৌন্দর্যের প্রতীক ফুলকেই করেছেন ঘায়েল। আবার এই সৌন্দর্যময়ী দোলন-চাঁপা ফোটার আভাসে, কবি পুলকিতও বোধ করেছেন, 'ফুটবে আবার দোলন-চাঁপা চৈতী রাতের চাঁদনী'। 'দোলন-চাঁপা'—'অভিশাপ'।

নজরুলের 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষা বিদায়' কবিতাটিতে ফুলের এই সৌন্দর্যেরই জয়গান শুনি। অনেকটাই সেই একই ভাবের কবিতা 'ঝিঙে ফুল'-ও। এখানে দেখি —'গুল্মে পর্ণে/লতিকার কর্ণে/ঢল ঢল স্বর্ণে/ ঝলমল দোলে ফুল/ ঝিঙে ফুল। পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,/গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে/পউষের

বেলা শেষ/ পরি জাফরানি বেশ/মরা মাচানের দেশ করে তোল মশগুল—ঝিঙে ফুল।'

কবি মোহিতলাল মজুমদারও (১৮৮২-১৯৫৫) তাঁর অন্যতম কবিতা 'বাংলা ফুল'—এ ফুলের সেই চিরাচরিত সৌন্দর্যগানই গেয়েছেন—

যুঁই-শেফালীর গন্ধে আকুল সন্ধ্যা মৌনবতী,
সমীরে নীরব ঝরে সে বকুল সুরভি তুষার কণা।

২৪টি ফুলের সৌন্দর্যে আর রূপ-রঙ-গন্ধ-স্পর্শ যেন কবিতাটি একটি সুন্দর ফুলমালা হয়ে উঠেছে। যে মালার সুবাস আরও সুন্দর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি পোপের (Alexander pope : 1688-1744) 'Winasor Forest' (1713) কবিতাটিতে ফুলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের কথা আছে। এই শতাব্দীরই 'ঋতুচক্রে'র বিখ্যাত কবি টমসন (James as Thomson : 1700-1748)। প্রকৃতির বর্ণোচ্ছ্বাস; বিশেষত বিচিত্র ফুলের অপরূপ রূপের বিপুল সমারোহ তাঁর চোখে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। এই শতাব্দীর অন্যতম কবি Thom Hood (1799-1845)। তাঁর একটি কবিতার নাম —'I remember, I remember'। এই কবিতাটিতে ফুলের এক মিষ্টি-মোলায়েম হাল্‌কা রঙ ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে—

'The roses red and white, \The vi'lets, and the 'lily-cups,/Those Flowers made of light!'

ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Wordsworth : 1779-1850) অন্যতম তাঁর পুষ্পকবিতাগুলির অতি সাধারণ ফুলগুলির মধ্যেও তিনি পেয়েছেন এক বিশেষ প্রেরণা। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'The Solitary Reaper' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

'Three years she grew is sun shower,/ The Nature said, 'A Covelier floter on earth was never shown.'

'একটা সুন্দরতম ফুল, যা পৃথিবীর উপর কখনো বপন করা হয়নি।....' ফুলের এই সৌন্দর্যময় রূপটিই দেখেছেন কবি Wordsworth। শেলীর পুষ্পকবিতাগুলি পড়ে বোঝা যায়, কবি ফুলের বহিঃসৌন্দর্যে মুগ্ধ। শেলীর কাছে ফুল মানুষের মতো জীবন্ত ও সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল সত্য। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা তিনি ফুলকে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য-মাল্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোত বন্ধনে গ্রথিত করেছেন। দেখেছেনও সেই রূপেই।

আর ফুল সম্পর্কিত সেই চিরাচরিত ধারণা—ফুল সৌন্দর্য স্নিগ্ধতা পবিত্রতার প্রতীক, এই সাধারণ ধারণাটি সুন্দরভাবে লালিত করেছেন কবি কীট্‌স্। ফুলের অপরূপ বর্ণ, সুরভিত গন্ধ কীট্‌সের সৌন্দর্য-পিপাসু মনকে দিয়েছে এক সুগভীর তৃপ্তি। কীটসের ফুলের সৌন্দর্যের প্রতি এই নিবিড় আসক্তি সম্পর্কে শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর মন্তব্য করেছেন ঃ 'কীট্‌স আবার ফুলের বর্ণগন্ধাত্মক রূপটিই বিশেষভাবে অনুভব

করিয়াছিলেন। মাটির রস কি নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় পুষ্পের বিচিত্র পেলবতা ও বর্ণপ্লাবনে বিকশিত হইয়া উঠে তাহারই সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতি কীট্‌স্-এর বর্ণনায় মূর্ত। কীট্‌সের কবিতা পড়িতে পড়িতে ফুলের কোমল স্পর্শ যেন আমাদের অনুভবে ধরা দেয়, তাহার শীতল সুরভি যেন আমাদের চারিপাশে ঘন বায়ুমণ্ডল সৃজন করে।'

ফুলের মিষ্টি স্নিগ্ধতা, কোমল সৌন্দর্য, অপরূপ মাধুর্য্য ইত্যাদি কীট্‌সের **'Ode to Autumn'** কবিতাটিতে চমৎকার বর্ণিত হয়েছে। এই কবিতাটিতে ফুলের এক নমনীয় প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। প্রকৃতিদেবী ফুলের মধ্যে যেন অমৃতধারা বইয়ে দিয়েছেন। ফুলের এক শান্ত, সমাহিত সৌন্দর্যবোধ এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে আমরা দেখতে পাই।

সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকালেও আমরা দেখি ফুল সম্পর্কিত এই একই ধারণা পোষণ করেছেন—এমন অনেক কবিরই পরিচয় পাই। বিশেষ করে মহাকবি কালিদাসের কথাই ধরা যাক। মহাকবির মতো শেলীও ফুলের সঙ্গে মানুষের এক নিবিড় আত্মীয়তাবোধ উপলব্ধি করেছেন। তাই মাধবীলতার নব পুষ্পোদ্‌গমে শকুন্তলাও উৎসব আনন্দ অনুভব করে। মহাকবি অত্যন্ত সহজ ও ললিতভাবে ফুলের সঙ্গে মানুষের এই আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য অধিকাংশ কবির মতো কালিদাসও ফুলকে কোমলতার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। তাই প্রকৃতির মাঝে যা কিছু মধুর ও যা কিছু ললিত তারই বর্ণনায় কবির কণ্ঠমুখর। এটা কবি-দৃষ্টিরই বৈচিত্র্য।

মহাকবি কালিদাস ফুলকে ভালোবেসেছেন। এতগুলি বিশেষ ফুলকে দিয়েছেন আপন হৃৎকন্দরে স্থান। **Wordsworth** এর মতো যে কোনো তুচ্ছ ফুল মহাকবির চিত্তভূমিকে অধিকার করতে পারেনি। আসলে কালিদাস ছিলেন রাজসভার কবি। তাই নাম-না-জানা মেঠো ফুল স্থান পায়নি তাঁর কাব্যে। কিছু বিশেষ ফুলই কবির কল্পনার রঙে রঙিন হয়েছে। তাঁর ভাবরসের শিশিরে সিক্ত হয়ে উঠেছে। অপরূপ রূপ পেয়েছে তাঁর কাব্যে। এমন ফুলের সংখ্যা একচল্লিশটির বেশি নয়। এই ৪১টির ফুলের মধ্যে পদ্ম, অশোক, কর্ণিকা, কুমুদ, শিরীষ, চূতমঞ্জরী, বকুল, কাশ, পলাশ, নবমল্লিকা, কুন্দ, কেতকী প্রভৃতি পুষ্প কালিদাসের কাব্যে স্থান করে নিয়েছে। প্রথম তিনটি পুষ্পের মিলিত সৌন্দর্য কবিকে কতখানি মোহিত করেছে, তা 'কুমারসম্ভবম্'-এর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করলেই বোঝা যায়—

অশোকনির্ভৎসিত পদ্মরূপমা—
কৃষ্টহেমদ্যুতি কর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্দুরারং বসন্ত-পুষ্পাভরণং বহন্তী।।

অর্জুনমঞ্জরী পুষ্পের সৌন্দর্যও কবিকে কম মুগ্ধ করেনি। এ পরিচয়টি পাই তাঁর 'রঘুবংশম্' এর ষোড়শ সর্গে—

আপিঞ্জরা বন্ধরজকণাত্বাৎ মঞ্জর্য্যুদারা শশুভেহজ্জুনস্য।

দগ্ধাপি দেহং গিরিশেন রোষাৎ খণ্ডীকৃতা হ্যেবমনোভবস্য।। ।।৫১।।

নবমল্লিকা পুষ্প ও তার আপন সৌন্দর্যগুণে কবিকে করেছে মোহিত। কবি তাই নবমল্লিকার সৌন্দর্যগান গেয়েছেন 'রঘুবংশম্' এর ষোড়শ সর্গে—

বনেষু গয়স্তনমল্লিকানাং বিজম্ভ নোক্তম্বিষু কুট্টলেষু।
প্রত্যেকনিক্ষিপ্তপদ ঃ সশব্দং সংখ্যামিবৈষাং ভ্রমশ্চকার।। ।।৪৭।।

কুমুদপুষ্পের শ্বেত শুভ্র সৌন্দর্য কবি—মনে এক অনাবিল আনন্দ-হিল্লোল সৃষ্টি করেছে। এই স্নিগ্ধতার প্রতীক কুমুদকে পাই 'মেঘদূতম্' এর 'পূর্বমেঘ'-এ

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতাশ্চতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগা লপস্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যাং
মোঘীকর্ত্তুং চটুলসফরোশ্বর্ত্তন প্রেক্ষিতানি।। ।।৪০।।

নববসন্তের অন্যতম প্রতীক পলাশ। সেই পলাশের আধো ফোটা রাঙা কুড়ি কবিমনকেও দিয়েছে রাঙিয়ে। তারই এক চমৎকার বর্ণনা আছে 'কুমারসম্ভবম্'-এর তৃতীয় সর্গে—

কালেন্দুবক্লাণ্যবিকাশভাবাদ্বভুঃ
পলাশায্যা তলোহিতানি।
সন্দ্যো বসন্তেন সমাগতানাং
নযক্ষতানীব বনস্থালীনাম্।। ।।২৯।।

এছাড়াও কেতকী, কদম, কুন্দ, কাশ, অশোক, লবঙ্গ প্রভৃতি ফুলও তাদের স্ব স্ব গুণে, তাদের অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যে বারবার এসেছে। এমনকি কোবিদার পুষ্পও তার আপন সৌন্দর্যগুণে কবির চিত্তকে করেছে বিদীর্ণ—

মন্দানিলাকুলিতচারু তরাগ্রশাখঃ
পুষ্পোদ্গামপ্রয়েকোমল
মত্তদ্বিরেফপরিনীত্ মধুপ্রসেকশ্চিত্তং
বিদারয়তি কস্যন কোবিদারঃ।। ।।৬।।

তবে কবি কালিদাসের কাব্যে যে ফুলটি সব থেকে বেশি সমাদর পেয়েছে, সেইটি হলো 'পদ্ম'। পদ্মের অপরূপ স্নিগ্ধ কোমল সৌন্দর্য কবি পার্বতীর নয়নদ্বয়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন। 'কুমারসম্ভবম্'-এর ৮ম সর্গে আমরা এই বর্ণনাটি পাই। সেখানে সূর্য অস্থাচলে গেলে মহাদেব উমাকে বলছেন—

পদ্মকান্তিমরুণাত্রিভাপয়োঃ সংক্রমস্য তব নেত্রয়োরিব।
সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ সংহরত্যহরসাবহর্পতিঃ।। ।।৩০।।

এই সর্গেই পার্বতীর মুখকে পদ্মের মতো সুন্দর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই

পদ্মের মতো সৌন্দর্যময়ী নারীকে নিয়ে মন্দার পর্বতে মহাদেব কিছুকাল বাস করেছেন।

পদ্মনাভবলয়াক্তিক তাস্মসু প্রাপ্তবৎস্বমৃতাবপ্রযোনবাঃ।
মন্দরস্য কটকেষু চবসৎ পাব্বর্তী—বদনপদ্মযৎপদঃ।। ।।২৩।।

কালিদাস পদ্মফুলকে স্নিগ্ধতা, কোমলতার অন্যতমা প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। তাই পার্বতীর কোমল হস্তাঙ্গুলিকে তিনি পদ্মের পাপড়ির সঙ্গেই তুলনা করেছেন। এই সুন্দর বর্ণনাটি আছে 'কুমারসম্ভবম্' এর ষষ্ঠ সর্গে—

এবং বাদিনী দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পাব্বর্তী।। ।।৮৪।।

উমার সুন্দর চরণের মধ্যেও স্থলপদ্মের সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন কবি। 'কুমারসম্ভবম্' এর প্রথম সর্গের সেই বর্ণনাটুকু—

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাতি নিক্ষেপণা দ্রাসামবোদ্‌গিরন্তৌ।
আজহ্রুতুস্তচ্চরনণো পুথিব্যাংস্থলার বিন্দশ্রিয়সম্ব্যবস্থানম্।। ।।৩।।

'মেঘদূতম্'-এও পদ্মের কথা বারবার এসেছে। 'পূর্বমেঘ' খণ্ডেও বর্ণনা পাই—

কর্ত্তুংচচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে প্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আ কেলাসাদ্ বিসকিলসলয়চ্ছেদ-পাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভাতো রাজহংসাঃ সহায়া।।

স্নিগ্ধতার প্রতীক স্থলপদ্মের আর একটি অপরূপ বর্ণনা আছে 'মেঘদূতম্'-এর 'উত্তরমেঘে'—

পাদনিন্দোমৃতশিশিররান্ জালমার্গ প্রবিষ্ঠান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখম্ সংনিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মাভিশ্চাদয়ন্তীং
সাদ্রেহহ্নীব স্থলকমলিনীং প্রবুক্তাং ন সুপ্তাম্।। ।।৩১।।

এতক্ষণ দেখা গেল ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের কবিরা ফুলকে প্রধানত কোমলতার প্রতীক হিসেবেই দেখেছেন। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রপরবর্তী কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের (১৮৮২-১৯২২) ফুল বিষয়ক ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দীর্ঘকালের ফুল সম্পর্কিত চিরাচরিত সাধারণ ধারণা থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। ফুলকে দেখেছেন অন্যভাবে। সত্যেন্দ্রনাথের ফুলবিষয়ক বিভিন্ন কবিতা পড়লেই তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ফুলের ফসল'-এ ফুল সম্পর্কিত অনেক কবিতাই লিখেছেন। 'চম্পা' তাদের মধ্যে অন্যতম। আসলে, সে সব ফুলই কবিচিত্তের সমর্থন পায়, যাদের রুদ্র আয়োজনকে পরাভূত করে ফুটতে হয়। কবি একমাত্র সেইসব ফুলেরই

আত্মপ্রকাশে পৌরুষ আছে বলে মনে করেন। তাঁর এই মনোভাবটি স্পষ্ট ফুটেছে 'ফুলের ফসল' এর 'চম্পা' কবিতাটিতে। তবে এ প্রসঙ্গে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর (১৮৮৭-১৯৫৪) নামোল্লেখ অবশ্যই করতে হয়। কেননা তিনিও এই চাঁপাফুলের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর সায়াম্' কাব্যগ্রন্থের 'পারুলের আহ্বান' কবিতাটি এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হতে পারে—'সাত ভাই চম্পা জাগো।...চম্পা গো চম্পা গো জাগো ভাই/জাগে জাগে জাগে ওই নৈদাঘ সূর্য/ বাজে বাজে বাজে তার রৌদ্রক তুর্য,/বসন্ত অবসান/কে রাখে ফুলের মান?/চম্পা গো চম্পা গো জা-গো।/ পাতা হতে মাথা তুলি ভাস্করে নমি কে/ চাবে কে রুদ্র মুখে চাবে নির্নিমিখে/কে পিয়ে অনল রাশি/হাসবে তরল হাসি? চম্পা গো চম্পা গো চম্পা গো জা-গো।'

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-ও তাঁর 'চম্পা' কবিতায় অনেকটা এমন ভাবই প্রকাশ করেছেন। বসন্তের অবসান। আগমন প্রখর গ্রীষ্মের। এমনই রূঢ় প্রতিকূল প্রকৃতি। এরূপ প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে 'চম্পা' কবিতাটি শুরু হয়েছে। কবিতাটিতে রুদ্র-সুন্দরের মিলন কল্পনা এক চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করেছে। কবির এই রুদ্রসুন্দরের প্রতি মুগ্ধ চিত্তের বন্দনার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর আধুনিকতা।

'চম্পা' কবিতায় দেখি বসন্তের নিঃশ্বাস হয়ে এসেছে ক্ষীণতর। এই ক্ষীণ নিঃশ্বাস বসন্তের বিদায় বার্তারই ইঙ্গিতবহ। নির্মম গ্রীষ্মের রূঢ় রৌদ্র সমগ্র বিশ্বকে করেছে বিষণ্ণ। গ্রীষ্ম তাপদগ্ধ অরণ্যকে করছে ছারখার। ভয়াল ভীষণ রুদ্রদেব তপস্যায় নিরত। এই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডসম গ্রীষ্মের দাবদাহকে আত্মস্থ করেছে বৈশাখের চম্পা। আবির্ভূতা হয়েছে সাহসিকা অপ্সরার মতোই। সাহসিকা অপ্সরা তার রূপের প্রখরতা দিয়ে সংযত মুনিঋষিদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতো। এরকম কাহিনি আমাদের মহাকাব্যে, পুরাণে অজস্র রয়েছে। এমনই অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা'। সমস্ত অরণ্য গ্রীষ্মের দাবানলে দগ্ধ। সদ্য নবাগতা চম্পা প্রকৃতির এই প্রতিকূল পরিবেশের রুক্ষতা ও কাঠিন্যের সম্মুখীন। 'দেখিলাম জলস্থল, শূন্য শুষ্ক বিহ্বল.....' ('ফুলের ফসল'—'চম্পা')।

গ্রীষ্মের খররৌদ্রের তাণ্ডবে প্রকৃতিরাজ্য থেকে সমস্ত সবুজ গেছে ঝরে। এরই মধ্যে চম্পা তার সোনালি বর্ণের প্রখর উজ্জ্বলতার ঐশ্বর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। তার আত্মপ্রকাশের পথ নির্বিঘ্ন, সাবলীল নয়। তবুও সমস্ত বিঘ্নকে জয় করে সে বীতবিঘ্ন হতে পেরেছে। সে নির্ভীক। বিশ্বাসের বৃন্তে চম্পার আত্মপ্রকাশ।

একদিন পিক ধ্বনিতে মুখরিত, মৌমাছিগুঞ্জরিত ছিল বসন্তের কুঞ্জ। কিন্তু আজ তা গ্রীস্মের দাবদাহে বিনষ্ট। তবু এই ভয়ংকর রূঢ় পরিবেশকে আত্মস্থ করবার ক্ষমতা রাখে চম্পা। তাই সে আবির্ভূতা হয়েছে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে। গ্রীষ্মের অনলবর্ষণ পৃথিবীকে করেছে, দগ্ধ সূর্যের এই প্রখর তেজকে সমস্ত হৃদয়-মন-দেহ দিয়ে গ্রহণ করেছে চম্পা। তার শরীরে এনেছে কাঞ্চন বর্ণও সুরভিত, পাপড়িতে পাপড়িতে সঞ্চারিত করেছে লাবণ্য,

মাধুর্য। সূর্যের এই তেজ-ই সত্যেন্দ্রনাথ-কল্পিত চম্পাকে নন্দিত করেছে সবুর্ণ আভায়। প্রখর রৌদ্রের তেজে সমগ্র পৃথিবী মুহ্যমান। সূর্যের এই বিভূতিকেই পান করেছে চম্পা। ফলে সে হ'য়ে উঠেছে তেজোদৃপ্তো—

উগ্র মদ্যসম রৌদ্র যার তেজে বিশ্ব মূহ্যমান,
বিধাতার আশীর্বাদ আমি তা সহজে করি পান। ('ফুরে ফসল', 'চম্পা')

এইভাবে সূর্যের সর্বগ্রাহী সর্বদাহী অনলবর্ষণকে নিজদেহে গ্রহণ করেছে চম্পা। নিজের পুষ্পিত বিকাশ সাধনে এইভাবে সক্ষম একমাত্র চম্পা-ই তাই সামগ্রিক প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গ্রীষ্মের প্রখর তেজকে চম্পা দীপ্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছে। রৌদ্রময়ী চাঁপার প্রতি স্বভাবতঃই রূদ্রপন্থী কবির সহজাত পক্ষপাতিত্ব। জীবনের আকাশ পরিব্যাপ্ত অনলদহনে। তাকেই পান করে তরল হাসি হাসতে জানে চম্পা। এই চম্পাই কবিচিত্তে এনেছে নতুন দীপ্তি। বিদ্রোহী সত্তা চম্পার মধ্যে সুপ্ত। আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত বিদ্রোহ আধুনিক জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতারই বিরুদ্ধে। তাই রৌদ্রপায়ী চম্পা আপন পৌরুষের জয়ধ্বজা উড়িয়েছে। প্রতিকূলতার মরু বিজয়ে ঊর্ধ্বকেতন তুলে ধরেছে। সে আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত। এই রুদ্রজয়ী চম্পার পৌরুষের বর্ণনার মধ্য দিয়েই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।—এই হল সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতাটির মূল ভাব। এ থেকে ফুল-সম্পর্কিত সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ মনোভাবটি বুঝে নিতেও অসুবিধা হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথের এই মনোভাবটি 'আফিমের ফুল' কবিতাটিতে আরো স্পষ্ট ঃ

আমি বিপদের রক্ত নিশান
আমি বিষ বুদ্‌বুদ্‌,
আমি মাতালের রক্ত চক্ষু
ধ্বংসের আমি দূত।
কমল গোলাপ যতনের ধন
অল্পে মরিয়া যায়,
আমি টিকে থাকি মেলি রাঙা আঁখি
হেলায় কি শ্রদ্ধায়।....
গোলাপ কিসের গৌরব করে?
আমার কাছে সে ফিকে,
আমি যে রসের করেছি আধার
জীবন তাহে না টিকে।

কবির 'জবা' কবিতাটিও এমন ভাবেরই দ্যোতক—

এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া উজলি পুষ্পসভা
ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ডটি আমি যে রক্তজবা।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol. III Issue-VI

এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'আকন্দ ফুল' কবিতাটিরও একটি পঙক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে 'আকন্দ'-ও বলেছে ঃ 'রুদ্র নিদাঘে খর বৈশাখে রুদ্রেরি পূজা করি,....।' ফুল বিষয়ক সত্যেন্দ্রনাথের এই বিশেষ মনোভাবটি লক্ষণীয়। ফুল স্নিগ্ধতা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রতীক। এটাই প্রচলিত সাধারণ ধারণা। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ফুলের মধ্যে পৌরুষকেই দেখেছেন। দেখেছেন তার বিদ্রোহী সত্তাকে। রুদ্রমূর্তিকেও। আসলে রৌদ্রপায়ী চম্পকের সঙ্গে রুদ্রপন্থী কবিহৃদয়ের সহজযোগ। এর আগে বাংলা কবিতায় ফুলকে অবলম্বন করে, কোনো কবির এ জাতীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না।

■ বিজিত ঘোষ—স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক

জয়ন্ত মিস্ত্রী

Kwe Kwj`vm ivq : Dcjwäi mZZvq

‘A long life may not be good enough’, but a good life is long enough’—Benjamin Franklin

Kwj`vm iv‡qi (09.07.1889—1975) c_g KweZvi bvg †gN I gqi -hw` I GwU cKwkZ nq A‡bK c‡i| 1913 mv‡j| Zvi cvP eQi Av‡MB †ewi‡q †M‡Q K›`ª (1908) bv‡gi c_g Kve¨MšwU| gvbmx,ª e½evYxª, K_vmwnZ¨ª, kwbev‡ii wPwVª, msnwZª, fviZel ª-G Zvi KweZv †ewi‡q‡Q ARm| cwiwPwZ †M‡Q †e‡o| iex›`-HwZn¨,cj-x‡cg, ^eòecvYZv cvPxb I AvawbK mwnZ¨-cvV RwbZ ^e`»¨ wk¶‡KwPZ gj¨‡eva—mewgj‡q †mKv‡ji iex›`vbmvix Ab¨ Kwe‡`i †_‡K Zvi ¯vZš¨ mn‡RB aiv c‡o| eû ci¯w‡i fwlZ GB Kwe| wekfviZx †_‡K ª†`wk‡KvËgª Avi KjKvZv wekwe`¨vj‡q mv¤§wbK wW. wjU| ªisci mwnZ¨ cwilr †_‡K wZwb ªKwe‡kLiª Dcwa†Z 1920 mv‡j fwlZ nb| ªcYvûwZªKv‡e¨i Rb¨ cwðge½ miKv‡ii Zi‡d cvb ªiex›` ci¯wiª (1968)|

eagvb †Rjvi KoB Mv‡g ivpx ‰e`¨es‡k Rb¨ n‡jI Kgm‡Î wk¶K wn‡m‡e kni Rxe‡bi ¯v`B †c‡Z n‡q‡Q cvq Rxeb‡fvi| KjKvZvi fevbxc‡i wgÎ BbmwUwUDk‡b GKUvbv GKwÎk eQi wk¶KZv K‡ib| Kwe cwiwPwZi †ewk mgqUvB Uwj M‡Ä ª mÜ¨vi Kjvqª, bv‡g wb‡Ri GKwU ewo‡Z emevm Ki‡Zb| 1975 Gi 25-G A‡±vei wQqwk eQ‡i †`nZ¨vM K‡ib|

h‡MwPZ Rxeb-hšYv †_‡K wZwb g³ wQ‡jb bv| cvkvcwk cvPxb ms¯‹Z mwn‡Z¨i wbweo cvV wQj e‡j Q‡›`i ^ewPÎ¨I mnR-mva¨ wQj| cj-xRxeb Avi ^eòe Kve¨ms¯vi -GB `‡qi cfve me‡P‡q †ewk KvR K‡i‡Q Zvi Rxe‡b| ªb›`ciP›` webv e›`veb AÜKvi !ª / P‡j bv Pj-gjqvwbj ewnqv djMÜfvi |/ R‡j bv M‡n mÜ¨v`xc /d‡U bv e‡b K›`bxc, / Q‡U bv KjKÉmav cwcqv-wcK-P›`bvi|/e›`veb AÜKvi\ª wKsev ª`bKi-Ki PÊ cLi iZ PivPi cwi`vn‡bª - ZviB cwiPqevnx|

wekkZ‡Ki c_g `k‡KB K‡j‡R-Rxe‡bB cPi KweL¨wZ jvf K‡ib| ªcevmxª, ªfviZxª, ªRvýexª, ªDcvmbvª-q Zvi KweZv wbqwgZ cKwkZ nZ| c‡e D‡j-wLZ Kwei c_g Kve¨Mš ªK›` ª (1908) DrmM K‡iwQ‡jb iex›`bv_ VvKi‡K| c_g MšB we`»R‡bi cksmv Kovq| bexbP›` e‡jwQ‡jb :ª ¶` AYcgvY ex‡Ri g‡a¨ †hgb eb¯úwZi Rxe‰bkh wbwnZ _v‡K ...GB ¶` c¯‡K †Zgwb GKRb fwel¨‡Zi

mwnZ¨i_xi Rxebv¼i I gKwjZ kw³ wbix¶Y Kwi‡ZwQ|ª Am¯ wQ‡jb iRbxKvš সেন, †mmgq G eBwU Zvi ü`q¶‡Z mvšbvi c‡jc w`‡q‡Q e‡j wZwb ¯xKvi K‡i‡Qb| cKv‡ki GKvš AvšwiKZv wfb GgbwU AbfZ nqbv| 1911 mv‡j ªwKkjqª Kve¨M‡ši cKvk| †ngP›` I bexbP‡›`i LÊ-KweZv I A¶qP›`-†`‡e›`bv‡_i MxwZKweZvi cfve ZLbI KwU‡q DV‡Z cv‡ib wb| Z‡e mvd‡j¨i m¤vebvI †Mvcb _v‡Kwb| Kwe wn‡m‡e wZwb HwZn¨‡cgx-Gi d‡j mgKv‡ji D‡c¶v Zv‡K mB‡ZB n‡q‡Q| G‡Zv ¯vfweK| Z‡e Zvi `¶Zvi ¯xKwZI wQj mskqvZxZ|

ªfviZxª cwÎKvi g‡Z ªLe eo `¶ Kvi“Ki-wfb GB †kvYvi Epigrammetic KweZv mvdj¨ jvf Kwi‡Z cv‡i bv| bexb Kwe wn‡m‡e wZwb HwZn¨‡cgx-Gi d‡j mgKv‡ji D‡c¶v Zv‡K mB‡ZB n‡q‡Q| G‡Zv ¯vfweK| Z‡e Zvi `¶Zvi ¯xKwZI wQj mskqvZxZ| ªfviZxª cwÎKvi g‡Z ªLe eo `¶ Kvi“Ki-wfb GB †kvYvi Epigrammetic KweZv mvdj¨ jvf Kwi‡Z cv‡i bv| bexb Kwe wn‡m‡e wZwb HwZn¨‡cgx-Gi d‡j mgKv‡ji D‡c¶v Zv‡K mB‡ZB n‡q‡Q| G‡Zv ¯vfweK| Z‡e Zvi `¶Zvi ¯xKwZI wQj mskqvZxZ| 1914 mv‡j ewikv‡ji †`eKgvi †PŠawii A_vbK‡j¨ eÜM‡Yi †Póvq Zvi ªcYcUª (c_g LÊ ) cKwkZ nq| G Kve¨M‡ši bv‡gi mv_KZv wb‡q mw›`nvb n‡qwQ‡jb gnvZ¥ AwkbxKgvi `Ë| ªg‡b nBj ¯YcU bvg ivLv nBj bv †Kb? ci¶‡YB g‡b nBj RM‡Zi wPËnwiYx gvaix c‡Y? bv ¯‡Y? cj-x-KweZv I Rxeb-MxwZ cvV Kwiqv cYcU bvgB h_v_ g‡b nqª| Zvi mZZv ¯‡ZvcKwkZ | GB Rb¨B wZwb mK‡ji Kv‡Q MnYxq I m¤§vbbxq| cm½Z g‡b c‡o GKwU KweZvq (True Nobility) Robert Nicoll e‡jwQ‡jb ªThe palace or the hovel

Where first his life began ,
I seek not of; but answer this -
‘Is he an honest man ?

†gwK bq ,Zvi Dcjwäi mZ¨ Ges cKv‡ki mZZvq †mKv‡ji meÎ MšwU e¨vcK mgv`Z nq| iex›`bv_ †j‡Lb :

ªKvÂb-_vwj bwn Avgv‡`i
Ab bwnK R‡U ,
hv Av‡Q †gv‡`i G‡bwQ mvRv‡q
bexb cYc‡U|ª

-G Kv‡e¨i imv‡e`b cvV‡Ki `k¨gvb RM‡Zi gva‡h Avi cKv‡ki h_v_Zvq Ab¯xKvh| ªcYc‡Ui ¯‡j ¯‡j cwo‡Z-cwo‡Z Mv wknwiqv I‡V| †Pv‡L Rj ivLv `®i nq|ª GKB Awfe¨w³ cKvk K‡iwQ‡jv wnZev`x cwÎKv : ªGi cj-x-KweZv,wj cwo‡Z cwo‡Z †P‡L Rj Av‡m, ^eòe KweZv,wj gg¯úkx I mgai|ª GB MšwUi cÂg ms¯‹i‡Yi gLc‡Î max›`bv‡_i ¯xKwZ :

ªgw`Z Av‡jvi Kgj-KwjKwU‡i
†i‡L‡Q mÜ¨v Avavi -cYc‡U
DZwi‡e h‡e becfv‡Zi Zx‡i
Zi“YKgj Avcwb DwV‡e d‡U|ª

iex›`bv_ Mvg-Rxe‡bi cfve g‡b †i‡L Kwe Kwj`v‡mi KweZv wel‡q wj‡LwQ‡jb : Ô†Zvgvi KweZv evsjvi‡`‡ki gwUi gZB wm» I k¨vgj| evsjv†`‡ki cwZ Mfxi fvjevmvq †Zvgvi gbwU Kvbvq Kvbvq fivÑ‡mB fvjevmvi D"QwjZ avivq †Zvgvi Kve¨-Kvbb mim nBqv †Kv_vI ev †g`i, †Kv_vI ev cdj- nBqv DwVqv‡Q| †Zvgvi GB Kve¨¸wj cwo‡j evsjvi QvqvkxZj wbfZ AwObvi ZjmxgÂ I gvaex KÄ g‡b c‡o|Õ e¨w³ Rxe‡bi mZZv I wb‡jvf e¨w³Z DrmwiZ|

Take time to dream- /It is hitching your wagon to a star.

fMevb e‡×i DcvmK Kwj`vm ivq e¨w³Rxe‡b kvš— †mŠg¨ I wbwjß g‡bi AwaKvix wQ‡jb| Kwe wekvm K‡ib KweZv †jLvi we‡kl mgq I gvbwmKZv c‡qvRb|

ÔKweZvi w`bÕ-GB KweZvq wZwb e‡j‡Qb :

Ôgvbe hLb nqwb `vbe Ggb wnsm µi,
gvb‡l-gvb‡l wQj bv hLb e¨eavb GZ`i|
cvY-ni‡Yi †P‡q †ewk wQj gb-ni‡Yi NUv,
hMRbbxi wPKb wPK‡i ev‡awb Ggb RUv|
Elv h‡e wQj ivOb, wbkv wQj M-wbnxb,Õ
ZLb Rxe‡b KweZv‡iv wQj w`b|Õ

(c. 131,Kwj`vm iv‡qi †kô KweZv, †Mviv wmsnivq -m¤úvw`Z, c_g cKvk Rvbqvwi,2002,fvive,KjKvZv)

gvbe mgv‡Ri wPišb cv_bv GKwU AvBwik KweZvq cKvk †c‡q‡Q AvR‡Ki hM-Rxe‡b Zv e‡ov cvmw½K| †mB KweZwU Z‡j aivi Av‡M ewj Kwe‡kL‡ii Rxe‡b GB cv_bvi cwZwU PiY mZ¨ n‡q‡Q| Dwbk kZ‡Ki evOwj mgv‡Ri †h Ask Av‡jvK cvß- †mB As‡ki g‡a¨ m›`i mgvR MV‡bi †Póv Avi c_-mÜvb wQj gnËi j¶Y | GLb cv_bwU †kvbv hvK :

Time for Every thing

'Take time for work-It is the price of success.
Take time to think-/ It is the source of power.
Take time to play-/It is the secret of youth.
Take time to read -/It is the foundation of wisedom .
Take time to be friendly- /It is the road to happiness.
Take time to dream- /It is hitching your wagon to a star.
Take time to love and be loved-/It is the privilege of the gods.
Take time to look around- /it is too short a day to be selfish.
Take time to love-/ It is the music of the soul .

---Irish Prayer

Av‡jvP¨ KweZvq Gic‡i wZwb KweZvi weï× cwi‡ek wb‡q e‡j‡Qb:

1) Ô‰`‡b¨i I gv‡S cmbg‡L jwMqv _wKZ nwm,
†M‡q †hZ †b‡q ; KviLvbv bq, ivLvj evRvZ ewk|Õ

2) Ôn‡Ki cvc¨ cvB‡Z nZ bv V‡Ki PiY a‡i,
c‡`-c‡` †Kn ewaZ bv †`n wewawb‡l‡ai †Wv‡i,
¯vaxb wQjvg nBwb †Mvjvg, bv‡g ïa civaxb,
ZLb Rxe‡b KweZv‡iv wQj w`b|Õ

3) Acwßi nvnvKv‡i Kwe e‡jb :
Ô†mB †`n bvB, †mB †Mn bvB, †mB wcqv bvB Avi,
†mB wnqv bvB- †_‡g †M‡Q Mvb, ïwb ïa nvnvKvi|Õ

4) Kwe †NvlYv K‡i‡Qb KweZv †jLvi w`b Avi †bB :
ÔcKwZi ab mwe civZb Avi bwn gb n‡i ,
Ab`v aiv RiZxi †e‡k ïaB Qjbv K‡i|
†mB AwL bvB, mwó gwjb,`wó n‡q‡Q ¶xY,
divi‡q wM‡q‡Q †gvi KweZvi w`b\Õ

(c. 132,KweZvi w`b,Kwj`vm iv‡qi †kô KweZv, †Mviv wmsnivq - m¤úvw`Z, c_g cKvk Rvbqvwi,2002,fvive,KjKvZv)

Kwj`vm iv‡qi Kve¨Rxeb AakZvãx -we¯Z| Zvi Abfe Avi Kve¨vbfwZi Le-GKUv cvieZb †klRxe‡bI N‡Uwb| h‡Mi cvieZ‡bi mv‡_ Zvj i¶vq Amg_ Kwe | GB Amvg‡_i KviY cwZfv bq i“wP | Kwe wej¶Y  †mK_v Rvb‡Zb | ÔKwei we`vqÕ KweZvq wZwb e‡j‡Qb :

Ôwe`vq wbj j‡KvPwi wkDwj hB Gi e‡b
Ôwe`vq wbj mRj †Pv‡L bI-em‡Zi KÕ‡b |
we`vq wbj KvP‡cvKv wUc, bq‡b KvRj,
bvKwU nÕ‡Z †bvjK †gwZ, PiY nÕ‡Z gj|
we`vq wbj jvj †c‡o Ava †NvgUwU eai
mij mfq Zij †Pv‡Li PvDwb mgai|
mevm fiv †U°v †Lvcvi Pvi" wPKb Qwe,
Zv‡`i mv‡_ we`vq wbj Kwe|
...   .
h‡Mi nvIqv e`‡j †Mj , wbwf‡q w`j So
e½gvZvi AvPj Av‡oi `xcwU g‡bvni |
Kwei hZ cwR cvUv we`vq wbj mwe

Zvnvi mv‡_ we`vq wbj KweÔ

Take time to love and be loved-/It is the privilege of the gods.

†ivgw›UKZv :

MvMwifiY KweZvq ^eòe c`vejxi kxivavi Abl½ Kweg‡b we‡kl cfve †d‡j‡Q, Zv‡Z we‡kl †cwgKv †c‡q‡Q wbwe‡k‡li †Qvqv :

ÔMvMwifi‡Y G‡mwQ‡j Zwg Avgvi Rxeb w`wN‡Z,
Mv Wev‡q R‡j D`vmbx n‡j Kx Mx‡Z ?
ïwb‡Z ïwb‡Z Zb¥q n‡q
Wwe AvKÉ †M‡j Zwg i‡q,
n‡jv bv‡Kv †div, mv‡Ri Zcb Wwej †`wL‡Z-†`wL‡Z|Ô

cvVK kxgZx iwaKvi i‡c`k‡b g» wenŸj| Gi d‡j Avgv‡`i gvbm c¯wZ AvR‡Ki MwÊ Qwo‡q GK Abš wekv‡mi RM‡Zi †`Lv †cj| gb Avi BnRvMvZK Z"QZvq Ave× bq, †Kv‡bv m¼xY wel‡q AvU‡K †bB| RMr wcqv-gq n‡q †Mj :

Ô Ze gLLwb Kgj nBqv d‡U Av‡Q †`wL cfv‡Z,
Av‡jv Kwi w`wN Aci‡c be-†kvfv‡Z |
Ze †Kkcvk nj ^kevj
MvMwi †Zvgvi n‡q‡Q givj,
w`wNi mwjj K‡i DËvj cvLvi SvcU-AvNv‡Z|Ô

(c. 131,MvMwifiY, Kwj`vm iv‡qi †kô KweZv, †Mviv wmsnivq-m¤úvw`Z, c_g cKvk Rvbqwi,2002,fviwe,KjKvZv)

^eòecvYZvi cKvk NU‡j I Kg`iÄ‡bi gZ Z‡Zv g‡bi Mfx‡i †cŠQvqwb - GK_v ¯xKvh| Z‡e Gi wbwe‡kl Av‡e`b j¶Yxq| GKwU gai fvebv Kwe gb‡K Abš †c‡gi ¯v` `vb K‡i‡Q| ZvB Zvi †cwgKv wbwe‡kl mËvq wekgq Qwo‡q c‡o‡Q| :

ÔGKwU Kgj mnm`j,cwigj Adiš,
ga M‡j Zvq ,†m avivq bvB Aš|
ga n‡q †Mj G w`wNi Rj,
ewmZ Kwij Zv‡i cwigj,
evYxi evnb nBqv givj K‡i Zv‡i cvYeš| (¯cb -cmvix)

Ôevsjvi w`wNÔ KweZvq Kwei g‡b cK‡ii Rxeš mËv D™vwmZ|
ÔcwZw`b ea cv‡Yi evZv K‡q hvq Ze Kv‡b,
MvMwifi‡Y Ze evYx Zviv ï‡b hvq KjZv‡b|

Rovq A½ †mvnvwMbx ea
Xvwj Zi‡½ ü`‡qi ga,
Kg‡j ZvnvB mwÂZ wKbv Awj Qvov ‡Kev Rv‡b?
cv‡qi AvjZv †KvKb‡` Zviv †i‡L hvq cwZ`v‡b|Ô

(c. 133,evsjvi w`wN,Kwj`vm iv‡qi †kô KweZv, †Mviv wmsnivq -m¤úvw`Z, c_g cKvk Rvbqwi,2002,fviwe,KjKvZv)Ñ Kwe g‡bi GB †ivgw›UK Abfe e¨w³ wPwýZ |

Take time to look around- /it is too short a day to be selfish.

†h we¯§q-wenŸjZv mZ¨Kvi Kwe-¯fv‡ei móv Zv Zvi Rb¥MZ| cvPwU ¯e‡Ki Aš¨gjh³ 30wU Pi‡Yi GB KweZvq Kwei wbmM-g»Zv Amvavi Y | ¯fv‡ew³ I mij cKvkfv½i m½‡Z-evYxgq I `k¨gq| ¯fveZB Dc‡fvM¨:

ÔÔAevK KwiZ †gv‡i
†Kg‡b kxY wS‡Oi jZwU d‡j-d‡j †hZ f‡i|
fweZvg jZv †Kv_v n‡Z GZ njw`qv iO cvq,
meR †Kg‡b †mvbwj nBqv L‡oi Pvjwu Qvq|
fweZvg ZvB , ^eKvjx †iv` cvb Kwi Zvi nvwm
d‡U wK DwVj †`vPvjv fviqv dj n‡q iwk-iwk?Ô

(c. 137, Ôevj¨¯§ZÔKwj`vm iv‡qi-†kô KweZv, †Mviv wmsnivq -m¤úvw`Z, c_g cKvk Rvbqwi,2002,fviwe,KjKvZv)

e¨½ I †k-lvZ‡K KweZv : **Take time to think-/ It is the source of power.**

ÔMvavÔ-KweZvwU 22 wU csw³wewkó| me-`xN PiYwU 18 wU eYMwVZ| Avi mewaK Le csw³wU mvZ aŸb wewkó|

Ôe³Zv Kwi‡j Zwg, gwq‡Ki †bB c‡qvRb,
AgwqK Rxe Zwg, `xNc"Q m`xNkeY|
†KvUc¨v›U cwi h‡e e‡mv wM‡q Awd‡m †Pqv‡i,
ZLb M`f Qvov †K wPwb‡Z cv‡i?Ô

wkw¶Z mgvR bxi‡e KZvi †fv‡Mi †evSv e‡q †eovq| i‡³ Zvi nvRvi eQ‡ii `vmZ| Zv‡`i mvnvh¨ Qvov †Kvb kvmK `jB †kvlY-Pµ Pvjv‡Z cv‡i bv| †avevi cZx‡K Kwe †m K_v e‡j‡Qb :

Ô†avevi evevi mva¨ bq-
†m MÜgv`b Nv‡o eq|
mesmn aiÜi †Zvgvi kiY-
wbj †k‡l iRKb›`b|

n‡j Zwg ÔivRKxqÕ Rxe-
A‡bK UvKvi †ek Ze A‡½| †K e‡j Mixe?
wejwmbx-wejvmxi cig evÜe nj †avev,
Zvnvi evÜe Zwg, †n wbixn †evev|
wbtk‡ã ewnQ fvi ZvB †Zvgv †evev ewjjvg,
†Zvev †Zvev| †K bv Rv‡b Ze KÉ¯‡ii mbvg ?
†iwWIi †hvM¨ Ze D”P-KÉie
†Zvgvi msMxZ †hev e‡S bv‡Kv †mB †Zv M`f|Õ
(ÔMvavÕ,c.138-139, `ši“wP †KŠg`x,Kwj`vm iv‡qi †kô KweZv, †Mviv wmsnivq -m¤úw`Z, c_g cKvk Rvbqwi,2002,fviwe,KjKvZv)
GKB fv‡ei cKvk N‡U‡Q Ô†Zvgiv I AvgivÕ KweZvq :
Ôd¨vmvbÕ -gwdK †cvkvK Kwi‡Z nq
†L‡U-L‡U mvea v‡b,
Mj`Ng n‡Z nq KZ e‡q
†avcvi MvavB Rv‡b|
mv‡ne-m‡evi mv‡_ †Ljv, emv, Pjv,
evsjv bq †Mv BsiwR K_v ejv,
KZ †Vjv Rv‡bv, gv‡S-gv‡S Kvbgjv
Pc K‡i mB ZvI \Õ
(Ô †Zvgiv I AvgivÕ ,c.141-142, `ši“wP †KŠg`x,Kwj`vm iv‡qi †kô KweZv, †Mviv wmsnivq-m¤úw`Z, c_g cKvk Rvbqwi, 2002, fviwe,KjKvZv)
mwói Kv‡R KvVweovjxI gj¨evb :Õ**Capacity of taking infinite pains’**
Ô`ši“wPÕ†KŠg`x Kve¨M‡ši †PŠc`x KweZvi 2 bs AbKweZvq -ejvevûj¨ †PŠc`-wewkó c‡`¨ KvD‡K Z”Q bv fvevi K_v e‡j‡Qb Kwe| wkwki we›` ¶`wZ¶` wKš †mI cw_exi Kv‡R bxi‡e h³| mZivs †KvbI gvblB Z”Q bq-GUvB Kwei e³e¨|
Ô GKwU KYvI wkwk‡ii ewi e¨_ bq,
Zviv wKQ bv cvi“K dUvq K›`-Kwj |
Z”Q nDK ZYc®úI e¨_ bq,
f‡i h_vkw³ mwói AÄwj \Õ(c.139)
KweZvi welqe¯, †`nwbgvY, Dcv`vb msMnÑmeÎB mhZ cwik‡gi cwiPq wbwðZfv‡e Av‡Q| KvjvBj Kw_Z Kwe-cwZfvi GB ¸Y¸wj Aek¨B Zvi wQj| ÔFZg½jÕ Kv‡e¨i Ô FZj²xÕ KweZvwU Kwei cwikgx Pwi‡Îi Abe`¨ D`vniY n‡Z cv‡i| Zvi Q›`‰bcY¨, wPÎv¼b `¶Zv Ges Z_¨mgvni‡Yi ^bcY¨ cKvk †c‡q‡Q| cm½Z wKQUv D×Z Kiv hvK :

ÔwbÕ`v‡N †Zvgvi i“`vYxi¡c, B›`vYx eilvq,
ki‡Z ïåv ev‡°ex Zwg, fv¯i Ze Kvq|
k¨vg †ng‡š Kj¨vYx igv, AbcYv kx‡Z,
†cg-em‡š djab iPÕ iwZ i¡‡c AUex‡Z|
GK †Pv‡L nwm, Avi †Pv‡L aviv, †g‡N-iPv Ze †eYx,
A‡kl k¨vgj evmwe¯v‡i k¨vgjv hvÁ‡mbx|Õ
... ...
ci‡k †Zvgvi d‡U wcq½,g›`vi gafv‡l,
e`bgvi“‡Z PZgÄix,P¤úK g` nv‡m,
m½xZi‡m b‡gi“ weK‡k ÑbU‡b KwYKvi,
wZjK Kmg cjK wkn‡iÑ`wói Dcnvi
n‡¯ †Zvgvi jxjviwe›`, K›` AjK Ôc‡i
†jva-civ‡M MÊ †Zvgvi cvÊi †kvfv a‡i,
Povcv‡k Ze be Ki“eK, ke‡Y wkixl-`j,
Pvi“ mxg‡š cjKwÂZ †kv‡f K`¤ dj|Õ
ÑKwe‡kL‡ii m¤ú‡K Kwe-mgv‡jvPK †gwnZjv‡ji gše¨wU cwYavb‡hvM¨ : ÔÔKwj`vmeve iex›`h‡Mi Q‡›`vwbcY¨ gvÎ Avkq Kwiqv, cvPxb evsjv Kve¨-avivwU‡K bexb Kwiqv Zwjqv‡Qb| Zvnvi evM‰e`»¨ I Aj¼vi-cxwZ †hgb ms¯‡Zi Abi¡c, †Zgwb mij AKcU AbfwZi mwnZ A_‡MŠie wgwjqv Zvnvi Kv‡e¨ LwU classical f½x dwUqv DwVqv‡Q| GZ`e¨ZxZ wZwb Zvnvi KweZv¸wj‡Z evOvjxmjf fvlvKjZv Ges evsjvi cj-x Rxe‡bi Aši ewn‡ii i¡cgvaixI cwi‡ekb Kwiqv‡Qb, cvPxb ^eòeKwe‡`i cfveI Aí b‡n| GB mKj ¸‡Yi mgev‡q Kwe Kwj`vm iv‡qi KweZv †hgb †jvKvcqZv, †Zgwb GKwU mnR ¯KxqZv ARb Kwiqv‡Q|Õ (m¤úv`‡Ki fwgKv, ÔAvniYÕ KweZv-msKjb, 1950) mgv‡Ri Am½wZ Kwei `wó Govqwb| Kj¨vYgq mvgwR‡Ki ¯cI †`‡L‡Qb |
agaÿRx‡`i QÙ‡ek : 3bs KweZvq agaÿRx‡`i QÙ‡ek GKwU mvgvb¨ Zjbvq cKvk K‡i‡Qb :
ÔawgK bq †mB mK‡ji †P‡q
Ôag-ag wPrKvi K‡i †hev,
g»`iP‡o ewm Wv‡K mviw`b
cY¨ c¶x Kv‡K‡i e‡j‡Q †Kev ?Õ (c.139)
B`i †`Š‡o Awekvm :
gvbl cwZwbqZ A‡_i wcQ‡b †`Šov‡”Q| wg_¨v An¼vi Ki‡Q| DËiwaKvim‡Î

abxe¨v³ An¼vi Ki‡Q| Rgv K‡i †Zvjvi bvg m¤ú‡`i eÜ× bq GK_v †evSv‡Z Kwe e‡j‡Qb :

ÔemavÑKv¶‡Z hZ km¨-avZ-ab
D×vi Kwi‡Z n‡e Kwi cvYcY|
†ePvivg wekv‡mi ab hw` cvq †Kbvivg
abeÜ× bq Zvi bvg !

gvb‡li AvPi‡Y bóv‡gv Avi †ckj Avùvj‡b wei³ Kwe e‡jb :
Ôivgvq‡Y KqRb evb‡ii LwZ‡i
Av‡Rv †gviv cwR †MvUv evb‡ii RwZ‡i|
wk‡ei evnb lvo ^KjvmwkL‡i,
†ec‡ivqv me lvo nv‡U ZvB wen‡i\Õ (44 bs †Pšc`x,c.140)

Kwe †Kej wb›`v K‡ibwb ; 47 bs †Pšc`x‡Z gvb‡li AvPiYxq KgwU GKRb cKZ wk¶‡Ki gZB wb‡`k K‡i‡Qb:

Ôwe`¨veÜ× me f‡j nI wkïi gZ wekvmx,
nI wefwZi AcvK‡Zi A‡jŠwK‡Ki Zj-wwk|
jwRK-wdwRKm f‡j kiY jI g¨wR‡Ki fvÊvixi,
gv³ †Zv PvI, hw³ †Zv‡jv, Dw³ †kv‡bv KvÊvixi \Õ

ÔMv_vKwnbxÕ (1964)ÕKv‡e¨i Ace cvZwnsmv Õ KweZvq Kwe nZ¨vq bq fv‡jvevmvq ü`q Rq-Gi K_v e‡j‡Qb| Rbve BDmd cÎ-nšv‡K nv‡Zi bvMv‡j †c‡qI Zv‡K ¶gv Ki‡jb | KwnbxwU GiKg :ÔewP‡Z Pwnbv Avi / Rxeb Avgvi mwcqv w`jvg kxPi‡Y Avcbvi | / Bewn‡gi ¸ßNvZK Awg Qvov †KD bq| / H AwmLvbv G e‡K nvbb, -Bgv‡bi †nvK Rq \Õ ZLb Ôe‡×i AwL e‡Ri g‡Zv mnmv DwVj Rwj /eR`xY †g‡Ni gZbB Ak"‡Z †Mj Mwj/ ewjj e×-ÔGZ w`‡b Gwj , GZKvj LwRjvg ,/ wb‡R G‡m nv‡Z aiv w`wj AvR| NvZK , wK †Zvi bvg?/ _vK, Ñbv‡g Avi wK KvR Avgvi Ñgvd Kwijvg †Zv‡i,/ me-‡miv †Nvov w`jvg, GLwb cvjv Zvi wc‡V P‡o |/cvP¸Y UvKv wb‡q hv m‡½ Ñ

†PvL Sjmv‡bv mf¨Zvi Aši‡j gvb‡li ü`qnxbZvq Kwe e¨w_Z | Kv‡jvevRwi wfb jvMvgQvov A_ †Kv_vq ?

Õ†Zvgiv I Avgiv Õ-KweZvi g‡a¨ `Bfv‡M Pvcvb-D‡Zvi ïwb‡q‡Qb| mvaviY gvb‡li g‡bi K_v e‡j‡Qb GB KweZvi c_g fv‡M| wØZxqfv‡M Reve w`‡q‡Qb abx †jv‡K‡`i RevbxZ | mvaviY gvb‡li K_v : Õ†nvgiv †Pvgov †Zvgiv †gvU‡i avI, / Avgiv †nvPU LvB|/PvKvi Kv`vi wQ‡Uq mwRqv fZ/ Awd‡mi cv‡b avB|/ Pwj nvU R‡j iv¯v LwRqv -LwRqv,/ †n‡Uvi Kvco †Kvg‡i Zwjqv ¸wRqv,/

†`wi n‡j cv‡Q i"wR gviv hvq ewS ev/Pwj ZvB QwUqvB \Õ Gi c‡i Kwei cwZev` µgk Zxe n‡q‡Q : ÔPcKvU‡jU †nv‡U‡j wMwjqv Vvmqv ,/wm‡bgvq hvI †c‡Ui †MwÄ dwmqv,/Avgiv †hb †Mv ev‡Y AwmqwQ fwmqv,/Lwj †c‡U Zwj nvB\Õ wØZxq fv‡M abxi Rev‡e e‡jb : Õ †mvRv bq Pv` fv‡jv LvIqv fv‡jv civ,/†gvUi j¨v‡YBv Pov,/ †`bvi Lei hw` †kv‡bv Z‡e n‡e / †PvL `‡Uv Qvbv eov |/ NN †`wLqvQ, dv` †Zv †`Lwb Zvi ,/ †`vKv‡bi wej †`L hw` GKevi , / n‡q hv‡e Z‡e Ava-nvZ wRf evi |/ eKv‡qv bv | bvI ! bvI!!Õ

Take time to play-/It is the secret of youth

gRvi gvbl wZwb| Drmvnx cvV‡Kiv Zvi ÔimK`¤(1923) Kv‡e¨i ÔewÂZ Õ, ÔNZs wc‡er,Õ Õ†c‡Ui `vqÕ KweZv ¸wj co‡j gvbe Rxe‡bi wÎ`kv‡ZB (^kke, ^K‡kvi,†hŠeb) wd‡i †h‡Z cvi‡eb | GiKgB Zvgvkvi im Rgv‡Z †Ljvi Q‡j †j‡Lb Õ†bkv‡Lv‡ii Awfavb-Gi g‡Zv KweZv :

ÔMvRv †L‡j †M‡Rj hw`, g` †L‡j nq ÔgvZvjÕ,/ bwm¨ wb‡j Õ†b‡mjÕ Z‡e, -Pv-‡L‡j ÔPvZvjÕ|/

di"K-di"K ¸oK Z‡e / Uvb‡j c‡i Õ ¸iLvÕ n‡e,/ Pi"U †L‡j Õ †PviVv Õ ewS ¸wj †L‡j Õ¸jvjÕ\Õ (Z‡`e 142)

Take time to read -/It is the foundation of wisedom .

we`» gvbl wZwb| cvPwU Abev` Kve¨Mš wZwb iPbv K‡i‡Qb : ÔMxZ‡Mwe›`Õ(1930), ÔMxZvjnixÕ(1932), ÔkKšjvÕ (1944),ÔKgvim¤eÕ (1952), Õ †gN`ZÕ(1955)| lvU eQ‡i wZwb ARm KweZv wj‡L‡Qb| fv‡jv, g›`-meB Av‡Q| Kwe wb‡RB e‡j‡Qb Õ wesk kZvãxi GB wØZxq `k‡KB Avgvi KweZvi †¶‡Z cPi dmj n‡qwQjÑ Zv‡Z cieZx `k-c‡b‡iv eQi gwmK c‡Îi im‡`i †hvMvb w`‡Z †c‡iwQjvg| AweiZ gwmK c‡Î M‡íi Zjvq KweZv cKwkZ nIqvq bvgwU †`‡k cwiwPZ n‡q †Mj|Õ (mseva‡Zi fvlYÕ,kwbev‡ii wPwV,fv` 1364) Zvi we¯Z cov‡kvbvi cwiPq †jLvi g‡a¨ cPi cvIqv hvq |

ÔcYvûwZÕ (1968),Õ AvniYÕ (1950), ÕjvRvÄwjÕ(1925) ÕwPËwPZvÕ (1927),ÔAvniYxÕ(1930) cfwZ Kve¨ Mš G cm‡½ ¯§iYxq | kv¯Ávb Avi agcvYZvi ¯i{cvU Zv‡Z AvfwmZ nq | ÔM½vÕ, ÔFZj²xÕ Zvi fviZ-ms¯wZi cwZ fvjevmvi cKvk| evOwj Abiw³i cKvk N‡U‡Q ^eKvjx Kv‡e¨i ÔPv` m`vMiÕ KweZvq| ÔQvÎaviv Õ evsjvKv‡e¨ weij †kvYi KweZv| wk¶K Rxe‡bi Uv‡RwW d‡U D‡V‡Q Õ wk¶K RxebÕ, Õ wk¶‡Ki mvšbvÕ, ÔAvniYxÕ BZ¨w`‡Z| ^eKvjx, jvRvÄwj, cYcU, ¶`Kov ,BZ¨w` Kv‡e¨ ga¨weË Rxe‡bi evOwj Mn¯ N‡ii †e`bv gvaix, Avb›`, Dj-vm,`tL, †kvK †hgb cKvk †c‡q‡Q †Zgwb Kb¨v‡q cÎ‡kvK, Mnweev`,

†mn¯§wZ, eÜ¨vi‡e`bv, wkïi `iscbv, gv‡qi Kó, wK‡kvixi we¯§q †eŠw`i †mn †g‡qi Awfgvb Ai¶Yxqvi e¨_vÑAvgv‡`i nwi‡q hvIqv ^kke Avi avZ Mvg‡K wdwi‡q †`q| Ae‡k‡l Kwei gj¨vqb Kwei K_v‡ZB :

ÔAwg evOvjxi Kwe, ev½vjxi Aš‡ii K_v,
ev½vjvi Avkv-Zlv, ¯§wZ¯c, wPišb e¨_v
Q‡›` †M‡q hvB Awg| Aå‡f`x b‡n Zvi Zvb,
†`k‡`kvši jwM b‡n †gvi Kjv‡qi Mvb |
hMhMvši-c‡_ hvÎv Zvi b‡n †Kv‡bv w`b,
KwÚZ Zvnvi KÉ, e¶ fxi", c¶ Zvi ¶xY |
(†kl K_v, ^eKvjx)

Kwe Avgv‡`i †Pv‡Li mvg‡b †bB| Pvw¶K ev¯‡ei mv‡_I Zvi †Pbvi `¯i e¨eavb| wKš g‡bi Mnb †Kv‡Y †hLv‡b Avgv‡`i `i¯§wZ AvKj K‡i †Zv‡j †mLv‡b Zvi ¯vbwU cvKv n‡q Av‡Q| wbkx‡_ wbivjvq wb‡Ri K_v fve‡Z †M‡jB Zv‡K g‡b c‡o| B`i †`Š‡o †b‡g †M‡jB M`¨-w`‡bi Kov-Av‡jvq me †Kgb †m‡K‡j g‡b nq| w`kvnviv evOvwj wb‡Ri Rb¨ mgq LR‡e GKw`b! †mw`b Kwe‡kLi Kwj`vm‡K g‡b co‡eB, g‡b co‡e cvV‡Ki wb‡Ri avZMvg Avi cwiRb‡K| cv‡e bvox †Qovi †mB ^kke hšYv| e¨_v Avi mL|

■ জয়ন্ত মিস্ত্রী—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

হাবিব সরকার

জীবনানন্দের অন্ধকার চেতনা

কাব্য জগতে জীবনানন্দ দাশের যে যাত্রাপথ অতিবাহিত হয়েছিল তা মূলত আলো অন্ধকারের আবহে। রবীন্দ্রোত্তর কবি হিসাবে পরিচিত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নেতিমূলক জীবনদর্শন তাঁর কাছে গ্রহণীয় নয়, আবার তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো বলতে চান না যে—'আমি কবি যত ইতরের'। কেননা তিনি বলেন—

"ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;"
[বোধ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি]

মানুষের জীবন আলো অন্ধকার, আশা-হতাশা, চাওয়া পাওয়া, আনন্দ-বেদনা নিয়ে। মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, যে কুড়ে ঘরে থাকে সেও কিন্তু স্বপ্ন দেখে, আবার যে অট্টালিকায় থাকে সেও স্বপ্ন দেখতে কম করে না। মানুষের জীবনে স্বপ্ন সফল না হলেও মানুষ কিন্তু স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায় না। একটি স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি স্বপ্ন নিয়ে আসে মানুষের জীবনে। স্বপ্ন দেখা যেমন মানুষকে আলোকিত করে তেমনি স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া মানুষের জীবনকে অন্ধকার বা দুর্বিসহ করে তোলে। তাই আরো একবার বলতেই হয় যে মানুষের জীবন যেমন সিঁড়ির মত চড়াই উৎরাই তেমন অপরদিকে মানুষের জীবন আলো-অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

মানুষের জীবন স্থির বলে কিছু হয় না। জীবনের স্থির আলো বা স্থির অন্ধকার অর্থাৎ কোনো মানুষের সমগ্র জীবন সুখে বা সমগ্র জীবন দুঃখে অতিবাহিত হবে এটা বলা যায় না। সমগ্র জীবন ভালো বা সমগ্র জীবন মন্দ এইরকম বাতাবরণ আমরা জীবনানন্দের কাব্যে বিশেষ দেখতে অভ্যস্ত নয়। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ সৃষ্টি করতে চায়। এক্ষেত্রে অন্ধকার অতিক্রম করে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। কিন্তু আলোকে পাবার জন্য অন্ধকারকে কিন্তু মানুষ বর্জন করতে পারেনা। বরং অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি মানুষকে সন্ধান করতে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই নক্ষত্রের মত ব্যক্তিসত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। অন্ধকার আকাশে যেমন নক্ষত্রকে উজ্জ্বল মনে হয় ঠিক তেমনি আমাদের সমাজে ব্যক্তিসত্তাহীন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববান জীবনগুলোকে খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

জীবনানন্দের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে আজ অন্ধকার আছে বলেই আলোর এত কদর। চড়াই উৎরাই আছে বলেই সমতলের এত মর্যাদা। পৃথিবীকে এবং জীবনধারাকে

সঠিকভাবে বুঝবার জন্য আলো-অন্ধকারের পটভূমি জীবনানন্দ দাশ রচনা করেছেন তা বলা বাহুল্য। তাঁর বেশির ভাগ কবিতার মধ্যে ধরা পড়েছে আলো অন্ধকারের লীলাখেলা।

মানুষের আয়ু শেষ হয়, হেঁটেচলা পথের রেখাও একদিন মিলিয়ে যায়, বালিতে লেখা নামও একদিন জলে ধূয়ে যায়। কিন্তু স্বপ্নের জগৎ চিরদিন আলোকিত করে যায়। জীবনযাপনের নানারকম ঘাতপ্রতিঘাত, অনিশ্চয়তা, তৎকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, নানারকম প্রশ্ন, নানা চিন্তা কবিকে চিন্তিত করে তুলেছে। তাই জীবনানন্দের কবিতায় বারবার আলো অন্ধকারের আগমন লক্ষ করা যায়। ইংরেজ কবি ইয়েটস, টি. এস. এলিয়ট প্রমুখ কবিদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক চেতনার প্রকাশ তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে তা অন্য আধুনিক কবিদের মত নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অন্ধকারের মধ্যে যে আলো অবস্থিত বা রাত্রির পর যে সূর্যালোক আগত তার মধ্যে দিয়ে কবি নতুন দিনের সূচনা করতে পেরেছেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা 'বোধ'। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'বোধ' কবিতার মধ্যে দিয়ে আলো অন্ধকারের সংমিশ্রিত পটভূমি রচনা করেছেন। জীবনানন্দ মূলত 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থ থেকে আলো-অন্ধকারের মিলিত রূপকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করতে শুরু করেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'বোধ' কবিতার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিমানুষের আলো-অন্ধকারের সম্মিলিত জটিলতা। মানুষ ক্রমাগত এই জটিলতার মধ্যে ডুবে যায়। কবির ভাষায়—

"আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;"

[বোধ ঃ ধূসরপাণ্ডুলিপি]

কবি এখানে উপলব্ধি করেছেন যে পরিচিত জায়গাটা যেন অপরিচিত মনে হচ্ছে। ফলে কবির মধ্যে একটি শূন্যতা কাজ করছে। চেনা জায়গা যদি অচেনা লাগে তাহলে অনেক সময় মাথাটা শূন্য হয়ে যায়। চারদিক অন্ধকার দেখায়। তাই কবির ভেতরও এক শূন্যতা কাজ করছে। 'বোধ' কবিতায় প্রথমেই আমরা কবির এক ভারাক্রান্ত ছবি দেখতে পেলাম।

"স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;"

[বোধ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি]

আবারও কবি বলেছেন কোনো আশা নয়, শান্তি নয়, প্রেম নয় মনের মধ্যে আশার আলো হিসাবে বোধ কাজ করে। কবি ভাবছেন জীবন মনে হয় একেবারে স্বপ্নহীন, নিরস চারিদিক শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। আবার এই অন্ধকারের মধ্যে একটি আশার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। এখানে আলো-অন্ধকার মূলত আছে আদর্শ সংসারী মানুষজনকে

কেন্দ্র করে। একজন চাষি মহাজনের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার নেয় এবং ফসল উৎপাদন করে। ঐ চাষি কিন্তু অনেক আশা নিয়ে ফসল ফলায়। ফসল ভালো হলে তার জীবন সুখময় হয়ে ওঠে আর ফসল না হলে জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে। ফলে মানুষের জীবন হল আলো-অন্ধকার স্বরূপ। তিনি একই কথা বারবার পুরাবৃত্তি করেছেন—

"স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে!" [বোধ ঃ ধূসরপাণ্ডুলিপি]

জীবনানন্দ দাশ এখানে সহজ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের গণ্ডি থেকে বের হয়ে অন্য জগতের আস্তানায় অবস্থিত হতে চেয়েছেন। কবি হয়ে যান অন্য জগতের মানুষ। অন্য জগতের জীব হয়ে কবি কিন্তু কোন কিছুর স্বাদ পান না। কবি অনেক আলোর আশা নিয়ে প্রাত্যহিক জীবন থেকে বেরিয়ে অন্য জগতে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু সেখানেও কবির মন টিকছে না। সবকিছু অন্ধকার মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আগের অবস্থায় যেন ভালো ছিলাম। আমরা সবসময় আলোর দিকে অগ্রসর হই। কিন্তু আলো ঠিক কোথায় তা সন্ধান করা খুব কঠিন। আলোর জগতে এসের কবিও কাছে এই সমস্ত বিশ্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই আলো আবার কবির মানবিক সত্তাকে ডুবিয়ে দেয়। তাই কবি বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন—

"স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে!" [বোধ ঃ ধূসরপাণ্ডুলিপি]

কবি বোধকে নিজের আদর্শ ভেবে চলার জন্য আজ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। কবি নিজেকে কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চাইছেন, কিন্তু 'বোধ' নামক সত্তাটি কবিকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। কবির ভাষাতে বলা যায়—

"সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?"[বোধ ঃ ধূসরপাণ্ডুলিপি]

কবি এখানে নিজেকে একা বোধ করেছেন। আর কবির এই একা হওয়ার কারণ হিসাবে নিজেকেই দোষারোপ করেছেন। মানুষ মূলত একা হয় বা একাকী অনুভব করে তিনটি দিক থেকে। প্রথমত নির্জনতার মাঝে; যখন আমি একা উপস্থিত আমার আশে পাশে আর কেউ নেই তখন একা মনে হয়। আবার জনতার মাঝেও একা হতে হয় যখন আশোপাশের মানুষগুলো সব অপরিচিত মনে হয়। রক্তের সম্পর্ক বলে একটা কথা আছে। মানুষ যখন সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে তখন একা অনুভব করে। আবার আরেক ভাবেও মানুষ একা হয়। আমার সঙ্গে সবাই আছে কিন্তু হয়তোবা আমার দোষে আমি যাকে কাছে চাইছি সে আমার সঙ্গে নেই। তখন একাঅনুভূত হয়। কবি এখানে মুদ্রাদোষ বলতে নিজের কিছু দোষকেই তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 'আমি' সত্তা বলে

একটা সত্তা কাজ করে। এই 'আমি' সত্তা অনেক সময় আলোর দিশারি হলেও একা করে তোলে জীবনকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

কবি একা হয়ে পৃথিবীতে যেন গোলকধাঁধার মধ্যে উপস্থিত হন। সব দিক হারিয়ে যেন দিশাহারা হয়ে পড়েন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেন কিছুতেই মিলতে পারেন না। তাই কবিকে সব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে অন্য জগতে। কবির ভাষায়—

"এই সব সাধ
জানিয়াছি একদিন—অবাধ—অগাধ;
চলে গেছি ইহাদের ছেড়ে—"[বোধ ঃ ধূসরপাণ্ডুলিপি]

কবির কাছে গ্রাম্য আবহাওয়া, গ্রাম্য পরিবেশ খুব পরিচিত। তবুও যেন কোথাও একটু খাপছাড়া মনে হয় পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে। সব কিছুই আমার অথচ তবুও আপন করতে যেন ভয় হয়। কত সাধ্যের মাটির গন্ধ যেন ফিকে মন হয়। খুব সহজে বলেছি একদিন সবকিছু আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা আমার। তবুও আজ সবকিছু বিষন্ন হয়ে যায়। মনে হচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতি কবিকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। সব থেকেও মনে হয় আজ কিছু নেই। এই সব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

কবি নারী হৃদয়ের প্রতি অনুরাগ বিরাগ নিয়ে কাব্য রচনা করেননি। তিনি নারী জাতিকে তিনদিক থেকে উপস্থাপিত করেছেন। অভিমানী একাকিত্বের প্রধান অন্যতম কারণ হল ভালবাসাহীনতা বা প্রেমহীনতা। প্রেমের প্রতারণাতেও অনেকসময় একাকীত্ব অনুভব হয়। সবকিছু আছে অথচ কাছের মানুষটি আজ কাছে নেই বলে আজ চরম অসহায়। কবির মনে হয়েছে প্রেমহীনতা থেকেও সবচেয়ে মারাত্মক অণুভূতি হল অবহেলা বা উপেক্ষা। অন্যভাবে বলতে গেলে উপেক্ষার চেয়ে বড় শাস্তি আর মনে হয় নেই। কবির ভাষাতে— "ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;" [বোধ ঃ ধূসরপাণ্ডুলিপি]

এ বড় অদ্ভুত পৃথিবী। ভালোবাসার পরিবর্তে প্রতারণা, কাছে টানার পরিবর্তে অবহেলা, সম্মান করার পরিবর্তে ঘৃণা করা। এ গুলিই হল পৃথিবীর স্থায়ী বিষয়। কবি এখানে তিনদিক থেকে মনুষ্যজাতিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। অন্যকবিদের মত নারীজাতিকে একদিক থেকে অনুভব করেননি। প্রথমে ভালোবেসে দেখেছেন, তারপর অবহেলা করে দেখেছেন, তারপর ঘৃণা করে দেখেছেন। এখানে 'ভালোবাসা' -'অবহেলা' -'ঘৃণা' এই তিনটি শব্দই যেন উপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন। একটা জাতি কেমন তা এই তিনটি পথ অবলম্বন করে জানা যায়। ভালোবাসা দিয়ে যেমন অনেক কিছু অর্জন করা যায় তেমনি অবহেলা করেও অনেকদিক থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়। কবি নারীজাতিকে আলো এবং অন্ধকার দুইদিক থেকেই বিচার করে উপস্থাপন করেছেন। ভালোবেসে

আলোর মত করে বিচার করেছেন আবার অবহেলা করে অন্ধকারের কালোদিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

আলো-অন্ধকারের সংমিশ্রিত পটভূমি জীবনানন্দ রচনা করেছেন 'বোধ' আক্রান্ত ব্যক্তি মানুষের মধ্যে দিয়ে। এই সূত্র ধরে আরো একটি কবিতার কথা না বলে পারা যায় না। 'মহাপৃথিবী' কাব্য গ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির মধ্যেও সেই একই রকম আলো-অন্ধকারের ঘোরাফেরা দেখা যায়। জীবনানন্দ দাশ এই কবিতার মধ্যে দিয়ে এক নাটকীয় পরিবেশ উপস্থিত করেছেন আলো-অন্ধকারের। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির দুটি প্রান্ত বা দুটি দিক লক্ষ করা যায়। একদিকে আলো এবং অন্যদিকে অন্ধকার। 'বোধ' নির্ভর একান্ত মানুষটির মৃত্যু প্রবণ মানসিকতাকে কবিতার প্রধান বিষয় করে তুলে কবি এই কবিতাটি রচনা করেছেন। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক নাটকীয় উপস্থাপন। কবিতার প্রথমেই দেখা গেছে ফাল্গুনের এই অন্ধকার রাত্রিতে একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। বলা হয়েছে তার মরিবার সাধ হয়েছে। অর্থাৎ আত্মহত্যা করাই তার আসল উদ্দেশ্য। মানুষটির মৃত্যু বাসনার ইচ্ছা খুব সহজেই নির্দেশ করা হয়েছে—

"কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ;"
[আট বছর আগের একদিন ঃ মহাপৃথিবী]

জীবনানন্দ আমাদের জানিয়েছেন যে এ পৃথিবীতে মানুষটির সুখ ছিল। তার সংসার জীবনে বধূ ও শিশুকে নিয়ে গড়ে তোলা জীবন সুখময় ছিল। সংসার জীবন চালানোর জন্য সামর্থ্যও তার ছিল, তবুও সে আত্মহত্যা করল। এই গতিময় জীবন থেকে সরে গেলেন। কেন যুবকটি আত্মহত্যা করল? আমাদের মনে প্রশ্ন চিহ্ন আসে। মনোজগতের স্তরে যে আলো অন্ধকার অবিরাম চলছে। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় যে মানুষের জীবন হল আলো অন্ধকারময়। যুবকটি হয়তো এই নূতন জীবনের আনন্দে আত্মমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। তবু একটি প্রশ্ন বারবার জেগে ওঠে যে জীবনের চিরাচরিত শাশ্বত সুখ প্রেমকে অগ্রাহ্য করে নিজের অপমৃত্যু নিজে কেন ঘটালেন? যুবকটি জীবনের অন্তিম পরিণতি ঘটিয়ে অশান্ত ও অসুখ থেকে নিস্তার পাবার জন্য চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন। কবির ভাষায়—

'বধূ শুয়েছিল পাশে— শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?"
[আট বছর আগের একদিন ঃ মহাপৃথিবী]

কবিও যেন আত্মহননের মধ্যে দিয়ে চির সুখ লাভ করতে চেয়েছেন। মানুষটি মনে করেছে যে এই আত্মহননের মধ্যে দিয়ে কোথাও কোন সতর্কতা আছে। এখানে আত্মহননকে আলোর দিশারি স্বরূপ দেখানো হয়েছে। এবং বেঁচে থাকাকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

'বোধ' কবিতায় কবি যে ক্লান্তি অনুভব করেছেন, সেই ক্লান্তিবোধ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় ধরা পড়েছে। যুবকটির সংসার জীবন সুখময় হওয়া সত্তেও অসহ্য যন্ত্রণার জন্য যুবকটি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। 'আঁধার' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যর্থতা ও হতাশা। মানুষ জীবনের অস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই দ্বিখণ্ডিত জীবনযাপন করে। উটের গ্রীবার মত কোনো এক নিস্তব্ধতা বলার মধ্যে কবি এক অচেনা অন্ধকার এঁকেছেন, যেখানে অন্ধকার উটের গ্রীবার মতো উঁচিয়ে আসে নির্জনতা নিয়ে কবির ভাষায়— "এই কথা বলেছিলো তারে

চাঁদ ডুবে গেল চলে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।"

[আট বছর আগের একদিন ঃ মহাপৃথিবী]

নিস্তব্ধতা স্তরই শেষপর্যন্ত মৃত্যুর শান্ত স্তব্ধতায় পর্যবসিত হয়। চাঁদ ডুবে যাওয়ার মধ্যে যুবকের ব্যর্থতার ছবি আমরা পাই। পৃথিবীর আর সব অন্য মানুষের মত নিশ্চিন্তে কেবল সংসার যাপন করা তার কাম্য নয়। আলো অন্ধকার থেকে এবং ব্যক্তিসত্তার গহন গভীর অবচেতন স্তরীভূত হয়েছে। আলো-অন্ধকারের সংমিশ্রণে এভাবেই জীবনানন্দ চমৎকার ভাবে জীবন ও মৃত্যুর নাটকীয় আত্ম-দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা
২। আমার জীবনানন্দ ঃ হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শীতল চৌধুরী
৪। বাংলা সাহিত্যপরিচয় ঃ ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়
৫। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ঃ ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য ঃ জহর সেন মজুমদার।

■ ড. হাবিব সরকার—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

বল্লরী রায়চৌধুরী

'আমি' 'তুমি' ও 'সে' ঃ জীবনানন্দ দাশের কবিতা

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতায় 'সে' থেকে সাবলীল উঠে এসেছে 'তুমি' এবং অব্যবহিত এক স্তবক পরে আমরা কবির কাছ থেকে আরো এক অমোঘ অবিকল্প সর্বনাম পেয়ে যাই—'আমাদের'। নাগকেশরের বীজ, পদ্মরাগ মণির তীক্ষ্ণ কোনো সুদূরস্পর্শী আলোর জোনাকি তাঁর রাত্রিকালীন ভাবনাসূত্র ঘিরে রেখেছে। বিভিন্ন বর্ণ, বর্ণের বিচিত্র ফিরোজাতত্ত্ব কবিতার অবয়বকে কিছুটা অধিবাস্তব একটা মায়ায় স্থিত করেছে, শান দিয়েছে যুগল পৃথিবীর একটি পূর্ণ খামার। নদী, নদীর গায়ে গাছেদের স্বরচিত ছায়া, রাত্রির ভাস্বর রূপ আরো জুড়ে বসেছে কথকের ওপর। বলা যেতে পারে এই কবিতাগুলো লেখার সময়ে (১৩৩২-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), দ্বিতীয় কবিতার বইয়ের অন্তরীণ সত্তায়, কবির ওপর যেন কারো সতেজ উপস্থিতি তীব্র থেকে তীব্রতর প্রকরণে পৌঁছবার চেষ্টা করেছে। মূলত প্রকরণক্ষমতার সবচেয়ে বড় অগ্নিপরীক্ষা কবির এখানেই। ভূতগ্রস্ত রাত্রির নিদাঘ খুলে তিনি লিপ্ত পারস্পরিকতার চিহ্নকে দোহন করে নিয়েছেন তাঁর মহাজাগতিক দ্যুলোকের কল্পনায়। এক অজ্ঞাত আকাশ, একের-পর-এক শব্দ বনাম নৈঃশব্দ্য, দিন ও রাত্রি, আলো ও অন্ধকারের অসম্পূর্ণ বাহুর যেন বহুযুগ পরে, এইখানে দেখা হয়েছে ঃ

চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর—
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান![১]

'কবিতার কথা' বইটির 'দেশ কাল ও কবিতা' রচনাটিতে জীবনানন্দ বলেছেন—"কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে, না পড়ে অশিক্ষিত পটুত্ব ঠিক জিনিষ নয়। জ্ঞানেরই দরকার বেশি, সেই জন্যেই অধ্যয়নের দরকার। অধীত জিনিষ থেকে প্রজ্ঞা লাভ করবে কি সমালোচক না পাণ্ডিত্য? প্রথমটির ভরসাই অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য দিয়ে কবিতায় সমালোচনা বেশি চলে না।" (পৃঃ ৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, সিগনেট প্রেস ১৩৯৭) অন্যদিকে জীবনানন্দের সমানবয়সী আর্জেনটিনিয় কবি লুইস বোর্গেস বলেছিলেন অসওয়ালজে ফেরারিকে যে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে 'Intellectual Poet'[২] হিসেবে যা তাঁর মনে হয়েছে ভুয়ো। অস্বীকার করে বলেন যে, এভাবেই ব্রাউনিং-কেও শুনতে হয় 'too decorative a poet', যা তাঁকে দুর্বোধ্য করে দেয়। 'Reason and intuition' কে যুগপৎ ব্যবহারের সামর্থ্য ছিল জীবনানন্দের। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রতিটা কবিতা—বাছাই করা বিন্দু (বিন্দু সময়-ঘটিত দিনলিপি) কিন্তু মজা হল এইখানে যে, প্রত্যেকটা অভিজ্ঞতা শব্দকে নিঃশব্দে বীজের ভেতরে দেখতে পায়; প্রকৃতির সঙ্গে এমনই সংলগ্নতা আছে। মানব-প্রকৃতি ও তাই নিসর্গের প্রতিটা পরিবর্তনের সঙ্গে মিশে থাকে। 'Reason' বা

কার্যকারণের যুক্তি তাই এই পর্বে সীমা ভেঙেছে, তৈরি হয়েছে কথকের অন্য বয়ান; চিঠি বা দিনলিপির ভাষ্যের মতো তাঁর মুখে বলে-যাওয়া ধারাবিবরণী রোলাঁ বাক্তের চিহ্নবিজ্ঞানকে অস্বীকার করে ক্রমিক সময়কে ফেলে চলে গেছে। অন্যদিকে 'Intuition' এর সাহায্যে-ই কবি নতুন এক কবিতার মিথ্ স্থাপন করেন। অন্ধকার ও আলো—বলা যেতে পারে, রূপকথার মতো অপ্রাসঙ্গিক অযাচিত এখানে। জীবনানন্দীয় 'অন্ধকার' নিয়ে, বহুচর্চা আমাদের হয়েছে। কিন্তু 'আলো'; 'বিদ্যুতের মতো তুমি সুন্দর-ভীষণ! ('জীবন'/ ধূসর পাণ্ডুলিপি) অথবা "আরও এক আলো আছে ঃ দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;/ চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির;" ('মৃত্যুর আগে'/ ধূসর পাণ্ডুলিপি)। প্রথম উদাহরণটি পড়েই স্বয়ম্ভর অন্য একটি কাব্যপ্রতিমা তৈরি হয় আমাদের মনে।

'Who, if I cried out, would hear me among the angel's hierarchies? and even if one of them pressed me suddenly against his heart! I would be consumed in that overwhelming existence. For beauty is nothing but the beginning of terror, which we still are just able to endure.....

Every angel is terrifying.'[৩] [Rainer Maria Rilke/ Duino Elegies 1923]

দ্বিতীয় প্রকল্প হল অন্য এক রোশনাই-এর কথা। অপ্রকাশিত কবিতার মধ্যে এই সময়ে লেখা — 'যেন এক দেশলাই'। 'তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে/তুমিও ফেরনি পিছে—তুমিও ডাকনি আর,—আমারও নিবিড় হল মন/ যেন এক দেশলাই জ্বলে গেলে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে/ আমার এ-জীবনের বন্দরের; তারপর শান্তি শুধু বেগুনি সাগর/ মেঘের সোনালি চুল— আকাশ উঠেছে ভ'রে হেলিওট্রোপের মতো রূপে'—এই বলে দ্বিতীয় স্তবক শেষ হয় যায়। ('যেন এক দেশলাই'/ ধূসর পাণ্ডুলিপি) এ কবিতায় আলো— আলোহীনতারই একান্ত দ্যোতক। কবি জানেন, 'সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে' বলবার অব্যবহিত পরেই 'অন্ধকারে' বসানো মাত্র একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে। 'গেলাম চলে চুপে'—বলে ছত্র বদল হল, পরের ছত্র শুরু হচ্ছে—'তুমিও ফেরনি পিছে—তুমিও ডাকনি আর;—' ব্যস। দু'দুটো ড্যাশ চিহ্ন বসিয়ে কবি, ডাবুকের মনস্কতাকে আলো ফেলে আবছা চিহ্নিত করলেন। ড্যাশ দুটো এদিক দিয়ে মোক্ষম একটা সেতু বেঁধে দিল—আসলে এক জীবন থেকে প্রসারিত অন্য জীবনের সেতু তৈরি হল, তাই 'গেলাম' এর পরে এল 'ফেরনি পিছে','ডাকনি আর' এবং পরিশেষে লাইনটির ভাবগত দাম্পত্য বা সম্পর্ক নজিরহীন একাকিত্বকে বহন করে এল পরের স্তবকে। এখানে নিবিড়তায় ব্যথাতুর আলোর পুড়ে

যাওয়া। 'যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে— জ্বলবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে'—[৪] দেশলাই মরে যাচ্ছে জাহাজের ভাঙা শরীরে। মনে পড়বে 'হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা' এবং 'সুচেতনা' কবিতার সেই 'অগণন মানুষের শব' জাহাজ ভর্তি হয়ে আসছে বন্দরে। আসলে 'হালভাঙা জাহাজ', কবির স্মৃতিলোকে যেন ঘুমন্তজন্মের বহু মৃত্যু, বহু উপকথা। একটা বিশাল মহাদেশের চতুর্দিক যে জলাধারে ঘেরা আছে— তা হল অনেক জন্মের না -পাওয়া কুণ্ডরাশি। 'তারপর শান্তি শুধু বেগুনি সাগর'—'মেঘের সোনালি চুল'— প্রথম 'ড্যাশ' আমি বসিয়েছি, কবি নিজে 'সাগর' এর পরেই লাইন বদলেছেন, মাপে ছোট কিন্তু হসন্ত শব্দের আধিক্য বুঝিয়ে দেয় 'বেগুণি' এক ভিন্ন গোলার্ধের অতলান্তিক মহাকাশের জল বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ চিরবিদায়ে শান্তি। তাই পরের লাইনেই 'মেঘের সোনালি চুল', আবার দিচ্ছেন 'ড্যাশ'—'আকাশ উঠেছে 'হেলিও ট্রোপের মতো রূপে' প্রত্যক্ষ বেগুনি ফুলে ভরা একটা স্বর্গীয় গাছ, তার রূপে কবির জীবন বুঝি ভরে উঠেছে। পরের স্তবকে আরো মারাত্মক কথা বললেন। মাটি নেই অথচ গাছ আছে, ফুলে ভরা, তার রং প্রচণ্ড বেগনি, মেঘের চুল সোনালি। স্বর্গ নির্মিত হল এভাবে। তার পরেই 'আমার জীবন এই' 'তোমারো জীবন্ তাই', বলে "আমি", "তুমি" পৃথক করে দেওয়া। কোনদিন মিলবে না। 'আমি' আর 'তুমি'র মধ্যে অতলস্পর্শ দূরত্ব। বিচ্ছেদের চেয়ে 'দূরত্ব' এখানে বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ পার্থিব সব রং বাদ দিয়ে কবি বললেন বেগুনি সাগর। আর কখনো হয়তো এমন প্রয়োগ করেননি। যে চলে গিয়েছে সে পিছনে ফিরে তাকায়নি, আর ডাকেনি—তাই কবিও তাকে যেন খোঁজেননি।

অন্ধকারে না খোঁজার মানে যে অনেক যুগের সন্ধান এটা জীবনানন্দের পাঠকমাত্রই জানেন। শব্দের এমনই মেজাজ যে, 'অন্ধকারে না খোঁজা'টা বলামাত্র কেমন সমস্ত সিঁড়িগুলোয় ঈষৎ আলো এসে পড়ে। গোটা কবিতাটা তিন ছত্রে স্তবক, পাঁচটি স্তবকে সম্পূর্ণ হয়েছে—কিন্তু শেষ স্তবকটি দু'ছত্রের। বিগত জন্মের শিখা জ্বেলে দেশলাই পুড়ে যায়, তবু সে তো জ্বলে যাবেই। ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পর্বটিকে কবির আর্টিস্ট পর্ব বলা উচিত কারণ সমগ্র সময়কাল জুড়ে কবি রিয়ালিটির নতুন সংজ্ঞা আবিষ্কার করেছেন দৃশ্য বদলের নিজস্ব তাৎপর্যে। কবির মননে তাই ভৌগোলিক ক্রমপর্যায়ের কোনো নিয়ন্ত্রণরেখা দেখা যায় না। তুলনা করতে পারি Tess lewis অনূদিত Anselm kiefer এর Notebooks (volume I : 1998-1999) রচনাসমূহের বিশেষ অংশকে। ১৯৯৮-এর শনিবারে লেখক যখন ডায়েরি লিখছেন, মিথ্কে নিজের মধ্যে ভেঙে আবার গড়ে নিচ্ছেন সতত— 'when the entire future is already the past, there is no defeat, even a lost election is history"– অন্তঃস্থ কথক সত্তাটিকেও হার মানতে হয়নি। 'বৈতরণী', 'বুনো হাঁস', '১৩৩৩' কবিতাগুলি দীর্ঘমেয়াদী খণ্ডিত সত্তার অনুভব। কথক তাঁর আগামীকে, তাঁর অমোঘ ভবিষ্যৎকে জানেন, কিন্তু

প্রতিরোধের উপায় নেই। এমনকি বর্তমানের লাঞ্ছিত সংবেদনের কোনো আস্থা কবির কাছে নেই। তিনি বোঝেন—'আমারে চাও না তুমি আজ আর', '—তোমার রক্তের ভালবাসা দিয়েছ যাহারে!' তার পরেই নিস্কৃতির একমাত্র উপায় হল—খোলা পথ 'বো' হমিয় এক অনিশ্চয় ক্ষণিকতা—যা কবি তৈরি করেন চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিকে মাথায় রেখে। 'জানি আমি—আমি যাব চলে/তোমার অনেক আগে;/ তারপর,—সমুদ্র গাহিবে গান বহুদিন—/আকাশে আকাশে যাবে জ্বলে/নক্ষত্র অনেক রাত আরো!' (১৩৩৩/ধূসর পাণ্ডুলিপি) চাক্ষুষ ভ্রান্তি ও ইচ্ছাকৃত নিজের মধ্যে আরেকজনকে প্রত্যক্ষ করা, অর্থাৎ একজন ভালবাসে, ব্যর্থ হয়, হারিয়ে যেতে চায়— আরেকজন দ্রোহহীন সহ্য করার সাহস দেখায়। তুলনীয়, হেনরি বের্গসঁ যেমন বলেছিলেন ঃ "What is said and done, what one says and does oneself seem 'inevitable'. One is a spectator to one's own impulses, thoughts and actions. Things hapen as though one were split, without one actually being split... the subject often finds himself in the peculiar state of mind of a person who believes he knows what is going to happen while feeling incapable of predicting it. [The Memory of the present and false Recognition/ Henri Bergson (1908) P. 921]ঙ

নিজের দ্বিতীয় প্রতিরূপ গড়ে তোলার নিহিত মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশের সবচেয়ে বড় উদাহরণ পাই 'মহাপৃথিবী'র 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। 'শোনা গেল' বলে খবরটুকু দেবার পরবর্তী লাইনে 'লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে'—এরকম একটা দুর্দান্ত নোটিস টাঙিয়ে দিলেন কবি। 'মরিবার হল তার সাধ' অথচ 'প্রেম ছিল, আশা ছিল'— বলেই বাংলা কবিতার দিগন্ত খুলে দিলেন। সমস্ত ছিল, কেবল নিজেরই ভেতর 'কোন্ ভূত' সে দেখেছিল বলে এমনভাবে চলে যেতে ইচ্ছে হল তার! আমাদের মনে করতে অসুবিধে হয় না ফ্রেডরিশ নিটশে যে, প্রেমে—ব্যর্থ ধূসরতার কথা বলেন, দেরিদা ও লাকাঁর তাত্ত্বিক মূল্যায়নকে মেনে 'The Real and its Double' বইটিতে দার্শনিক ক্লিমেন্ট রসেট বলেছেন— "However, any duplication presupposes an original and a copy, and the question will be which of the two–the real event or the 'other event'–is the model and which its double. We then discover that the 'other event' isn't really the double of the real event. Infact, the opposite is true..." [The oracular Illusion\Clement Rosett, Trn. Chris Turner, P 19] মৃত্যুর কারণ, মৃত্যুর প্ররোচনা বিশ্লেষণ করার সূত্রে কথক ভুলে যাচ্ছেন যে আর কেউ আত্মঘাতী হয়েছে, তিনি তো নন। চাঁদ ডুবে গেলে যে অদ্ভুত অন্ধকার আসে, তখন উটের গ্রীবার

মতো নিস্তব্ধতাকে তার অসহনীয়তা শুনিয়ে গিয়েছিল। 'তবুও তো পেঁচা জাগে' —আরেকটি অনুক্ত সকালের উদ্দীপনায় কথক এখানে উত্তমপুরুষে তার উপলব্ধি, বিন্যস্ত করেছে। সর্বনামসূচক শব্দ সরে গিয়ে 'টের পাই' 'দেখিয়াছি' 'জানি—তবু জানি' এই সব ক্রিয়াপদ এল। এখানে আমরা বুঝতে পারি, যে—'চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে' 'আর অন্যজন, যে তার মননের মধু খুঁজে পেয়েও চলে যেতে চায়—এই দুই সত্তা একত্রে প্রাণ পেয়েছে। একটি আত্মহত্যা আর 'আমাদের রক্তের ভেতরে ডুবে-থাকা অনন্তের পিপাসা, বিপন্নতা, গ্লানি প্রতিরাত্রে ভূতগ্রস্ত করে তোলে, আত্মহননের ঈপ্সা আমাদের আছে—এই কথাটি তৈরি হচ্ছে। গোটা বিন্যাসের অনিয়ন্ত্রিত অবিন্যাস বা **irrationality** এই বিপন্নতার কথা তুলে ধরে। নিজেকে জানার জন্য নিজেকে শেষ করে দেওয়া—এইখানে তৈরি হচ্ছে ব্যক্তির দ্বিত্ব— 'The real and its Double' এর ধারণা। জৈবতার অন্য পারে যে হাজার বছর ধরে পথ চলেছে বহু ইতিহাসবৃত্ত ঘুরে ঘুরে, আর অন্য আরেকজন যে 'নারী' 'শিশু' এই পারিবারিক কাঠামো নিয়ে আটকে রইল, সে—এরা কেউ পরিষ্কার একে অপরকে বুঝতে পারে না। মীমাংসা তবু থাকছে এভাবে, পেঁচা-চাঁদ-শকুনের সঙ্গে চলমান বিরাট নিসর্গের অদৃশ্যগতির সঙ্গে নিজেকে লীন করে দেওয়ার মধ্যে। অর্থাৎ 'আমি'ও তাদেরই কেউ। 'আমিষাশী তরবার' অংশে জীবনানন্দ বলেছেন—"মাথার উপর দিয়ে অনেক সন্ধ্যার কাক/প্রথম ইশারা নিয়ে উড়ে যায় আবির্ভূত গম্বুজের দিকে। /সেই পথে আমাদের যাত্রা নেই, হে সন্তান।" তারপর থেমে লিখলেন শেষ তিন অমীমাংসিত বাক্য যা আমাদের রুদ্ধবাক্ দাঁড় করিয়ে দেয় আধুনিকতার অন্য এক শূন্যতায় ঃ

'প্রতিভার দীর্ঘ বাহু বাড়ায়ে দিয়েছে মেঠো হাঁসের ডানায়, শস্যহীন খেতে, গফুরের শীর্ণ গোলাঘরে, শ্মশানে, কবরে, আমাদের সবের হৃদয়ে। এই প্রত্যয়ের থেকে গভীর অগ্নির জন্ম হয়।' ['অগ্নি'/মহাপৃথিবী, পৃ ৬২]

আমরা আমাদের বক্তব্য শুরু করেছিলাম কবিসত্তার 'আমি' ও 'তুমি'র বিস্তার প্রকল্পে। এই 'তুমি'র মধ্যে কিছুটা 'আমি' আর কিছুটা রিয়ালিটির না-পাওয়া মিশে থেকেছে। 'বুনো হাঁস' 'শ্রাবণরাত' 'মনোবীজ' '১৩৩৬-৩৮ স্মরণে' আরো অনেক কবিতার মতোই সুররিয়াল একটি রিয়ালিটি নির্মাণ করেছে। তার ভিত্তি গভীর রূপকথার এক আয়তক্ষেত্র, যেখানে সমাজ ও মানুষের বিবিক্ষা গতানুগতিক সময়প্রবাহের নাগালের বাইরে।" ছেঁড়া করবীর মতো মেঘের আলোকে/চেয়ে দেখি রূপসী কে পড়ে আছে ঘাটের পরে।/মায়াবীর ঘরে ঘুমন্ত কন্যার কথা শুনেছি অনেক আমি.../ এ ঘুমোনো মেয়ে/ পৃথিবীর।— মানুষের দেশের মতন/...-কাল সাঁঝরাতে/ আবার তোমার সাথে/দেখা হবে?—আসিবে তো?—তুমি আসিবে তো!/ দেখা যদি পেতো!/নিকটে বসায়ে/ কালো খোঁপা ফেলিত খসায়ে—/"অর্থাৎ যা ভৌগোলিক দ্রাঘিমায় প্রাপ্য নয়,

তাও 'আমি'র ভেতরে সমাহিত করছেন কবি। সে-সব বিশ্বের জঠরে একান্ত বাস করার মধ্যেই এক-একটি কবিতার সৃজন ঘটেছে। অর্থাৎ নিজেকে অন্যের মধ্যে প্রোথিত করা ও অন্য জগতের চরিত্র উদ্ভাবনকে নিজের মধ্যে গ্রস্তও করে তোলার দ্বিবিধ এক চলমান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে কবির অন্তশ্চক্রের নানা পাকদণ্ডীতে। এভাবেই তিনি জন্মান্তরের কথা ভেবেছেন, পুনর্জন্মের অপূর্ণ সাধ নিয়ে বারবার চক্রবৎ ঘুরে আসার কথা বলেছেন তাঁর কবিতায়। তাই বৃহৎ কালের দিগন্তের সামনে এসে মহাজাগতিক বিশ্বের কোটি নক্ষত্রের নিজস্ব নীরব প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই আদানপ্রদানের অন্তহীন ভাষ্য গড়ে উঠেছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'মহাপৃথিবী' পর্যন্ত। স্বপ্ন, অলীকস্বপ্ন, চাওয়া পাওয়ার স্বপ্ন দিয়ে তৈরি করেছেন কবির নিজের চিন্তাসূত্র।

তথ্যসূত্র ঃ

১। 'জীবন'/ ধূসর পাণ্ডুলিপি, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬ নিউ স্ক্রিপ্ট, পৃঃ ৬১

২। কবিতার কথা/পৃঃ ৭৩, ষষ্ঠ সং, সিগনেট প্রেস ১৩৯৭

৩। Conversations 2, Osvaldo Ferrari with Jorge Luis borges, Seagull 2015, Trns. Tom Boll.

৪। Rainer Maria Rilke\Duino Elegies, 1923, Pg. 157, Ed. 2 Trns. Robert Hass, The second Elegy.

৫। ধূসর পাণ্ডুলপি ঃ অপ্রকাশিত কবিতা (১৯৬৩ সংযোজিত) পৃঃ ১০৮, তৃতীয় সং, নিউ স্ক্রিপ্ট।

৬। Anselm Kieffer, Notebooks Vol I, 1998-1999, Trns. Tess Lewis.

৭। The Real and its 'Double'/Clement Rosset, P 19, Trns. Chris Turner.

৮। আমিষাশী তরবার/ জীবনানন্দ দাশ ঃ 'অগ্নি' পৃঃ ৬২, নিউ স্ক্রিপ্ট্।

■ ড. বল্লরী রায়চৌধুরী—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

মদনচন্দ্র করণ

কবিবর জীবনানন্দ দাশ ঃ বাংলা আধুনিক কবিতার অপার বিস্ময়!

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
(ভাষা ও ছন্দ/রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যসূর্য যখন মধ্যগগনে, ঠিক তখন বাংলা কাব্যজগতে নবাগত কবি জ্যোতিষ্কদের বাক্ বিতণ্ডা চিন্তাভাবনা এবং রচনা কৌশলের দিকবদল নিয়ে যুক্তি তক্কো গবেষণা আর রীতি নীতির টানাপোড়েন চলছে। এই রবীন্দ্রোত্তর কবীশ কূলে জীবনানন্দ বাংলা আধুনিক কবিতার এক অপার বিস্ময়রূপে আবির্ভূত হন। নিঃসঙ্গ কবি বিশ্ববাংলার বিপুল জনসমষ্টির জন্য উদগ্রীব হয়েছেন আর মনের মণিকোঠায় অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য কবিতা লিখেছেন। মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জটিল মনের আধুনিক মানুষের কাছে নতুন ধারা আনতে প্রয়াসী হন। যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রেম-বসন্ত, সূর্যাস্ত, পাখির গান, গোলাপের মাধুর্য, সুখদুঃখ, হাসি-কান্না, ইত্যাদির রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ তাঁর কবিতায় বদলে যায় এক অভিনব শিল্প প্রাণের স্পর্শে। কাব্যসাহিত্যের বিশ্লেষকবৃন্দ জীবনানন্দকে তাই স্বতন্ত্র (রবীন্দ্রোত্তর) কাব্যধারার অভিনব কবিশিল্পী রূপে চিহ্নিত করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে কবির আবির্ভাব লগ্নটি একটু আলোচনা করা যেতে পারে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ 'সাঙ্অফারিং' এর দৌলতে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। বিশ্বকবির প্রতিভার অনুরাগীরা এবং কাব্য অনুরাগীরা একটি কবিগোষ্ঠী সৃষ্টি করেন। যা আমরা রবীন্দ্র অনুরাগী কবিসমাজ রূপে চিহ্নিত করতে পারি। এই দলে ছিলেন— অক্ষয় কুমার বড়াল, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রমুখ। অন্যদিকে রবীন্দ্র কাব্যদর্শ এবং সাহিত্যচিন্তাকে ত্যাগ করে ভিন্ন মতাদর্শে যাঁরা বিপরীত ধারার কাব্য সাহিত্য সৃষ্টিতে যত্নবান ছিলেন, কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসকারগণ তাঁদেরকে রবীন্দ্রবিরোধী কবি সমাজ নামে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্র বিরোধী কবিসমাজের ত্রয়ী দিকপাল কবি হলেন—

১। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ঃ বিদ্রোহ-ভাবনা

২। মোহিতলাল মজুমদার ঃ দেহবাদী ভাবনা

৩। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ নাস্তিক্যবাদ এবং নৈরাশ্য ভাবনা

এই ঘরানার কবি ছিলেন, দীনেশ দাশ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তথা অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রতিবাদ করে বলেন—

"সম্মুখে বসে থাকুন রবীন্দ্র ঠাকুর
আপন বক্ষ হতে জ্বালিব যে অনল
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে।"

দেহবাদে বিশ্বাসী মোহিত লাল তাঁর 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থের 'পান্থ' কবিতায় লেখেন—

'জননী ও বধূ পিপাসা মিটায়
দ্বিধা হারা রাধা ও ম্যাডোনা একাকার।"

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেন—

(ক) "চেরাপুঞ্জি হতে ধার দিতে পারো
একখানি মেঘ গোবি সাহারার বুকে।"
(খ) 'ধর্ম আর জাগিতে পারে না
বারোটার বেশি রাতি।'

—এই কবি কূলদ্বয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় দুইজন কবির আবির্ভাব হলো এঁরা হলেন নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দ।

'জীবনানন্দ (১৮৯৯-১৯৫৪ খৃঃ) লেখেন— ঝরাপালক (১৯২৭), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতাসেন (১৯৪২), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১), মহাপৃথিবী সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।

এখন আলোচনা প্রয়োজন করি কেন অপার বিস্ময়?

'কবি তাঁর মাতা কুসুমকুমারী দেবী, পিতা সত্যানন্দ বাবুর কাছে বাল্যেই অনুপ্রাণিত ছিলেন। বরিশাল জেলার গ্রামগঞ্জ, মাঠঘাট, আকাশ-বাতাস তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিলো ব্রাহ্ম সমাজের সাথে ওঠাবসা সক্রিয়তা থাকার জন্য মুক্ত মন উদারতা ও প্রগতিশীল ভাবনা তাঁর মধ্যে পরিবার সূত্রে ছিলো। ১৯১৫ সালে ব্রজমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৭ এ ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই-এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৯ এ স্নাতক এবং ১৯২১ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। পেশায় তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এহেন উচ্চ শিক্ষিত রোমান্টিক কবি যখন ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থ লিখলেন। কাব্যগ্রন্থটি সাড়া ফেলে দিলো সারা বাংলা জুড়ে। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি লিখলেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। ১৯৪২ সালে লেখা 'বনলতা সেন' তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর কালের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলো। প্রতিনিধিস্থানীয় শিরোনামাঙ্কিত 'বনলতা সেন' পাঠে সবাই যেন জীবনানন্দের অপার বিস্ময় লক্ষ্য করলেন। এই কাব্যগ্রন্থ ইম্প্রেশন, সুররিয়েলিজম,

রোমান্টিজিম্, মর্ডানাইজম, সিম্বলিজম' ইত্যাদি নানান ধরনের কাব্যগুণে সুশোভিত হলো। পাঠক অবাক বিস্ময়ে জীবনানন্দের 'গদ্য-লিরিক' কবিতা পড়তে পারেন।

১৯৫৪ তে 'রূপসী বাংলা' লেখা হয়েছিলো। কবি এখানে লেখেন—'বাংলার মুখ দেখিয়াছি আমি। তাই পৃথিবীর মুখ দেখিতে চাহিনা আর....."—এই স্বদেশ জন্মভূমি প্রীতি তাঁকে বিখ্যাত করেছিলো। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে এক ট্রাম দূর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৫৫-তে তিনি মরণোত্তর সাহিত্য অ্যাকাডেমি-লাভ করেন। স্বনামধন্য কবি বুদ্ধদেব বসু জীবনান্দকে নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু করেন। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি পত্রিকা' তাঁর সাহিত্যজীবনে আলোকপাত করা শুরু করে। 'প্রগতি' পত্রিকার পর বুদ্ধদেব বাবুর 'কবিতা' জীবনানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করতে নেমে পড়ে। ১৬৭ টি আর্টিকেল এর মধ্যে ১১১টি বুদ্ধদেব বাবু প্রচারের আলোতে আনেন।' (অনুবাদ, বেঙ্গল অথরম বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ্ ISSN-1563-8685]

বিশিষ্ট গুণীজন, চিদানন্দ দাশগুপ্ত লেখন—

Jibanananda Das : Selected Poems, Translated with an Introduction, (Penguin, 2006)

"...While he is best known for poetry that reveals a deep love of nature and rural landscapes, tradition and history. Jibananda is also strikingly urban an introspective. his work centing on themes of lonelyness, depresson and death. He was a master of world images and his unique poetic idiom vew on tradition but was startingly new"

এবার ফিরে যাই জীবনানন্দের কাব্য কবিতার সোনালী মধুরিমা চর্চায়। প্রথমেই আসি কবির 'স্টাইল' বা কাব্য শৈলী চর্চা। সেজন্য গ্রহণ করি একগুচ্ছ কবিতার লাইন' (চরণ) ঃ—

অ) সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে (বনলতা সেন)
আ) হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে শুধু শিশিরের জল (পেঁচা)
ই) আমার বুকের পরে সেই রাতে জমেছে সে শিশিরের জল (নির্জন স্বাক্ষর)
ঈ) চোখের উপর নীল মৃত্যু উজাগর
বাঁকা চাঁদ, শূন্যমাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ। (রূপসী বাংলা)

অ, আ, ই এবং ঈ সংখ্যক কবিতাংশে বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে 'শিশির' শব্দটি বার বার আসছে. শব্দের অর্থ আভিধানিক অর্থ + বাক্যের সজ্জা অনুসারি অর্থ—সেই মর্মে একটি শব্দকে জীবনানন্দ বারবার ব্যবহার করে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পৌঁছে দিয়েছেন।

আবার 'নক্ষত্র' শব্দটিও তিনি বার বার ব্যবহার করেছেন। যেমন—

(উ) সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

বিকেলের নক্ষত্রের কাছে। (সুচেতনা)

(ঊ) হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হয়ে গেছে কবে তার,
নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে
ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর। (জার্নাল ১৩৪৬সাল)

(ঋ) ফিরে এসো সুরঞ্জনা
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে (আকাশ লীনা)

(৯) একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে। (দূর পৃথিবীর গন্ধ)

এখানে দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ 'শিশির' ও 'নক্ষত্র' শব্দদ্বয় বারবার ব্যবহার করেছেন। কবির শৈলী সত্তার গুণে শব্দদুটি আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে অনবদ্য চিত্ররূপময়ী দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

সুতরাং জীবনানন্দের কবিতা চিত্ররূপময়। এটা অবশ্যই মহৎগুণ। শৈলী চর্চায় শব্দ ও ধ্বনির পাশাপাশি বাক্য গঠনের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। শব্দের মালা গেঁথেই সৃষ্টি হয় বাক্য। বাক্যের অবয়ব বিচারে শৈলী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী তন্ময় নিরাসক্ত।

চমস্কি তাঁর 'ASpects of the theory of Syntas' গ্রন্থে বলেছেন— বাক্যের দুটি রূপ ঃ

এক।। অন্তরঙ্গ রূপ (Deep Structure)

দুই।। বহিরঙ্গ রূপ (Siscface Structure)

নোয়ামচমস্কি বলেছেন যে, বক্তা বা লেখকের মনে ক্রিয়াশীল থাকে অন্তরঙ্গরূপ, তার প্রকাশ ঘটে বহিরঙ্গ রূপে।

জীবনানন্দের চিত্ররূপময়তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন যথাক্রমে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

Style সম্পর্কে ফরাসী দার্শনিক বুঁফোর একটি প্রবাদ তুল্য বাক্য প্রচলিত আছে। তিনি বলেছেন—

'Le Style c'est I'homme me'me (style is the man himself)

অর্থাৎ শৈলী হলো লেখকের বা কবির সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

দার্শনিক স্ত্রস্ত'র অনুসরণ করে বলতে পারি—

শিল্পীর কাছে রঙের যে ভূমিকা, কবি সাহিত্যিকের কাছে 'শৈলী'র সেই একই ভূমিকা, শৈলী হলো, লেখকের বা কবির স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে নির্বাচিত বা অচেতনভাবে নিয়োজিত সেই সব ভাষাগত উপায়, যার দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগাযোগ সাধন করেন। অর্থাৎ লেখকের মননের চিন্তনের, অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তার প্রকাশই হল 'শৈলী'।

জীবনানন্দ এ ব্যাপারে খুবই শিল্পদক্ষ কবি। তিনি অনায়াসেই পাঠকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করছেন তাঁর চিত্ররূপময়তা দিয়েই। পাশাপাশি বর্ণের বা শব্দের অনুরণন তাঁর ছিলো, ছিলো অনুপ্রাস। যেমন—

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য। (বনলতা সেন)

কবিতাগুলিতে আছে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বিমিশ্রণের অদ্ভুত এক মোহালিমা।

অবক্ষয়ী সমাজ আর নৈরাশ্য, সেই-সাথে গ্রাম ও শহরের মেলবন্ধন জীবনানন্দের কবিতায় আছে। নাগরিক নগ্ন চিত্র, মৃত্যু এবং প্রকৃতি তন্ময়-কবি জীবনানন্দ। এপ্রসঙ্গে আমরা কতকগুলি উদাহরণ নিতে পারি। যা অবক্ষয়ী উত্তর-আধুনিকতার (Post Modern'sm) চিত্র তাঁর রোমান্টিক কবিমনকে আচ্ছন্ন করেছিলো।

এক। অতীতচারিতায় নিবিষ্ট রোমান্টিক কবি—
হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি
পৃথিবীর পথে/সিংহল সমুদ্র থেকে
মালয় সাগরে/অনেক ঘুরেছি আমি
বিম্বিসার অশোকের ধুসর জগতে....'

দুই। অবক্ষয়ী প্রেম-চেতনা এবং যুগের নৈরাশ্য প্রেমের কুলষতা লক্ষ্য করেছেন কবি। প্রেম বড়ো ক্ষণস্থায়ী—চিরশাশ্বত নয় :—
"আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো
নাটোরের বনলতা সেন।"

তিন। বোধ-পরীক্ষা নিরিক্ষা মূলক। কবি স্বপ্ন এবং বাস্তবের টানা পোড়েনের শিল্পী।
"স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়—মাথার ভিতরে
কোন এক বোধ কাজ করে...." (বোধ/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

চার। "হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান করি"
—(বিমূর্ত কাব্যপ্রতিমা) (ঘাস)

ম্যাথু আর্‌নল্ড তাঁর 'দি স্টাডি অব্ পোয়েট্রি' গ্রন্থে কবিতাকে বলেছেন—
'Poetry is the criticism of life" এবং কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডস বলেছেন—
'Poetry is the spontaneous overflow of powerfull feelings'

প্রথমটির দ্বারা বলা যায় যে জীবন-সমালোচনায় জীবনানন্দ অসাধারণ ব্যঞ্জনার শিল্পী। লিরিক' এবং ব্যঞ্জনা রোমান্টিকতার শর্ত, সেই সাথে প্রেম, পরকীয়া, অতীতী চারণা, নিসর্গ এবং সার্বজনীনতা দিয়ে জীবনানন্দ রোমান্টি জীবন বিশ্লেষক 'Un paralled poet' তথা তুলনা রোহিত শিল্পী কবি, তাঁর জীবন দর্শন ভারী সুন্দর ঃ—

"সবপাখি ঘরে ফেরে সব নদী
ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন
থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।" (বনলতা সেন)

এই প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি কীট্স এর কথা তুলনীয়। বোধ করি জীবনানন্দের মহত্ব বুঝতে এটা খুব রসদ দেবে। লোর‍্যাঁর আঁকা ছবি থেকে প্রেরণা নিয়ে জন কীট্স লেখেন — "Ode on a greecian urn' এতে আঁকা কাব্যচিত্র প্রত্নপ্রতিমা (Archetype) পুরাতন থাকলেও কীট্স স্বমহিমায় আসীন। মাঠ-ঘাট-নদী-প্রান্তর, নারী, প্রেম সবই আছে। তবু সেগুলির উপমার অসাধারণ ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ। অবশেষে রূপ- রস- গন্ধ- শব্দ- আস্বাদের একটি বিমল রসাবেদন সৃষ্টি করছে তাঁর কবিতা। যা বাংলা রোমান্টিক গদ্য কবিতা লিরিকের জগতে এক অপার বিস্ময়। এক্ষেত্রে সমালোচক 'Un paralled' শব্দটি ব্যবহার করায় সাধারণ গবেষক হিসাবে বলতে সাহস পাচ্ছি যে—"জীবনানন্দ দাশ বাংলা আধুনিক কবিতার অপার বিস্ময়'।

ভবিষ্যতে জীবনানন্দ চর্চা নতুন দিক দিশারী হয়ে নিশার একবিংশকে উজ্জ্বল করবে। সব মিলিয়ে কবির শিল্প কুশলতা হাজার বছরে চর্চিত শিল্প কিম্বা যুগজয়ী নিশ্চয় হতে পারে।

তথ্য সূত্র ঃ

১। ভাষা ছন্দ/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। কল্লোল পত্রিকা (১৯২৩)
৩। 'বিস্মরণী'—মোহিতলাল মজুমদার
৪। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা
৫। বেঙ্গলী অথরস বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ
৬। ঐ
৭। ঐ
৮। Penguin, 2006
৯। ঐ
১০। 'Aspects of the theory of syntax, Noam chomosky
১১। ঐ
১২। শৈলী বিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথ শ্রীবাস্তব চতুর্থ সংস্করণ (হিন্দী)
১৩। প্রস্তের উক্তি (পর্যায় গ্রন্থ, ষষ্ঠ পত্র, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ বাংলা থেকে গৃহিত, ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে।
১৪। 'The study of poetry'–Mathew Ernold
১৫। লিরিক্যাল ব্যালড্স, আলোচনা মুখবন্ধ, ওয়ার্থওয়াস
১৬। চিদানন্দ দাশগুপ্ত, Penguin 2006

■ ড. মদন চন্দ্র করণ—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

সোমাভদ্র রায়

কবিতার রূপ রসে সুকুমার রায়

দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির তিন প্রজন্ম স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। এঁদের পাশেই রাখা যায় আর এক পরিবারের নাম। রায়চৌধুরী পরিবার। উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সত্যজিৎ এই তিন প্রজন্ম প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীল। বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ঠাকুর পরিবারের অবদান তেমনি অনস্বীকার্য। মিলের আর একটি বিষয় উল্লেখ্য যে দুই পরিবারের প্রথম পুরুষ অর্থাৎ দ্বারকানাথ ও উপেন্দ্রকিশোর দুজনেই দত্তক পুত্র। প্রথিতযশা স্বর্ণপ্রসবী দুই পরিবারের সূত্রপাত ঘটেছে দুই দত্তক সন্তানের হাত ধরে। হয়ত এ এক অলৌকিক সমাপতন। তবে দুই আলোকজ্জ্বল পরিবার বাংলার জগৎজীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকলেন, তাঁদের পরিবারের সমৃদ্ধির সূচনা হচ্ছে দুই দত্তক পুত্রের হাতে—এটা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁদের জিন বাহিত উত্তরপুরুষ নানা ক্ষেত্রে নিজেদের প্রকাশ করেছেন তাই হয়ত তুলনা অযৌক্তিক নয়।

দ্বারকানাথের প্রিন্স উপাধি শুধুমাত্র ঐশ্বর্য বা অর্থের নিদর্শন নয়। এক আলোকপ্রাপ্ত মানুষ হিসাবে যুগের পক্ষে এগিয়ে থাকা কাজ তিনি করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের পথ বেছেছেন জীবনচর্যায়—আর রবীন্দ্রনাথ বাবামশায়ের দেখানো পথে চলেও ভিন্নতর পথ খুঁজে নিয়েছেন নিজেকে প্রকাশের—সাহিত্যের পথ, শিল্পের পথ, সৃষ্টির পথ; অন্যদিকে রায়চৌধুরী পরিবারের উপেন্দ্রকিশোর সময়ের তুলনায় অনেকটা এগিয়েই ছিলেন। 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ তাঁর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। বাঙালি শিশু কিশোরদের সামনে সেদিন খুলেছিল এক অজানা জগতের ঠিকানা। বাঙালির বেড়ে ওঠার ক্ষণগুলি তিনি ভরিয়ে দিয়েছিলেন নির্মল আনন্দে। সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশে'র জন্য গড়ে তুললেন এক নতুন প্রজন্মের লেখকগোষ্ঠী, রায়চৌধুরী পরিবারের সকলেই প্রায় কোন না কোন সময়ে 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য কলম ধরেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের ভাই কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন সম্পাদনার দায়িত্বও সামলেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা সুখলতা, পূণ্যলতা, শান্তিলতা যেমন লিখেছেন 'সন্দেশে'র পাতায়; পুত্র সুকুমার, সুবিনয় এবং সুবিমলও তেমনি নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন 'সন্দেশে'র পাতা। সুকুমার রায়চৌধুরী, যিনি সুকুমার রায় নামেই পরিচিত তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন 'সন্দেশে'র পাতায়। তাঁর সুযোগ্য সন্তান সত্যজিৎ রায় প্রতিভাও বহুমুখী। সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণ তাকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি দিয়েছে।

সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। এত সংক্ষিপ্ত জীবনে এত কিছুই মণিমাণিক্য রেখে গেছেন যা আমাদের অবাক করে। নাটক, গল্প গান, ছড়া, ছবি,

প্রবন্ধ অজস্র অমর সৃষ্টি করেছেন দুহাত ভরে। তৈরি করেছেন ননসেন্স ক্লাব মণ্ডে (Monday) ক্লাব। কাজের আনন্দ এবং আনন্দের কাজ-এর মধ্যেই ডুবে ছিলেন তিনি। এই যুগ্মসম্মেলনের মধ্যে তাঁর সৃষ্টিশীল মেজাজটি চিনে নেওয়া যায়। অসময়ে চলে যাওয়ায় নিজের কোন মুদ্রিত বই তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তবে বই-এর সাইজ, বাঁধাই মলাট একটি পূর্ণাঙ্গ বই-এর পরিকল্পনা তিনি করে গিয়েছিলেন।

সুকুমার রায়ের লেখায় তাঁর জীবনদর্শন ও ভাবনা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার সম্যক উপলব্ধি জরুরি। তাঁর রচনাকে রঙ্গ রসিকতা বা হাস্যরসের বলে দেগে দিলে ভুল হবে আমাদের। আর শিশুসাহিত্য রচয়িতা বলে তাঁকে চিহ্নিত করলে আমাদের ভাবনার সীমাবদ্ধতাই প্রকাশ পাবে। তাঁর বিজ্ঞানচর্চিত মন, যুক্তিসিদ্ধ মনন যে রসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তা বাংলা সাহিত্যে নতুন এবং অভিনব। কাজেই তার কাব্যকবিতাকে শুধু মাত্র শিশুসাহিত্য বলে শ্রেণীভুক্ত করলে আমরা ভুলের কাছাকাছি পৌছে যাব। আসলে সুকুমার রায় এক নতুন জগৎ এঁকেছেন কবিতায়—এঁকেছেন তাঁর নতুন রকমের কলমে। যা আমাদের চেনা জানা জগতের হলেও কোথাও আলাদা, প্রথাবদ্ধ ছকবাঁধা পৃথিবীটাকে তিনি বিদ্ধ করতে চেয়েছেন তাঁর লেখনী দিয়ে। আমাদের অভ্যস্ত চেনা ছকে তিনি চলেন নি, কারো রেখে যাওয়া জুতোয় পা গলান নি, উলটো চশমা দিয়ে দুনিয়াটাকে দেখেছেন, এফোঁড় ওফোঁড় করেছেন প্রথাগত দুনিয়াদারীকে। তাঁর স্বকীয়তার হদিশ সাধারণ চোখে ধরা না পড়লেও কবির চোখে এড়িয়ে যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি চিঠির কথা উদ্ধার যোগ্য। বিখ্যাত প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্তকে চিঠিটি লিখেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ, সুকুমার সম্পর্কে তাঁর অভিমতটি জ্ঞাপন করেছেন সেখানে—

"আমাদের এই পৃথিবীর ভিতরেই আরও অনেক পৃথিবী রয়েছে যেন, সাধারণ চোখ দিয়ে স্বভাবত তা খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন নয়। যাকে তা সৃষ্টিপরায়ণ মানসের ভিতর; এরাই আমাদের দেখান। সেই সব পৃথিবীর ভিতর কোনওটা যেন এই জগতেরই তীব্র স্বচ্ছ সুকুমারের মত, কোনওটা কিছু কুয়াশাচ্ছন্ন অথবা বিদ্যুতায়িত; এই রকম এবং আরও অনেক রকম। কিন্তু সুকুমার রায়ের পৃথিবী 'আবোল তাবোল' এ যা সত্য হয়ে ফলে উঠেছে। তা মোটেই আমাদের চেনাজানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতি ছবির মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য। এই মানেই কবির সাদাসিদে ভাবে সে এক অনন্য সাধারণ শক্তি; আমি কোনও স্বদেশী বা বিদেশী সাহিত্যিকের লেখায় ঠিক এই ধরণের প্রতিভার পরিচয় পাই নি। সুকুমার রায়ের এই স্বকীয়তার কথা যতই ভাবা যায়। ততই বিস্ময়ের ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়।"[১]

জীবনানন্দের এই চিঠির মধ্যে সুকুমার রায়ের ব্যতিক্রমী সৃজনসত্তাটি ধরা পড়ে।

সুকুমার রায়ের কবিতাকে ননসেন্স বলা হয়। আসলে সুকুমার রায়ের জন্ম ও

সাহিত্য সৃষ্টি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে। উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ও তার সংস্কৃতিকে সুকুমার রায় নিপুণভাবে চিনে নিতে পেরেছিলেন। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা আর পাশ্চাত্য আধুনিকতার টান এই দ্বন্দ্বে যে জগাখিচুড়ি সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছিল সুকুমার রায় তার স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতায় এদের নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, ব্যঙ্গের নতুন ভাষ্য রচনা করেছেন। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে ডাবল অনার্স নিয়ে পাশ করে আলোকচিত্র ও ছাপাখানার প্রযুক্তিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষার্থে ১৯১১ সালের অক্টোবরে বিদেশ যাত্রা করেন। ইংলন্ডের L.C.C. School of Photo Engraving and Lithography তে শিক্ষা শেষ করে ১৯১৩ সালে দেশে ফিরে আসেন। পিতা উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিষ্ঠান 'ইউরায়'তে কাজ শুরুর পর তাঁরই হাতযশে সেটি হয়ে ওঠে 'ইউরায় অ্যান্ড সন্স'। সাহিত্য নিয়ে চিন্তার পাশাপাশি ফটোগ্রাফি চর্চাও ছাপার কাজ শেখা স্বল্প সময়ের জীবনে বহু কাজ করেছেন, পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহসান্নিধ্য। পিতার মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আর এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সুকুমার রায়ের সাহিত্য সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। ননসেন্স কবিতার পরিপূর্ণ প্রকাশ 'সন্দেশে'র পাতায়। ননসেন্স বা আজগুবি সাহিত্যের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। মূলত ইংরাজি সাহিত্যে এর সূচনা। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে বুক অফ ননসেন্স লিখে এডওয়ার্ড লিয়ার এর সূত্রপাত করেন। তারপর লিয়ারের সমকালীন লুইস ক্যারলের রচনাগুলি যোগ হয়ে আজগুবি সাহিত্যের আর একটি ধারা সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটি চালু করেন 'আবোল তাবোল' ও 'হ য ব র ল'—র স্রষ্টা সুকুমার রায়।

ননসেন্স ভার্সও এক ধরনের কবিতা এবং অন্যান্য কবিতার মত ননসেন্স ভার্সেও নান্দনিক আবেদন অনস্বীকার্য। ছন্দ মিলের এক অনায়াস কারুকাজ এ কবিতায় থাকে। কৌতুকের মেজাজ এর মধ্যে অন্য এক মাত্রা এনে দেয়। সুকুমার রায়ের বিশেষত্ব এখানেই যে অর্থহীন ননসেন্সের মধ্যে তিনি এনেছেন এক গভীর দার্শনিক চিন্তা। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুকুমারের প্রতিভা অসাধারণ। লিয়র বা ক্যারেলের চেয়ে সুকুমারের কবিত্বগুণ অবশ্যই উচ্চমানের। এই অনুসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—

"ভেবে দেখছি আপন কাব্যের ক্ষেত্রে কার কীরকম মূল্য। ইংরেজিতে লিয়র কিংবা লুইস ক্যারল আসন পেয়েছেন হালকা কবিতার বিভাগে.....কিন্তু সুকুমার রায়কে 'হাসির কবিতা'র গণ্ডির মধ্যে ধরে রাখা যায় না, কোনো বিশেষজ্ঞতার পরিধির মধ্যেও না—তিনি বেরিয়ে আসেন বাংলা কবিতার বড় মহলেই। 'আবোল তাবোল' আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে, বাংলা ভাষার রীতিমত একটি কাব্যগ্রন্থ, যাতে হাসির ছুঁতো করে, ছবি এবং কৌতুকের সাহায্যে ভুলিয়ে এনে শিশুদের এবং বয়স্কদেরও কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ

কাব্যরস আন্তঃস্থ করে দেয়া হল। 'মেঘমুলুকে ঝাপসা রাতে'/ রামধনুকের আবছায়াতে' বা 'আলোয় ঢাকা অন্ধকারের গন্ধে ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাবেন কি কবি ছাড়া অন্য কেউ?...নাকি সংসারের হাজার হট্টগোলের মধ্যে অনবরত শুনতে পাবেন যে গাছের মাঝে 'তবলা বাজে ধিনতা?....তাঁকে কবি বলে না মানতে হলে কবি কথাটির অন্যায়ভাবে সীমানা টানতে হয়।"[২]

সুকুমার রায়ের কবিতাগুলির মধ্যে বিচিত্র জগতের সন্ধান মেলে। আপাত অর্থহীনতার মধ্যে গভীর দার্শনিকতার রূপটি ফুটে উঠে। হাস্যরস বা ব্যঙ্গ কবিতার রসহানি না ঘটিয়ে স্বাদে করে তুলেছে অনবদ্য। হাসির কবিতা এর পরেও বহু লেখা হয়েছে তবে সুকুমার রায়ের মত কবি কল্পনা খুবই বিরল। মালপোয়া লোভী মার্জারের অভিযান এবং তারই লোভী দৃষ্টিতে—

'পূবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা'—এর কোন তুলনা হয় না।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'সমগ্র শিশুসাহিত্য ঃ সুকুমার রায়' সংকলনের সূচিপত্রে 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত ছড়ার সংখ্যা পয়তাল্লিশ। তাছাড়া নামহীন ছড়া কবিতা আছে আটটি। গ্রন্থের প্রথম ও শেষ কবিতাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।-এ গ্রন্থ সম্পর্কে কবির ভাষায় বলা কথা—এ বইয়ের রংরূপের ছবিটাও ধরা পড়ে এই কবিতায়। পাঠককে কবি যেন ডাক দিয়েছেন—

আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত বাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন ধিন্।
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাবহীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে

অসম্ভবের ছন্দেতে।

আজগুবি চালে মেতে অসম্ভবের ছন্দে মাতাল হবার আগে এ কবিতা যেন এক আলোকময় প্রবেশ দ্বার। এ কবিতাটি যেন গৌরচন্দ্রিকা, কাব্যজগতে ঢোকার ছাড়পত্র। তাঁর শেষ কবিতাটি নাম কবিতা। লেখক এ কবিতায় মেঘমুলুকে নিয়ে গিয়ে জগৎকে দেখেছেন—

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
.....
আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাই বা তাহার অর্থ হোক্
নাইবা বুঝুক বেবাক্ লোক।

মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মৃত্যুর আগে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ কবির সর্বশেষ রচনা ছিল এই কবিতাটি। যেন তিনি বুঝেছিলেন এই তাঁর শেষ লেখা।

আদিম কালের চাদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

'আবোল তাবোল' গ্রন্থটি কবির মৃত্যুর নয় দিন পরে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩। রোগশয্যায় বইটির জন্য কবিতা নির্বাচন, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন, বইয়ের নামকরণ, প্রচ্ছদ অঙ্কন, অঙ্গসজ্জা বইয়ের প্রুফ সংশোধন সবই সুকুমার রায় নিজে হাতে করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

'খাই-খাই' কাব্যগ্রন্থটির পরিকল্পা সুকুমার রায়ের নয়। তাঁর মৃত্যুর ২৭ বছর পরে ১৯৫০ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর 'খাই-খাই' প্রকাশ করে সিগনেট প্রেস। কবিপুত্র সত্যজিৎ রায় এই বইটির অলংকরণ করে দেন। 'খাই-খাই' কবিতাটির নামে বইটির নামকরণ করা হয়েছিল। 'সন্দেশ' এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত সুকুমারের কবিতাগুলি থেকে চয়ন করে বইটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিরিশটি কবিতা আছে, এছাড়া নামহীন তিনটি কবিতাও যুক্ত হয়েছে।

'আবোল তাবোল' গ্রন্থে দ্বিতীয় কবিতার নাম 'খিচুড়ি', এই নামের মধ্যে এক অভিনবত্ব আছে। বোঝা গেল কবি আমাদের নিয়ে গেছেন এক অচেনা জগতে—

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না,
বক কহে কচ্ছপে—বাহবা কি ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।"

ব্যাকরণ না মানা মানে শুধু শব্দ তত্ত্ব বা ভাষাজ্ঞানকে অস্বীকার করা নয় এর মধ্যে দিয়ে জীবন জগৎ সম্পর্কে নির্ধারিত ধ্যানধারণাকেই স্বীকার না করার কথাটি বলা রইল। এখানে ভাষার কারিকুরির সাহায্যে দুটি অসম প্রাণী জোড়া দিয়ে যে আজগুবির সৃষ্টি হয়েছে, কিম্ভূতে তা চরমে পৌঁছেছে। হাঁসজারু, বকচ্ছপ, মোসগরু, গিরিগিটিয়া, সিংহরিণ ও হাতিমির খিচুড়ি কিম্ভূতে একেবারে জগাখিচুড়ি। এই জট ছাড়িয়ে দেবার পথ নেই। এতেই রসের সঞ্চার।

'আবোল তাবোল'-এর একটি বিখ্যাত কবিতা 'নেড়া বেলতলায় যায় কবার?' —এই কবিতা সম্পর্কে কবিপুত্রের উক্তি বিশেষ স্মরণীয়—

"যখন পড়ি—রোদে রাঙা হাঁটের পাঁজা তার উপরে বসল রাজা
ঠোঙা ভরা বাদামভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না"

—তখন ছন্দ আর মিলের বাহাদুরির চেয়েও যেটা আমাদের বেশি অবাক করে সেটা এই যে ইঁটের পাঁজার সঙ্গে রাজার বা রাজার সঙ্গে বাদামভাজার যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা আমরা কল্পনাই করিনি। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ ছন্দ ছবি সব মিলে এক আশ্চর্য নতুন অনুভূতি আমাদের সাধারণ কাব্য ও সাধারণ কৌতুকের জগৎ থেকে এক নতুন জগতে নিয়ে যায়। এরই সঙ্গে আমাদের কৌতূহলও জেগে ওঠে ঠিকই, কিন্তু পূর্বপ্রত্যাশার কোনো চেনা পথ দিয়ে কবির আগে এগিয়ে যাবার কোনো উপায় যাকে না, কারণ আমরা বুঝতে পারি। যে পথটা একমাত্র কবিরই চেনা পথ।"[৩]

কবির চেনা পথটুকু চিনে নেওয়ার জন্য আমাদের এই অন্বেষণ।

ইংরাজি সাহিত্যে খাঁটি আজগুবি বা ননসেন্স রচনার আরম্ভ ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সেটি যুক্তি তর্কের যুগ, নিয়মের বেড়াভাঙা সৃজনশীল কল্পনার যুগ। এডওয়ার্ড লিয়ার ও লুইস ক্যারল দুজনেই উনিশ শতকের লেখক। সুকুমার রায় এদের উত্তরসুরী, অনুকারী নন কখনোই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব তখন বিশ্বজুড়ে যখন সন্দেশের পাতায় লিখে চলেছেন সুকুমার রায়। পরাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক সুকুমার রায়ের লেখায় কৌতুক বা ব্যঙ্গের আবরণে সমকাল প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের নানা অসংগতি উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। অনেক আজগুবি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন—তারা হয়ে উঠেছে কবিতার এক একটি চরিত্র। তারা আজগুবি হয়েও আমাদের চেনাজানা জগতের নিকটবর্তী। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের উক্তি অনুসরণীয়—

"ক্যারলের বিখ্যাত কবিতা জ্যাবারওয়াকির ব্রিলিগ বা বোরোগোরেতে সুকুমার মেজাজের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাও একটি মূল পার্থক্য রয়ে গেছে। জ্যাবারওয়াকির প্রাণীগুলি এমন এক কল্পনার জগতে বাস করে যে তাদের কার্যকলাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে আনকোরা নতুন শব্দ ব্যবহার করতে হয়। লিয়ারও একাধিক আজগুবি প্রাণীর সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ভঙ, জাম্বলি, পবল, ক্যাঙ্গলওয়াঙ্গল, ব্লু বস-ওয়াস এদের কাউকেই লিয়ার আমাদের চেনা-জানা জগতের খুব কাছে আসতে দেননি, এদের জগৎটা প্রায় রূপকথার জগৎ। একদিকে হুঁকোমুখো হ্যাংলার বাস বাংলাদেশে, শুধু তাই নয়—'শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার/আর তার কেউ নেই এছাড়া।?" ঠিক তেমনি ট্যাঁস গরুকে অনায়াসে দেখা যায় হারুদের অফিসে, কিম্ভূত কেঁদে মরে মাঠপারে ঘাটপারে, কুমড়ো পটাশও নিশ্চয়ই শহরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করেন, নইলে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের এতটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন হতো না। একমাত্র রামগড়ুরকেই দেখি সঙ্গত কারণেই নিরিবিলি পরিবেশ বেছে নিয়েছে, কিন্তু সেও রূপকথার রাজ্য নয়, অবিশ্যি এদের জগৎটাকে ঠিক বাস্তব জগৎও বলা চলে না। এটা আসলে হলো সুকুমারের একান্ত নিজস্ব একটি জগৎ, এবং এই জগতের সৃষ্টিই হলো সাহিত্যিক সুকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"[৪]

এটাই হয়ত সেই জগৎ সেখানে প্রবেশ করে পাঠক দেখতে পায় হাঁসজারু বা কাঠবুড়োকে।

'গোঁফচুরি' সুকুমার রায়ের অসামান্য সৃষ্টি। অসম্ভব সমস্ত কাণ্ড ঘটেছে এ কবিতায়। আমাদের চেনা নিয়ম বা গ্রাউন্ড রুল এখানে পুরো উল্টে গেছে। হেড অফিসের বড়বাবুর গোঁফচুরি গিয়েছে। বিশ্ব সংসারে এমন চুরির কথা কেউ কখনো শোনে নি। কিন্তু বড়বাবু বলে কথা—কাজেই সবাই গোঁফ খুঁজতে তৎপর হয়ে উঠে। হায়ারারকি বলে একটা কথা আছে যখন তাকে তো মানতেই হবে। তাকে নিজের গোঁফটি দেখানো হলে তিনি ভয়ংকর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন—

"নোংরা ছাটা খ্যাঁরা ঝাঁঠা বিছিরি আর ময়লা,
"এমন গোঁফও রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।"

কবিতার শেষটা অনেকটা নিদান ঘোষণার মত। বাবু বলে উঠেন—

"গোঁফকে বলে তোমার আমার —গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

গোঁফ দিয়ে মানুষ চেনার এই পদ্ধতি একেবারে অভিনব বলাই বাহুল্য।

'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতায় আপাত হাস্যরসের আড়ালে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে

সমাজের প্রতি। বাবুরাম সাপুড়ের কাছে এমন সাপ চাওয়া হচ্ছে যে সাপ নির্বিষ, যে কাউকে কামড়াবে না। বিষধর সাপকে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে সাপের রূপকে কবি মানুষের প্রবৃত্তিকে কটাক্ষ করেছেন। কঠিন প্রতিরোধের সামনে আমরা ভীত-অথচ দুর্বল সহায়হীনের প্রতি আমরা অত্যাচারী। তাই 'তেড়ে মেরে ডাণ্ডা করে দিই ঠাণ্ডা'[২]—এই মানসিকতাকে চরম ব্যঙ্গ করা হল এ কবিতায়। বাঙালির এই মানসিক দীনতাকে সুকুমার রায় মেনে নিতে পারেন নি। কবিতায় ব্যঙ্গের মোড়কে সে কথাই ব্যক্ত হল।

প্রকৃত অর্থে সার্থক ননসেন্স ভার্সের আবেদন মূলত নান্দনিক। অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনা সেখানে নতুন মাত্রা যোগ করে। ননসেন্স ভার্সে থাকে একটি বিশেষ দর্শনের বুনিয়াদ। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে ভিন্নতর তাৎপর্যে অন্বিত। আজগুবি বা অসম্ভবকে দেখাও এক বিশেষ ধরনের দেখা। এই দৃষ্টিতে না দেখলে এই দুনিয়া হয়ে দাঁড়ায় কার্যকারণহীন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তখন অর্থহীন বলেই মনে হয়। যেন এক অ্যাবসার্ডিটি। ননসেন্স ভার্সের পিছনে এই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। আর এই আজগুবি অবলম্বন করে যে রসসৃষ্টি হয় তা প্রধানত হাস্যরস। ব্যঙ্গ সেখানে কখনো আড়ালে কখনো বা উচ্চকিত। সুকুমার রায়ের 'কাঠবুড়ো' কবিতাটি গবেষণা বিষয়টিতে বা গবেষককূলকে ব্যঙ্গ করলেও সেটি মুখ্য হয়ে উঠে নি। তাদের আজগুবি বানিয়ে হাসির উপাদান সৃষ্টি করেছেন।

'সৎপাত্র' কবিতাটিতে অসঙ্গতি থেকে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। বক্তা গঙ্গারামের রূপের কথা ও গুণের কীর্তন করতে গিয়ে যা বলেছে তা হয়ে উঠেছে অপূর্ব ব্যজস্তুতি। প্রশংসার ছলে নিন্দার এমন ছবি কবিতায় বেশ শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে প্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যেতে পারে। বিখ্যাত সিনেমা 'শোলে'র একটি দৃশ্যে জয় বন্ধু বীরুর বিয়ের সম্বন্ধের বিষয়ে বাসন্তীর মাসির সঙ্গে কথা বলতে যায়। সেখানে যে ধরনের কথাবার্তা বলেছে জয় তাতে সৎপাত্রে ছাপ স্পষ্ট। জানা যায় না চিত্রনাট্যকার সেলিম ও জাভেদ খান সুকুমার রায়ের কবিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন কিনা। কিন্তু এই ধরনের সাদৃশ্য বেশ বিস্ময়কর। আসলে সুকুমার সম্পর্কে আমাদের আলোচনা কখনো শেষ হবার নয়। তিনি বোধ হয় বাঙালির আড্ডায় সব চেয়ে বেশি উদ্ধৃত একজন কবি। তাঁর লেখা বহু ব্যক্তি, তাঁর কবিতার বহু চরিত্র মিথ-এ পরিণত হয়েছে, আমরা পূর্ণাঙ্গ ভাবে সুকুমার রায়কে বুঝে বা না বুঝে তাঁর থেকে ঋণ নিয়ে চলেছি।

'শব্দ কল্পদ্রুম'-এ শব্দদ্বৈতের ব্যবহার হাস্যরসকে তীব্র করেছে। শব্দ প্রয়োগ ও যথার্থ অর্থসঙ্গতির বৈপরীত্যকে নিয়ে মজা করেছেন কবি। তবে মজা নিছক মজা নয় তার গভীরে অনেক নিজস্ব চিন্তনের ছাপ আছে। চাঁদ নিয়ে রোমান্টিকতাকে নসাৎ করে কবি চাঁদ ডুবে যাওয়ার শব্দও কল্পনা করেছেন। ফুল-পাখি-চাঁদ বাঙালি তথাকথিত

রোমান্টিকতার তিন উপকরণকে সুকুমার রায় তীব্র ব্যঙ্গে ফালাফালা করেছেন—

চুপ চুপ ঐকোন ! ঝুপ ঝুপ ঝ-পাস
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল? গব গব গবা-স।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহসান্নিধ্য পেয়েও তাঁর কাব্যরীতি অনুকরণ করেন নি সুকুমার রায়। বিষয়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব ধারা যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি উদ্ভাবন করেছেন নিজস্ব সৃজনকৌশল। রবি বহ্নিতে মুগ্ধ পতঙ্গের মত তিনি ঝাঁপ দেন, কিন্তু নিজেকে সমর্পণ করেননি, খুঁজে নিয়েছেন নিজস্ব কাব্যভাষ।

'ভালরে ভাল' কবিতায় কবি জগতের সব কিছুকে ভাল বলে ভাবতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষে সব ভাল পেরিয়ে কবি ভাল বলে মান্যতা দিয়েছেন 'পাউরুটি আর ঝোলাগুড়' -কে। জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু এখানে প্রাধান্য পেল। রোমান্টিকতাকে অস্বীকার করে খাদ্যের প্রয়োজন বা চাহিদাকে স্বীকার করা হল, 'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি'কে প্রেমের কবিতা বলা যেতে পারে। প্রেমের প্রকাশ বেশ সোজাসাপটা ভাষায়। প্যাঁচার কণ্ঠ কর্কশ তবে প্যাঁচানিরও তাই।

কিন্তু প্যাঁচার কাছে তা মধুর ঠেকে। সৌন্দর্যের বোধ যে প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক, এই হাস্যরসের কবিতায় সেটা ধরা পড়ে।

'গানের গুঁতো' কবিতায় গান গাওয়া নিয়ে বিষম কাণ্ড ঘটেছে, ভীষ্মলোচন শর্মার গলা সাধার জ্বালায় সবাই অতিষ্ঠ, তবু তাকে থামানো যাচ্ছে না। শেষে পাগলা ছাগলের শিং-এর গুতোয় তিনি শান্ত হলেন। এখানে কবি গানের কালোয়াতির প্রতি কিছুটা ব্যঙ্গ করেছেন হয়ত।

'কুমড়ো পটাশ' কবিতায় ননসেন্সের যথাযথ প্রকাশ, হট্টমেলার গাছ কি জিনিস ভেবে পাওয়া মুশকিল। তবে অসম্ভবের ছন্দেতে মেতেই তো আমরা কবির তৈরি করা জগতে প্রবেশ করেছি। সেখানে কুমড়োপটাশের নানা অর্থহীন কাণ্ডকারখানা দেখা যাবে। 'হাতুড়ে' কবিতায় ডাক্তারের কেরামতির মধ্যে হাসির উপাদান লুকিয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে নানা উদ্ভট আচরণ করেছে হাতুড়ে ডাক্তার। 'বোম্বাগড়ের রাজা' ছড়াটিতেও নানা অসম্ভব ও উদ্ভট রাজত্বের দরজা খুলে গেছে।—

'কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা।'

'ঠিকানা' কবিতায় অসম্ভব জগৎ নয় হাসির তুফান উঠেছে প্রশ্ন আর উত্তরের আদলে—

'বলতে পার কোথায় থাকে আদ্যানাথের মেশো
আদ্যানাথের নাম শোননি? খগেনকে তো চেনো?
শ্যাম বাগচি খগেনেরই মামাশ্বশুর জেনো।

শ্যামের জামাই কেষ্টমোহন, তার যে বাড়িওয়ালা
(কি যেন নাম ভুলে গেছি) তারই মামার শালা।

কবিতার মধ্যে বন্ধনী দিয়ে স্বগতোক্তির রীতি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। আদ্যানাথকে চিনিয়ে দেবার উপায় হিসাবে যা বলা হচ্ছে তাকে উত্তরদাতার সুবিধা কতদূর বলা মুশকিল, তবে তিনিও কম যান না, তিনি এমন উত্তর দেন তাতে প্রশ্নকর্তার ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সুদূর পরাহত—

ঠিকানা চাও? বলছি শোন; আমড়াতলার মোড়ে
তিন-মুখো তিন রাস্তা গেছে তারি একটা ধরে,
চলবে সিধে নাক বরাবর, ডানদিকে চোখ রেখে;
চলতে চলতে দেখবে শেষে রাস্তা গেছে বেঁকে।
.....
তারপরেতে হঠাৎ বেঁকে ডাইনে মোচড়ে মেরে
ফিরবে আবার বাঁমের দিকে তিনটে গলি ছেড়ে
তবেই আবার পড়বে এসে আমড়াতলার মোড়ে—
তারপরে যাও যেথায় খুশী-জ্বালিয়োনাকো মোরে।'

সুকুমার রায়ের হাসির রসভাণ্ডার নানা রঙে পূর্ণ। ব্যঙ্গ, কৌতুক, শ্লেষ, বুদ্ধিদীপ্ত সরসতা সব মিশিয়ে আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যজগৎ। ননসেন্সের কবিতার মধ্যে এক অন্যজগৎ গড়ে তুলেছেন কবি। কোনো কোনো সমালোচক ননসেন্সের মধ্যে রূপক অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সেই অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন—সুকুমার রায়কে শুধুমাত্র ছোটদের মজাদার লেখক ভাবতে দ্বিধা হয়।.....ননসেন্সের কবিরাজ লিয়রের লেখায় যখন অর্থ খোঁজা শুরু হয়েছিল, তখনও গেল-গেল রব উঠেছিল। তার ভিতর রূপক খোঁজা যে নিছক পাগলামি, তা যে সরল শুদ্ধ ননসেন্স ছাড়া আর কিছুই নয়, এক খ্যাতিমান সম্পাদককে সে কথা উচ্চকণ্ঠে প্রতিপন্ন করতে দেখা গেছে।..... লীলা মজুমদার আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। তাঁর কথাগুলি অবিকল এই ঃ "সুকুমার নিজে কখনও এমন একটিও পদ রচনা করেননি, যার মধ্যে অর্থ ও রস দুই-ই নেই। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি আঁচড় অর্থে আর রসে টইটম্বুর।" এই কথার পরে শত মুখোশ পরানো থাকলেও অনুমান করতে সাহস হয়, এই রস শুধু সরস রচনার রসও নয়, রসসাহিত্যের রস।"[৪]

সুকুমার রায় আমাদের প্রথাগত জীবনকে ছাপিয়ে আজগুবি যে জগৎ তৈরি করেছেন তাকে শুধুমাত্র রূপক আখ্যা দিলে খণ্ডিত হবে সেই ভাবনা। লীলা মজুমদার সুকুমার রায়ের কবিতাগুলিকে বহুঅর্থে সম্ভাবনাময় বলে চিনে নিতে পেরেছিলেন। তিনি অর্থময় কবিতাগুলিকে ননসেন্সের অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন। তাই পেয়েছেন রসের খোঁজ।

'হাত গণনা' কবিতায় কবির বিজ্ঞানী মন সজাগ। হস্তবিচারের নামে ধাপ্পাবাজিকে এখানে কৌতুক রসে ভিজিয়ে পরিবেশন করা যায়। 'ভয় পেয়ো না' কবিতায় অভয় দেওয়ার নামে জোর করে ভয়ই দেখানো হল—

'অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দু'টা?
বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা:
আমি আছি, গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।'

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবি সুকুমার রায়' প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'আবোল তাবোল'-এর ছড়াগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে মনুষ্য-আচরণের অতিরেক বিষয়ক কবিতা, যাকে বলা যেতে পারে **human experiences exagerated**। এর মধ্যে 'গোঁফচুরি', 'কাতুকুতু বুড়ো', 'গানের গুঁতো', 'চোর ধরা', 'কাঠবুড়ো', 'সাবধান', 'বুঝিয়ে বলা', 'ঠিকানা' প্রভৃতি কবিতাকে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। দ্বিতীয় ভাগে আজগুবি শ্রেণীর কবিতা অর্থাৎ 'খিচুড়ি', 'কুমড়োপটাশ', 'হুকোমুখো হ্যাংলা', 'ট্যাশ গুরু', 'ভয় পেয়োনা' প্রভৃতিকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি ব্যঙ্গাত্মক। 'সৎপাত্র', 'রামগড়ুড়ের ছানা', 'হাতুড়ে', 'নারদ নারদ', 'একুশে আইন' প্রভৃতি।

'আবোল তাবোল'-এর ছড়ার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তার ছবি। কবির নিজের আঁকা ছবি কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ছবি ও কবিতার জোড় বেশ মিলেছে। উপেন্দ্রকিশোরের আঁকার প্রতিভা সুকুমার রায় পেয়েছিলেন, সত্যজিৎ রায়ও সেই প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন। তাঁর গল্প বা কবিতার ব্যাখ্যারূপে অনেক ছবি এঁকেছেন। সুকুমার রায়ের কবিতা হয়ত চিত্র-ব্যাকরণের দিক থেকে নিখুঁত নয় তবে নিজস্বতায় সেগুলি কাব্যের রস বাড়িয়ে দিয়েছে।

'খাই খাই' কাব্যগ্রন্থে বাস্তব জীবনেরই বিভিন্ন অসঙ্গতি এখানে কৌতুকের জন্ম দিয়েছে। এখানে অন্য লেখার মত দ্বিতীয় অর্থের স্তরটি অপ্রকাশ্য নয়; তবে সেখানে ভিতরের তত্ত্বকথা কোথাও বড় হয়ে উঠে নি; উপরিতলের হাল্কা হাসির ভাবটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে এর রসগ্রহণে কী বয়স্ক কী শিশু কারোরই কোন সমস্যা হয় নি। 'খাই খাই' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় কবি বলেছেন—

খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে—
খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।

এরপর খাওয়াব বিষয়টা আর শুধু খাওয়াতে আটকে থাকে নি—

সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে।

শেষে কবি বলেছেন—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘন্টা।

'বেশ বলেছ' কবিতায় বিদ্যা ফলানোকে কবি হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভাঙার মতোই লজ্জার বস্তু বলে ঠাউরেছেন, তাই বলেছেন—

বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখানে দাও দাঁড়ি,
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি।

'পড়ার হিসাব' কবিতায় শিশু মনের সারল্য ধরা পড়ে। ছুটির পরে মাষ্টারমশায়ের প্রশ্নের জবাবে পড়ার হিসাব দিতে গিয়ে গদাই গাছ থেকে পড়ার কথা বলে ফেলে। 'আড়ি' কবিতায় প্রাণীজগতের জানকে কাজে লাগানো হল। বাঘে-ছাগলে, শেয়ালে কুকুরে সাপে-নেউলে যে শত্রুতা তা আমাদের জানা, তবে কবি জানিয়ে দিলেন কোনো কোনো ছাত্রের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের। একজন কিশোরের মনস্তত্ত্বকে হাসির মোড়কে ব্যক্ত করা হল। একথা ভুললে চলবে না এই সমস্ত কবিতাই 'সন্দেশে'র জন্য লেখা, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ছোটদের জীবন গঠনের একটা দায় 'সন্দেশ' যেন নিজ দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিল। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই একশো বছর আগে সুকুমার শুধু ছোটদের জন্য লেখেননি। ছোটদের মন এবং রুচিকে তৈরি করার দুরূহ কাজটি করে গেছেন কোন ঘোষণা ছাড়াই। ছোটদের বাংলা শেখানোর কথা মাথায় রেখেই তিনি ছড়া লিখেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে 'সহজ পাঠ' সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু বাংলা শেখানোর জন্য শিশু উপযোগী ছড়া লিখে গেছেন সুকুমার রায় 'সন্দেশে'র পাতায় পাতায়। সন্দেশের পৃষ্ঠায় একাধিক ছড়া তিনি লিখেছেন এবং তার সঙ্গে ছবিও এঁকেছেন, তাতে উপেন্দ্রকিশোরের এই অর্থাৎ UR-এর নকল করে SR লিখে স্বাক্ষর করেছেন। কতখানি সিরিয়াস চিন্তাভাবনা থাকলে এভাবে শিশুদের জন্য লেখায় হাত লাগানো যায় তা হয়ত সব সময় আমরা ভেবে দেখি না।

'দীর্ঘ কবিতা', 'অতীতের ছবি' সুকুমার রায়ের লেখার থেকে ভিন্ন গোত্রের, বলা যায় সিরিয়াস কবিতা। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির গৌরবের কথা বলেছেন কবি। ক্রমে এল মধ্যযুগীয় অন্ধকারযুগ, জ্ঞানের উজ্জ্বলতা ঢাকা পড়ে গেল। মানুষ সত্য অন্বেষণ না করে ক্ষুদ্রস্বার্থ নিয়ে নীতি নিয়মের বেড়াজাল বানাল। এই অধঃপতনের যুগে বিদেশী জাতি এসে প্রভাব বিস্তার করল। দেশের ঐশ্বর্য সম্পদ লুণ্ঠন করল তারা। আবার উনিশ শতকের নবজাগরণের আলোয় এগিয়ে এলেন কয়েকজন ব্যক্তিত্ব। রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। মহাপুরুষের কীর্তির কথা স্মরণ করেছেন কবি। তবু কবির মধ্যে হতাশা কাটে নি। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন অবস্থা তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে তার প্রমাণ আছে। এ প্রসঙ্গে কবিপুত্রের কথা উল্লেখ করা

যেতে পারে— ব্রাহ্ম যুবকদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও আলোচনার সাহায্যে সমাজের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে নবীনতা সঞ্চার করা ছিল সুকুমারের জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সমাজের আদিপর্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তাঁকে যেমন উদ্বুদ্ধ করত, মনে হয় ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁকে হতাশ করেছিল সমকালীন কিছু আদর্শচ্যুতির দৃষ্টান্ত। তাঁর একেবারে শেষ দিকের রচনা ছোটদের জন্য পদ্যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস 'অতীতের ছবি'র শেষ কয়েকটি ছত্রে এই কারণেই বোধ হয় একটা হতাশার সুর লক্ষ করা যায়।"[৬]

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকার কারণে সেখানে নানা ঘটনায় কবির আশাভঙ্গ ঘটেছিল। 'অতীতের ছবি' কবিতায় তার প্রকাশ। হাস্যরসের যে প্রবণতা কবির সব রচনার মূলে থাকে এখানে তার প্রকাশ নেই। অন্তরের গভীর যন্ত্রণা, দ্বন্দ্ব, এই কবিতার উৎস। নীতি ও মূল্যবোধের যে শিক্ষায় কবি পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তুলতে চান সেখানে কোথাও ব্যঘাত ঘটেছে। তাই রক্তক্ষরণ। সদাসর্বদা হাস্যরসের আলোতে ডুবে থাকা সৃষ্টিশীল কবি আজ ব্যথিত। 'অতীতের ছবি' কবিতাকে তাই আলাদা করে বিশ্লেষণ করা জরুরী।

আরও জরুরী সুকুমার রায়ের কবি প্রতিভাকে নতুন আলোকে বিশ্লেষণ। সমাজ জীবনের সঙ্গে কবির দ্বান্দ্বিক মনোভাব হাস্যরসের পোশাকে উপস্থাপিত হয়েছে পাঠকের দরবারে। ননসেন্স ভার্সের দুনিয়াকে আমরা নিজেদের ভাষায় চিনে নিতে পারলাম সুকুমার রায়ের কবিতা পড়ে। তাই যুগান্তকারী কবি বলে সুকুমার রায়কে শিরোধার্য করতেই হবে আমাদের। তাতেই কোন শ্রেণীর তকমা ছাড়াই আমরা কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারব।

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১। সুনীল জানা—ভূমিকা। সুকুমার সমগ্র; সুকুমার রায়, দে'জ পাবলিশিং ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ-৭
২। বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, বাংলা শিশু সাহিত্য, ভারবি, প্রথম প্রকাশ, পৃ.১৫৮।
৩। সত্যজিৎ রায়, ভূমিকা, সমগ্র শিশুসাহিত্য; সুকুমার রায়, আনন্দ পাবলিশার্স।
৪। সত্যজিৎ রায়, ভূমিকা, সমগ্র শিশু সাহিত্য; সুকুমার রায়, আনন্দ পাবলিশার্স।
৫। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসম্ভবের ছন্দেতে, দৈনিক কবিতা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০ সংকলন।
৬। সত্যজিৎ রায়, ভূমিকা, সমগ্র শিশু সাহিত্য: সুকুমার রায়, আনন্দ পাবলিশার্স।

■ ড. সোমা ভদ্ররায়—অধ্যাপিকা ও প্রাবন্ধিক

দীপঙ্কর আরশ

অব(য়ী বন্ধ্যাত্বের রূপকার - সমর সেন

পরিণত বোধ ও সংবেদনশীলতা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত নাগরিক কবি সমর সেন। তিনি অব(য়িত নাগরিক জীবনের বন্ধ্যাত্বের ছবিকে তাঁর কবিতায় বাস্তব রূপ দিয়েছেন। শুধু নাগরিক জীবনেরই নয়, সর্বত্র তিনি যে অব(য় প্রত্য(করেছেন কবিতার কায়ায় তাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিতেও সেই অব(য়ই স্পষ্টতা পেয়েছে -- প্রেম সেখানে বন্ধ্যা। এমন এক অবস্থা থেকে কবি মুক্তি(র কোন পথ খুঁজে পান নি, বি(্বাসও রাখতে পারেননি -- অন্তত ১৯৪০ পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলিতে। কোন কোন কবিতাতে কিছু প্রত্যয় বা আশার বাণী শোনা গেলেও তা (ণিক, পর(ণে অব(য়ী বন্ধ্যাত্বই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪০-এর পরে অবশ্য তাঁর কবিতায় বামপন্থী প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে কবি-প্রতিভার সার্থক প্রকাশ ল(্য করা যায় না। কাব্যজীবনের শেষের দিকে যখন দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আকাশ বাতাসকে ধ্বনিত করে তুলেছিল -- সবকিছু তলিয়ে গিয়েছিল সর্বনাশের অতলে তখন তাঁর কবি-প্রতিভার পুনরায় উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ, অব(য়িত বন্ধ্যা সময়ের রূপায়ণেই সমর সেনের কবিতা স্বচ্ছন্দ গতি পেয়েছে।

কৈশোর ও যৌবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা কাব্যজগতে আধুনিক কবি সমর সেনের (১৯১৬-১৯৮৭) আবির্ভাব ঘটেছিল। আবির্ভাব লগ্ন থেকেই তিনি যে ধরণের কবিতা লিখতে শু(করেছিলেন তা মোটেও আর পাঁচজন কবির মতো নয়। তাঁর কবিতায় যে বোধ ও সংবেদনশীলতা দেখা দিয়েছিল তা অত্যন্ত পরিণত ও নতুন। একই কথা প্রযোজ্য তাঁর বাচনভঙ্গির (ত্রেও। কবিতায় তিনি যে গদ্যছন্দের ব্যবহার ঘটালেন, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ধারা বলতে পারি - রাবীন্দ্রিক কবিতা থেকে যা একেবারে ভিন্ন জাতের। ''সমর সেন কাটা-কাটা বাক্যে এবং খণ্ড খণ্ড প্রতীকী চিত্র ও ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে কবিতাকে এক সংহত রূপ দিলেন এই ছন্দে, যা তাঁর প্রধান প্রকাশ পদ্ধতি হিসেবে বজায় ছিল শেষ পর্যন্ত, শুধু বাক্যের প্রবহমানতা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল।'' [১]

কাব্যজগতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই কবি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বিবিধ কারণের মধ্যে প্রধানতম কারণ বলে যেটি ভাবা যেতে পারে সেটি হল -- মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজের অন্তরের কথা শুনতে পেল তাঁর কবিতায়। সমর সেনের আবির্ভাবকাল বিশ শতকের তিরিশের দশক। সেই সময় গান্ধীজির আন্দোলন হঠাৎ করে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। সেইভাবে কোন বিপ-ব গজিয়ে ওঠার কথাও কেউ ভাবতে পারছিল না। মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বি(্বাস সবকিছু বি(্বব্যাপী মন্দার চোরাবালিতে

হয়েছিল নিমজ্জমান। সমর সেন নাগরিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের বুদ্ধিজীবি কবিরূপে সেই সময়কে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির হতাশা ও বেদনাকে তাঁর কবিতায় দৃঢ়ভাবে রূপ দিলেন। এক কথায়, সমকালীন নগরজীবনের ক্লান্তি, বিকার, বি(োভ, হতাশা, নৈরাশ্য, বেদনা, সামাজিক বিরোধ আর শ্রেণি সংঘর্ষের এক স্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। তখনও পর্যন্ত অন্য কোন কবির কবিতায় সেই রূপ অতটা বাস্তবতা পায়নি। বলা যায়, আধুনিক নগরজীবনের সামগ্রিক রূপ তাঁর কবিতাতেই প্রথম স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। একই বক্তব্যের অনুরণন পাই কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর কণ্ঠেও -- ''নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও সমগ্রভাবে আধুনিক নগরজীবন সমর সেনের কবিতাতেই প্রথম ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের বিচার বি(োভ ও ক্লান্তির কবি।'' [২]

সমর সেনের কবিতা পাঠে আমরা ল(্য করি, তিনি যে শহরের কথা বলেন সেই শহর অব(য়িত শহর - বন্ধ্যা শহর। নাগরিক জীবনের অন্তঃসার-শূন্যতাই সেখানে প্রধান কথা। সেই শহরে মানবিকতা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রেম সেখানে যৌন অনাচারের নামান্তর মাত্র। তাই বিশিষ্ট সমালোচকের এই মন্তব্যটি স্বীকার করে নিতেই হয় যে -- ''তিনি বাস্তব শহরের কবি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তিনি প্রতীকী শহরের কবি। শান বাঁধানো শহর যেখানে স্বাভাবিক নিয়মের প্রবর্তনায় কিছু জন্মায় না, যে শহরের উন্মার্গগামী ভিড়ে মানবিক সম্পর্কগুলো হয় অনুপস্থিত নতুবা যান্ত্রিক, জনসঙ্ঘের অস্বাভাবিক অনুপাতের ফলে যেখানে যৌন-অনাচারের বিচিত্র প্রবাহ, সেই শহর বন্ধ্যাত্ব ও নপুংসক ব্যর্থতার প্রতীক।''[৩] কেবলমাত্র নগরজীবনেই নয়, সর্বত্র কবি এই অব(য়কে প্রত্য(করেছেন -- ''শহরে, বন্দরে, গ্রামে/প্রাচীন সভ্যতা ধোঁকে ঘেয়ো কুকুরের মতো।'' (ত্র(ান্তি, সমর সেনের কবিতা(পৃ. ১১০)

সমর সেনের প্রথম বই 'কয়েকটি কবিতা' (মার্চ, ১৯৩৭), যা গদ্য কবিতার সংকলন। পুন(ক্তি(তে বলি, রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার সঙ্গে তা মেলে না। সমর সেনের গদ্য কবিতাগুলিতে কোন গল্প বলার চেষ্টা করা হয়নি, কোন দার্শনিক তত্ত্বও তিনি খাড়া করতে চাননি - আধুনিক নাগরিক জীবনের টুকরো টুকরো ছবি সেখানে ফুটে উঠেছে। ল(্যনীয়, তাঁর প্রথম দিককার কবিতাগুলি মূলত প্রেমের কবিতা - নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রেমচেতনার এক উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়ে সেইসব কবিতাগুলির কায়ায়। সেই চেতনায় প্রেম ভালোবাসাহীন, মনোরমতাহীন। শূন্যতাবোধের কারণে প্রেম সেখানে রূপস্নিগ্ধতা হারিয়ে হয়ে উঠেছে শরীরী বস্তু। তাই --

''সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত্রি ভরে
তোমাকে পাবার বাসনা
বিষাক্ত(সাপের মতো।'' (প্রেম, ওই(পৃ.২২)

একই কারণে সমর সেনের কবিতাতে নায়িকার আবির্ভাব ঘটে তীব্র শরীরী আবেদনে। সেই নায়িকার 'স্বপ্নের মতো চোখ', 'সুন্দর, শুভ্র বুক, 'রক্তি(ম ঠোঁট' আর সমস্ত দেহ জুড়ে 'কামনার নির্ভীক আভাস'। শরীরী আবেদন মুখ্য বলে বা তাঁর কাব্যে প্রেম দেহাশ্রয়ী বলে শহুরে নায়িকাদের চিত্র রূপায়ণে দেখা যায় উগ্র সাজসজ্জা। যেমন, 'মৃত্যু' কবিতায় দেখি, প্রান্তরের অন্ধকার থেকে এক ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গিনী বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ায় আলোতে এবং রূপসজ্জা করে নেয়। সে তার শীর্ণ হাতে একরাশ অলসতায় ওষ্ঠ নেয় রাঙিয়ে ও মুখে মেখে নেয় পাউডার। এ জাতীয় রমণীরাই ঘুরে ফিরে হাজির হয় সমর সেনের কবিতায়। অন্যত্র পাওয়া যায় চীনা রমণীর কথা, ফিরিঙ্গি রমণীর কথা। যেমন -- ''শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি/ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।'' (একটি বেকার প্রেমিক, ওই(পৃ.৪০)

সমর সেনের পৌরাণিক চরিত্রেরাও বিকৃত কামাচারের শিকার। যেমন রঘুবংশীয় শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ (য়রোগে আত্র(ান্ত হন যৌন যথেচ্ছাচার ও আনুষঙ্গিক সুরায় লিপ্ত থাকার কারণে। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীরা পরামর্শ করে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নি(প করেন। বিকৃত যৌনাচারের উত্তেজনা যে অপমৃত্যুই ডেকে আনে সমর সেন সেই বক্ত(ব্যই উপস্থাপন করেছেন 'অগ্নিবর্ণ' কবিতাটিতে ---

''নির্জন গুহায় নিবিড় নিষিদ্ধ প্রেম,
ভিজে ফুলের মতো নর্তকীর নরম শরীর,
প্রতী(ায় স্পন্দমান কত সঙ্গীত উজ্জ্বল বুক
তবু আজ মৃত্যু এলো আষাঢ়ের মেঘের মতো,
হে অগ্নিবর্ণ।'' (ওই(পৃ.৩৬)

'রক্ত(করবী', 'বিস্মৃতি'র মতো কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে প্রেমকে নিয়ে কোন রোমান্টিক ভাবালুতা সমর সেনের কবিতায় পাই না। মূলত যা পাই তা বিকৃত যৌনতা, শহুরে বিকারগ্রস্ত যৌনতার ছবি --অব(য়িত প্রেমের ছবি। এই প্রেমহীন যৌনতা শেষ পর্যন্ত কোন কিছুরই জন্ম দেয় না, সৃষ্টিও করে না। শহরের গড্ডল প্রবাহে নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর চেষ্টায় এই যে যৌনমিলন, তা কোনভাবেই নিঃসঙ্গতা না ঘুচিয়ে আরো বেশি করে একা করে দেয় এবং জীবনে নিয়ে আসে তিক্ত(তা।

আসলে, ভয়ঙ্কর ধণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কবলিত সবকিছুই বিচার্য পণ্যমূল্যের নিরিখে। এই ব্যবস্থা প্রেমকেও পণ্য ভাবে। সমর সেনের কবিতায় প্রেমের সেই পণ্যরূপই বাস্তব হয়ে উঠেছে -- শা(েত প্রেমের আকৃতি নয়। তাই 'কয়েক টাকার কয়েক প্রহরের প্রেম'

কবির সামনে রূঢ় বাস্তবতায় হাজির হয়। শরীরী বিকৃত চাহিদাজনিত প্রেমের (ণিক স্থিতিকাল ল(য করে কবি বলতে পারেন -- প্রেমিকাকে কবির মনে পড়বে 'হয়ত কোনো রাত্রে রতি বিহারের সময়', তার পর 'কদিনই বা মনে থাকবে'। আসলে শহুরে আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা ও অনিশ্চয়তাই কবির এই দৃষ্টিভঙ্গির পোষক। ''আধুনিক জীবনে কবির বি(োস -- প্রেম বরবাদ হয়ে গিয়েছে। যা আছে তা নিতান্তই জৈব অভ্যাস'' [৪]

''আর আজো তো আছে
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন('' (ঘরে বাইরে ওই(পৃ.৪৩)

মূল পরিচয়ে সমর সেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির নাগরিক কবি, যে নগর অব(য়িত সভ্যতার প্রতীক হিসাবে বড় ((-বিষন্ন। তাঁর বহু কবিতায় সেই আধুনিক সভ্য নাগরিক জীবনের ক্লেদ, গ-ানি, নৈরাশ্য ও হতাশার চিত্র বাস্তব রূপ পেয়েছে। ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়ট যেমন অব(য়িত জীবনের ছবি এঁকেছেন, তেমনি সমর সেনও নাগরিক জীবনের ছবিকে মূর্তিমান করে তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতায় এবং নাগরিক সভ্যতার নগ্নতাকে চাবুক মেরেছেন। তিনি যে মহানগরের বর্ণনা দিয়েছেন সেই মহানগরে বিবর্ণ দিনের পর নেমে আসে কালো আলকাতরার মতো রাত্রি। সমস্ত দিন ধরে শোনা যায় রোলারের শব্দ। বহুদূরে কখনো কখনো লাল কৃষ(চূড়ার রঙের চকিত আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পর(ণেই ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ। এক কথায় সমর সেন যে মহানগরের কথা বলেন, সেখানে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন কদর্য, নিষ্ফল, নিরর্থক। মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই অবস্থা সম্বন্ধে যে অসচেতন এমনটা নয়, কিন্তু সচেতন থেকেও তারা নি(ি(য় এবং নৈরাশ্য দ্বারা আত্র(ান্ত। চল্লিশের দশকে মহানগরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই যে অব(য় তার এবং নৈরাশ্যপীড়িত শূণ্যতার সার্থক রূপায়ণের উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করতে পারি 'নাগরিক' কবিতার অংশ বিশেষকে। যেখানে কবি বলেছেন ---

''মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, আর আলকাতরার মতো রাত্রি . . . .
আর কত লাল শাড়ী আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
আর হাওয়ায় গোল্ডফ্লেকের গন্ধ, . . .
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে।
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গনোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভি(
শৃন্বন্তু বি(ে অমৃতস্য পুত্রাঃ'' (ওই(পৃ. ৩৭-৩৯)

এরকম নগর কি কবি চান? চান না। মহানগরের কাছে কবির তাই প্রার্থনা 'সমান

জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন'। এইরূপ নাগরিক জীবন থেকে মুক্তি(র আকাঙ্খা বেশ কয়েকটি কবিতাতেই ধ্বনিত হতে শুনি। যেমন 'ঝড়' করিতার শেষ কয়েকটি ছত্রে কবি মুক্তি(র আকাঙ্খা ধ্বনিত করেছেন ---

''যদি ঝড় নেমে আসে,
শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ করে
অন্ধকারে ঝড় নেমে আসে,
তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।'' (ওই(পৃ.১৯)

কোন কোন কবিতাতে কবির প্রত্যয়ও চোখে পড়ার মতো। কবির বি(্বাস জটিল অন্ধকারের বুক চিরে একদিন সুদিন নেমে আসবে। যেমন 'ঘরে বাইরে' কবিতায় কবি বি(্বাসের সুরে বলেছেন, অব(য়িত এই সভ্যতা একদিন কালের গলিত গর্ভে নিমজ্জিত হবে -- নিদা(ণ অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটবে। পৃথিবীতে আবার নেমে আসবে 'আকাশগঙ্গা', তথা বসবাস উপযোগী নির্মল শান্ত স্বপ্নিল জীবন।

কিন্তু এই আকাঙ্খা বা প্রত্যয় কি কবি সমর সেন শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন? অন্তত তাঁর কাব্য রচনার প্রধান সময়টিতে, বলা যায় ১৯৪০ পর্যন্ত সময়কালে পারেন না। বিনিদ্র কবি হাওয়ার শব্দে স্পষ্টভাবে শুনতে পান দূর কুটির হতে ভেসে আসা কান্নার শব্দ, ঘুঙুরের ধ্বনি, মাতালের স্খলিত চিৎকার, আর দিগদিগন্তে শেষ রাত্রে কলের বাঁশির তীব্র হাহাকার ধ্বনি। এসব বাস্তবতার বাইরে বেরিয়ে না আসতে পারার নিষ্ফলতা কবিকে গ্রাস করে। তাই -- জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা পীড়িত আকাশ আর অজগরের মতো জমাট বাঁধা কালো মেঘই প্রধানত সত্য হয়ে থেকে যায়। আর সত্যতা লাভ করে ---

''আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ,
আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা
জীবন্ত বীজানুর মতো।'' (ঝড়, ওই(পৃ.১৯)

স্বাভাবিকভাবেই কবি নাগরিক জীবনের সন্ধ্যাকে ব্যঞ্জিত করেন 'ঝুলন্ত শূয়রের চামড়া'র দ্বারা, 'শীতের শকুনে'র দ্বারা। তাঁর কবিতায় কোথাও মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন কোমলতার সঙ্গে ধরা দেয় না, সর্বত্রই কাঠিন্যের সঙ্গে রূপ পায় অব(য়ের কথা -- পঙ্গুত্বের কথা।

এই অব(য়ী বন্ধ্যাত্বের ছবিকে বাস্তব করতেই তাঁর বহু কবিতাতে হাজির হয়েছে ক্যাকটাস ফণিমনসায় পূর্ণ ম(ভূমির কথা -- শূন্য ম(ভূমির কথা। এলিয়টের মতো সমর সেনও পৃথিবীটাকে দেখেছেন 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' আর 'ক্যাকটাস ল্যাণ্ডে'র মতো। যেমন -- 'পিঙ্গল বালুচর সর্বভূক অবিন(্বর' (রোমন্থন), 'সমস্ত(ণ রক্তে(জ্বলে/বণিক সভ্যতার শূন্য ম(ভূমি' (একটি বেকার প্রেমিক), 'কুটিল ফণিমনসা হাসে' (ঘরে বাইরে)

, 'রসহীন ফণিমনসায়, ((বালুতে/প্রানের প্রতিরোধে চত্র(ান্ত চলে' (শবযাত্রা), 'তারপর সামনে শূন্য ম(ভূমি জ্বলে/বাঘের চোখের মতো' (স্বর্গ হতে বিদায়)। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য, 'ম(ভূমি তার বিস্তার, জ্বালা, অন্তর্(াস, বালুর অনুর্বর নিষ্ফলতা নিয়ে হয়ে উঠেছে বন্ধ্যা বিষন্ন শহরের মতোই অন্তঃসারশূন্য, অনুর্বর, নির্বেদময় বর্তমান অবস্থায় কবির মানসিকতার অবজেকটিভ কো-রিলোটিভ। এই ইমেজগুলির পুনরাবৃত্তি সেই মৌলিক পরিস্থিতি সমূহের দিকে ইশারা করে, যে দিকে আঙুল দিয়ে দেখায় (য়রোগগ্রস্ত নগর।''[৫] সমালোচকের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অর্থে যথার্থ বলে মেনে নিতে পারি।

কবি সমর সেন মনে করতেন, এই অব(য়ের হাত থেকে বা ভয়ঙ্কর বণিক সম্প্রদায়ের শয়তানি গ্রাস থেকে এবং নাগরিক বিকার থেকে মধ্যবিত্ত সমাজ এমনকি বুদ্ধিজীবি কবি শিল্পীদের মুক্তি(র কোন উপায় নেই। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো অনিবার্য পতনের সা(ী হওয়াই তাদের একমাত্র কাজ ---

''তাই ঘরে ব'সে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলিঃ
আমাদের মুক্তি(নেই, আমাদের জয়াশা নেই,
তাই ধ্বংসের (য়রোগে শি(িত নপুংসক মন''।
(একটি বুদ্ধিজীবি, ওই(পৃ.৫০)

ধৃতরাষ্ট্র জানতেন তাঁর বিপদের বা সর্বনাশের সম্ভবনার কথা। তবু তিনি জ্ঞানী গু(জন ও অন্যান্য সুপরামর্শদানকারীদের বক্ত(ব্যকে অবহেলা করেছিলেন। হয়তবা সব ঠিক হয়ে যাবে এই ভ্রান্ত বি(্বাসে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। আমরা দেখি, ধৃতরাষ্ট্রের মতো কবি সমর সেনও সভ্যতার আসন্ন ধ্বংসের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আত্মধিক্কারে কখনো কখনো পলায়নবাদী(যদিও তিনি জানেন এই পলায়ন প্রবৃত্তি মোটেও গৌরবের নয়। দেখা যায়, অব(য়িত নাগরিক সভ্যতাকে ও প্রেমানন্দহীন শরীর সর্বস্ব বন্ধ্যা প্রেমকে মেনে নিতে না পেরে নগরজীবনের কুশ্রীতা ও নগ্নতা থেকে সরে গিয়ে তিনি তাঁর প্রেমিকার সাথে ঘর বাঁধতে চেয়েছেন নিরালায় -- অমর প্রকৃতির মাঝে। বিকারগ্রস্ত অব(য়িত পৃথিবীকে পিছনে ফেলে তিনি তাঁর নায়িকাকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছেন 'শেয়াল সঙ্কুল' কোন নির্জন গ্রামে, যেখানে 'নদীর উপরে নীল আকাশ নামে গভীর স্নেহে' (নিরালা)। নগর জীবনের যন্ত্রণা এড়াতে কবি কখনোবা খুঁজেছেন মেঘমদির 'মহুয়ার দেশ'। 'মহুয়ার দেশে'র আনন্দমন্থনে তিনি মুছে ফেলতে চেয়েছেন সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ -- 'আমার ক্লান্তির উপরে ঝ(ক মহুয়ার ফুল,/নামুক মহুয়ার গন্ধ' (মহুয়ার দেশ, ওই(পৃ.২৯)।

কিন্তু মহুয়ার দেশকে ঘিরে কবির স্বপ্ন অচিরেই ভেঙে গেছে। কয়লাখনির নোংরা পরিবেশ, শোষণ, বঞ্চনা, শ্রমিকদের জীবনের হাহাকারে তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। মেঘমদির মহুয়ার দেশে গিয়ে কবি শোনেন মহুয়া বনের ধারে রয়েছে যে কয়লার খাদান সেখান থেকে নিবিড় অন্ধকারকে ভেদ করে ভেসে আসা কয়লা তোলার বিকট শব্দ(আর দেখেন 'ধুলোর কলঙ্ক' ছড়িয়ে রয়েছে ক্লান্ত অবসন্ন গ্রাম্য মানুষগুলোর দেহে এবং ঘুমহীন তাদের চোখে যেন হানা দিয়েছে কোন এক 'ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন'। অর্থাৎ গ্রাম্য কোমল নির্মল পরিবেশও যে যন্ত্রসভ্যতার হাত থেকে মুক্ত(নয় এই রূঢ় কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন কবি। এই প্রত্যয়ই কবির মনে দৃঢ়তা পেয়েছে -- যন্ত্রসভ্যতা ম(ভূমির মতো সবকিছুকে গ্রাস করেছে, মুক্তি(কোথাও নেই -- না গ্রামে না শহরে।

'নিরালা' বা 'মহুয়ার দেশ' কবিতার সূত্র ধরেই বলতে পারি, সমর সেন রোমান্টিক বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন কবিরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেও রোমান্টিকতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া যে তাঁর কবিতায় ছিল না -- এমনটা নয়। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতায় তিনি মাঝে মাঝেই রোমান্টিকতার পথে হেঁটেছেন এবং ফিরে এসেছেন সাথে সাথেই। সেই স্বল্প(ণেই ল(্য করা গেছে রোমান্টিক সৌন্দর্যের জন্য হাহাকার।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের বিষাদময়তার আবরণে ঢাকা পড়ে যায় অব(য়ী বন্ধ্যাত্বের রূপকার সমর সেনের কবিতা। তাঁর প্রথম দুই কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা'র যাঁরাই সমালোচনা করেছেন তাঁরাই এই সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। কিন্তু, তাঁর সময়কালটা যদি বিচার করি তাহলে দেখবো সেই সময় কমিউনিষ্ট পার্টি ও মার্ক্সবাদী চিন্তা বড় একাট জায়গা দখল করেছিল এবং সমকালীন বামপন্থী অনেক লেখকের মধ্যে তার ছায়াও পড়েছিল প্রবলভাবে। তাঁরা সমকালীন অব(য়ী বন্ধ্যা সময়ের হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে নবোন্মেষিত সাম্যবাদী চিন্তাধারায় সমাজ বদলে দেবার চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য সমর সেনে পাই না। তাই সমালোচকের রূঢ় মন্তব্যকে স্বীকার করে নিতেই হয় -- ''বিপ-বী মিছিলের চলার ছন্দে, রক্ত(লাল ইস্তাহারের ভাষায়, শোষক শ্রেণীকে আঘাত করবার উত্তেজনায় উজ্জীবনের মন্ত্র পেয়েছিলেন অ(ণ মিত্র, দীনেশ দাশ। . . . হৃদয়ের ভালোবাসার একটি অবলম্বন ছিলো তাঁদের এই সংগ্রামের স্বপ্নে। সমর সেনের কোনো স্বপ্ন ছিল না, কোনো আশা ছিলো না ১৯৪০ পর্যন্ত।''[৬] অথচ তাঁর এক সময়ের স্পষ্ট উচ্চারণ --- 'আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট '।

তবে ১৯৪০ পরবর্তী সময়ে সমর সেনের কবিতায় পরিবর্তন ল(্নীয়। সেখানে মধ্যবিত্তসুলভ অব(য়ী বন্ধ্যাত্বের ভূমি ত্যাগ করে বামপন্থার দৃঢ়তার কথা শোনাতে চেষ্টা করেছেন কবি। এর একটা বড় কারণ হতে পারে তাঁকে কেন্দ্র করে বামপন্থী বন্ধুদের কড়া সমালোচনা। যেমন, সরোজ দত্ত তাঁর সমালোচনায় কিছু কড়া শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন

-- 'সুকৌশলী', 'ফাঁকি', 'Textbook Marxism', 'বৈষয়িক ধূর্ততা' ইত্যাদি। যাই হোক, প্রাক-চল্লিশ পর্বের নৈরাশ্যবাদ হতাশাবাদের ভূমি ত্যাগ করায় সমর সেনের কবিত্বশক্তি(ম্লানতার দিকে অগ্রসর হল। কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় আশঙ্কা করেছিলেন, সমর সেনের কবি জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে। সেই সময়ের অনেক কবিতার চরণই হয়ে উঠেছিল বামপন্থী দলের প্রচার পুস্তিকা। যেমন---

''পুঁজিবাদী চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিন্দুস্থানে,
হে সরকার, হুজুর সরকার
হুজুর বড়োলাট, জঙ্গীলাট, বর্মাবীর আলেকজাণ্ডার
আমরা বান্দা এখনো, তবু বন্দী তোমরা নিজেদের জালে
ইতিহাসের জাঁতাকলে, আত্মঘাতী নসীবের ফলে।'' (খোলা চিঠি, ওই(পৃ.৯১)

কবিজীবনের একেবারে শেষের দিকে লেখা ব্যঙ্গ ও হতাশার কয়েকটি কবিতায় সমর সেনের কবিপ্রতিভা শেষবারের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে কিছু বিষয়ে কবি হয়ে উঠেছিলেন তীব্র প্রতিত্রি(য়াশীল। সেই সময়ে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আকাশ বাতাসকে ধ্বনিত করে তুলেছিল। সমর সেনের অনেক কবিতাতেই ঐ পরিবর্তিত অবস্থার জন্য গভীর বেদনা-বোধের পরিচয় মেলে। স্বাধীনতার নামে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া তুঘলকী সিদ্ধান্তে কবির মনে হয়েছে সবকিছুই গিয়েছে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে। দেশভাগের নামে চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মৃত্যুর মহড়া। রাজনৈতিক নেতারা তান্ত্রিকের মতো শব-সাধনায় রত। সুবিধাবাদী কিছু মানুষ সাধারণ মানুষের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে। কবি দেখেছেন ---

''নষ্টনীড় পাখি কাঁদে আমাদের গ্রামে
রক্ত(মাখা হাড় দেখি সাজানো বাগানে।'' (নষ্টনীড়, ওই(পৃ. ১২১)

শেষের দিকে কবি-প্রতিভার পুন(জ্জীবন ঘটলেও অচিরেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন কাব্যজগত থেকে, সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সাংবাদিকতার জগতে। ১৯৬৮ সালে হুমায়ন কবীরের প্রতিষ্ঠিত 'NOW' পত্রিকা ছেড়ে ঐ বছরেই বিখ্যাত 'FRONTIER' প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এই পত্রিকার সুবাদে যে সমর সেনকে পাওয়া যায় তিনি ভিন্ন ব্যক্তি(ত্ব। 'FRONTIER' কোনভাবে মধ্যবিত্তসুলভ নৈরাশ্য ও হতাশাবোধের দ্বারা আত্র(ান্ত নয় -- বরং পুঁজিবাদ, অত্যাচার, বৈষম্য, রাজনৈতিক অভিসন্ধি ইত্যাদির বি(দ্ধে তা ছিল তীব্র প্রতিত্রি(য়াশীল। অনেকেই মনে করেন 'FRONTIER'-এই সমর সেনের যথার্থ উত্তরণ ঘটেছে।

যাই হোক, কবিরূপে সমর সেনকে বিচার করলে অব(য়ী বন্ধ্যাত্বের রূপকার হিসাবেই তাঁর নামটি জুড়ে যায়। আর হয়ত এই কারণেই আবির্ভাবলগ্নের জনপ্রিয়তাও তিনি ধরে রাখতে পারেননি এবং পাঠকদের কাছে ও কাব্যালোচনার (ে ত্রে কিছুটা

উপে(িত হয়েছেন। এ (ে ত্রে বিশিষ্ট সমালোচকের এই মন্তব্যটি যথার্থ -- ''প্রথম প্রথম অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সৎসাহস কবিকে জনপ্রিয় করে তোলে, সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির যদি আর কিছু বলবার না থাকে, তাহলে তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা নেহাতই একটা ভঙ্গি হয়ে দাঁড়ায়, আর কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা হয় ক্লান্তিকর এক ঘেয়েমি।''[৭]

তথ্যসূত্র ঃ

১. অ(ণ মিত্র, কবি সমর সেন(অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা(১৯৮৮, পৃ.৩।
২. বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল(নিউ এজ সংস্করণ(১৯৫৯, পৃ. ৬০।
৩. অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিক কবিতার দিগবলয়(সিগনেট বুক শপ(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ(পৌষ ১৩৮৬, পৃ. ২৩৪।
৪. পিনাকেশ সরকার, সমর সেন ঃ শতবর্ষের সীমানায়(২ ফেব্রুয়ারী ২০১৬, দেশ পত্রিকা, পৃ. ৫৪।
৫. অশ্রুকুমার সিকদার, ওই(পৃ ২৩৭।
৬. সুমিতা চত্র(বর্তী, আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়(প্রজ্ঞা প্রকাশন(প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ৮৫।
৭. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা(প্রকাশ ভবন(দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৮৯, পৃ. ৪২৮।

গ্রন্থ-ঋণ ঃ

১. সমর সেনের কবিতা(সিগনেট প্রেস(দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪।
২. কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু(নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৫৯।
৩. অনুষ্টুপ, সমর সেন বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮
৪. আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চত্র(বর্তী(প্রজ্ঞা প্রকাশন(প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯২।
৫. আধুনিক কবিতার দিগবলয়, অশ্রুকুমার সিকদার(সিগনেট বুক শপ(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ,পৌষ ১৩৮৬।
৬. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়(প্রকাশ ভবন(দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৮১।
৭. বাংলা কবিতার কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়(দে'জ পাবলিশিং(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর ২০০০।
৮. ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৬, দেশ পত্রিকা।

■ ড. দীপঙ্কর আরশ—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

বাসুদেব হালদার

ভাষাগত বিচলনের আলোকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

শৈলী আলোচনা ভাষাতত্ত্বের অন্তর্ভূত(হলেও একালে সাহিত্য সমালোচনার (ে ত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। লেখকের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের (ে ত্রে রচনা শৈলীর দিকটি বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'শৈলী' কথাটি ইংরেজি Style-এর বাংলা পরিভাষা। এসেছে লাতিন 'Stilus' শব্দ থেকে, যার অর্থ মোমের টুকরোর উপর লেখার উপযুক্ত(কলম। শৈলী বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হলো শৈলীবিজ্ঞান (বা Stylistics)। লেখকের শৈলী বা Style হলো লেখার (ে ত্রে আলাদা পরিচিতি, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি। শৈলী সম্পর্কে বুফোঁর সেই প্রচলিত কথা —'' Style is the man himself '' সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে কিন্তু তার মধ্যেও কবি বা লেখকের প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা দেখা যায়। কারণ প্রতিটি মানুষই আলাদা আলাদা সত্ত্বার অধিকারী। কবির ভাষায় — '' সকল লোকের মাঝে ব'সে / আমার নিজের মুদ্রাদোষে / - আমি একা হতেছি আলাদা? ।'' 'বোধ'/ জীবনানন্দ দাশ । প্রতিটি মানুষই যখন আলাদা তখন প্রকাশভঙ্গি আলাদা , তাঁর রচনায় ভাষা ব্যবহারে ভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক। সেই জন্যই সাহিত্য স্রষ্টাকে আলাদা করে চেনা যায়। আবার কবি বা লেখকের শৈলী আলোচনায় ভাষার দিকটি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। কারণ সাহিত্যের প্রকাশ মাধ্যম ভাষা । সাহিত্য দেহ নির্মিত হয় ভাষার দ্বারা। কবিরা তো ভাষার শব্দ দিয়েই ছবি আঁকেন। কোন সাহিত্য স্রষ্টার শৈলী বা Style নির্ণয় করার চেষ্টা করা, তাঁরই সৃষ্টির সৌন্দর্য নি(পণ করা।

সাহিত্যের শৈলী নির্ণয় করতে হলে স্বাভাবিকভাবে কয়েকটি দিকে ল(্য রাখতে হয়, যাকে শৈলী চর্চ্চাকার গণ শৈলী নির্ণয়ের মানক বা Parametter বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদিও সেই নির্ণায়ক দিকগুলিই কোন লেখকের শৈলী আলোচনায় যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্বিকদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবুও কয়েকটি সাধারণ নির্ণায়কের (Parametter) সূত্র ধরে কেনো সাহিত্যিকের রচনাশৈলী আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এগুলি হলো —

১) সমান্তরলতা (Parallelism)
২) বিপর্যাস (Inversion)
৩) প্রমুখণ (Foregrouding)
৪) বিচ্যুতি, বিচলন (deviation)

সাহিত্যের শৈলী বি(-ষণের একটি বিশেষ দিক deviation বা বিচ্যুতি বা বিচলন।

প্রচলিত সাহিত্যধারা থেকে লেখক অনেক সময় সচেতন বা অসচেতন ভাবে সরে যান। প্রচলিত রীতি বা মান্য রীতি (বা norm) থেকে কবি বা লেখক যখন সরে এসে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য রীতি সৃজন করেন তখনই হয় deviation . কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি স্থানে যখন কোন একটি রীতি বা আদর্শ প্রায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় এবং সাহিত্য রচনার (ে ত্রে সেই রীতির ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে আমরা বলি আদর্শ রীতি বা মান্যরীতি বা norm. কিন্তু স্রষ্টা যখন সেই প্রচলিত রীতি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরে গিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেন তখন হয় deviation. সাধারণত deviation -এর বাংলা করা হয় বিচ্যুতি। আমরা একে বিচলনও বলতে পারি, অর্থাৎ বিশেষরূপে চলন, সাহিত্য স্রষ্টা যখন তাঁর সৃষ্টিপথে বিশেষরূপে চালিত হন, গতানুগতিক বা বাঁধাধরা পথে না হেঁটে কবি বা লেখক যখন তার মধ্যে ভিন্নতা নিয়ে আসেন তখনই হয় সাহিত্যের বিচলন। অনেকে—এই আদর্শ মান্যরীতি বা norm থেকে সরে যাওয়াকেই লেখকের শৈলী বলে মনে করেছেন। যেমন এঙ্কভিস্ট শৈলীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ''Style ... as deviation from a norm. নিয়ম ভাঙাই যদি সাহিত্যের শৈলী হয় তবে সেই নিয়মের ব্যতয় বা বিচ্যুতি আবার কখনও নর্ম -এ রূপান্তরিত হয়ে যায়। যখন সেহ বিচ্যুতিই সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম রূপে প্রচলিত হয়ে যায় তখন সেই বিচ্যুতি বা deviation -ই norm-এ পরিণত হয়। এইভাবে deviaion এবং norm -এর ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের সৌন্দয ও নান্দনিকতা বিবর্তিত হয়। সাহিত্যস্রষ্টা যে এই নিয়মের ব্যাতিরেক সব সময় সচেতন ভাবে করে থাকেন তা নয়, কবি বা লেখকের এমন বিচলন সহজাতও হতে পারে। কবিদের (ে ত্রে বিশেষ করে এই বিচলন অন্তরোৎসারিত পথেই হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ড. অভিজিৎ মজুমদার মন্তব্য করেছেন ''কোন রচনার ভাষাগত বিচ্যুতি বলতে বুঝি, ভাষার প্রচলিত ও প্রত্যাশিত নিয়মের বাঁধন ভেঙে ফেলা। এই ভাঙন কবিতার ভাষায় ধরা দেয় খুব স্পষ্ট আকারে। কারণ ভাব ও ভাষার যুক্তি(সিদ্ধ শৃঙ্খল একমাত্র কবিই অনায়াসে ছিন্ন করে ফেলতে পারেন।''[২] কবির এই ধর্ম কোন কোন কবির (ে ত্রে স্বাভাবিক ভাবে উপলব্ধ হয়ে ওঠে যে, তাঁকে আলাদা করে চিনতে অসুবিধা হয়নি। তা তাঁর একান্ত নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি, যার কারণে তিনি অনেকের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র সত্ত্বার অধিকারী হয়ে ওঠেন। কবি সুভায় মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ভাষাগত বিচলন এতই স্পষ্ট যে কবি এ (ে ত্রে আপন শৈলীতে উজ্জ্বল। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় বিচলন কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রে(িতে ভাষাগত বিচলনের দিকটি আলোচনা করা যেতে পারে।

১) ধ্বনিগত বিচলন

২) রূপগত বিচলন

৩) শব্দগত বিচলন

৪) বাক্যগত বিচলন

ধ্বনিগত বিচলন কবির নিজিস্ব ভঙ্গিতে ভাব প্রকাশে বা ভাবের গভীরতর অনুভূতিতে পাঠককে প্রবেশ করাতে ধ্বনির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে । ধ্বনিসাম্য বা অসাম্যের মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর অন্তর্জগতের বহি প্রকাশ করে পাঠককে সেই ভাবের জগতে পৌঁছে দেন। ধ্বনি ব্যবহার বিশিষ্টতায় যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, সেখানে অনেক সময় কবির ভাবনাকেও পাঠক ছাপিয়ে যেতে পারেন।

একই ধ্বনির বারবার ব্যবহারে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেন কবিরা। তা যেমন ভাবনা প্রকাশে সহায়ক হয় তেমনি আবার তার প্রয়োগ কৌশলে কবির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতাটি :

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত

—ফুল ফুটুক না ফুটুক/ফুল ফুটুক

অনুপ্রাসের অনুরণনে একটি অপূর্ব ভাবের স্পষ্ট প্রকাশ এখানে সহজেই অনুভূত হয়। একই ভাবে ধ্বনির বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায় ' একবার বিদায় দে, মা ' কাব্যের 'তোবা' কবিতায় :

পারলেই দিস ঝাঁপ
ঘাট-আঘাটায়
অজলে অস্থলে।
— তোবা /একবার বিদায় দে, মা

একই পংক্তি(র মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্যজনিত ধ্বনির মিল বিন্যাস বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

একই ধ্বনির বারবার ব্যবহার করে কবি বিশেষ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয় একটি অপূর্ব ধ্বনি ঝঙ্কারের দোলা সৃজন করেছেন। যেখানে কবির একান্ত নিজস্বতা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 'ঘোষণা' কবিতায় দেখা যায় —

'এ দেশ আমার গর্ব,
এ মাটি আমার কাছে সোনা।
এখানে মুক্তি(র ল(্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।'

—ঘোষণা/ চিরকুট

ধ্বনির ব্যবহার বিশিষ্টতায় কবির ভাবের কাঙ্ক্ষিত রূপ যে প্রকাশিত হয়, তার যথার্থ দৃষ্টান্ত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পাওয়া যাবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু সেই ভাবের প্রবাহ পাঠক বা শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেবার যে কৌশল কবি ব্যবহার করেছেন তা শুধু অভিনবই নয়, কবির একান্ত ব্যক্তি(গত। এ (ে ত্রে কবি যতি-চিহ্নে(র সাহায্য নিয়ে সাধারণ ব্যাপারকে অসাধারণ করে তুলেছেন। কবি এখানে প্রচলিত কাব্য-কাঠামোর থেকে সরে গিয়ে নিজের তৈরি পথে হেঁটেছেন।

তারপর যে-তে যে-তে
যে-তে যেতে
একটি নদীর সঙ্গে দেখা
— যেতে যেতে/যত দূরেই যাই

আবার কৌশলী কবি ধ্বনি ব্যবহারে ভিন্ন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন ধ্বনির তরঙ্গ-ভঙ্গ-ঘূর্ণীর মধ্যে দিয়ে। একই সঙ্গে ছন্দের দোলা সৃষ্টি করেছেন। আবার একটি অপূর্ব অনুভূতির আবেশেরও সৃষ্টি হয়েছে। তারই দু'টি দৃষ্টান্ত —

যার হাত আছে তার কাজ নেই
যার কাজ আছে তার ভাত নেই
আর যার ভাত আছে তার হাত নেই
—মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/যত দূরেই যাই

টান বাবা টান। কাঁধে চড়া ভূতেদের
ঠাং ধরে টান । টান টোন টান
টান বাবা টান । চোখ ট্যারা ভূতেদের
চুল ধরে টান। টান টোন টান
টান বাবা টান। কেটে-পড়া ভূতেদের
নড়া ধরে আন। টান টোন টান
—টানা ভগতের প্রার্থনা/বাঘ ডেকেছিল

ধ্বনিগত মিল কবি সাধারণত ব্যবহার করে থাকেন ছন্দবন্ধের (ে ত্রে । কিন্তু এই মিল ব্যবহার বিশিষ্টতায় কোন কোন কবি স্বাভাবিকত্বের গণ্ডি অতিত্র(ম করে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। এ বিষয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম । কবিতায় ধ্বনির মিলের বৈচিত্র্য কবির একান্ত নিজস্ব। কবিতায় ছন্দের খাতিরে সাধারণত যে ধরণের আন্ত্যমিল কবিতা হয়ে থাকে, কবি সে দিকে বিশেষ, দৃষ্টিপাত না করে অন্ত্যমিলে ধ্বনিগত ভিন্নতা নিয়ে এসেছেন। এখানে উচ্চারণগত মিল থাকলেও ধ্বনিসাম্য যথেষ্ট নেই। 'পদাতিক' কাব্যের ' মে-দিবস' কবিতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত --

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।
— মে-দিনের কবিতা/পদাতিক

এখানে 'অদ্য'-এর সঙ্গে 'দুর্বোধ্য'-এর উচ্চারণগত সাম্য থাকলেও ধ্বনিগত মিলের ব্যত্যয় ঘটেছে। কবি সচেতনভাবে এই প্রয়োগ করেছেন । যা প্রচলিত রীতি থেকে সরে আসা । আবার 'বার্তা'-এর সঙ্গে 'আত্মা'-এর মিলের দিকেও ধ্বনিগত বিচলন ঘটেছে।

'হাওয়াই চটি' কবিতায়—অন্ত্যমিলের মিলের অভিনব ব্যবহার দেখাযায় :

আসছি বলে বিদায় নেয়
নিদাঘ
ঠাণ্ডা পিচ শক্ত(হয়ে ধরে রেখেছে বুকে
ভারী চাকার
গভীর সব দাগ
—হাওয়াই চটি/একবার বিদায় দে, মা

এখানে অসম পর্ব বিন্যাস বা অসম পংক্তি(বিন্যাসে অন্ত্যমিল হয়েছে। কিন্তু এর পরেই দেখা যায় চরণে চরণে পরপর মিল-অমিলের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে কবিতাটি এগিয়ে গিয়েছে। যেখানে কবিতার ভাবের দিকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তার মধ্যে, হা অদৃষ্ট, ও কার
জোড়ভাঙা একপাটি
হাওয়াই লাল চটি
ইঁটের দুর্গে গরদ ধ'রে
বন্দী য(
কলকাতার ফ্ল্যাটে
কালের সাজা খাটে
—হাওয়াই চটি/একবার বিদায় দে, মা

শেষ দু' পংক্তি(তে অন্ত্যমিল থাকলেও দুই পংক্তি(র মধ্যে এক পংক্তি(র ফাঁক রয়েছে। এই অসম অন্ত্যমিল বিন্যাস কবিতার শেষ পর্যন্ত চলেছে। আবার কোথাও তিনি কোন পংক্তি(র শেষে পূর্ণচ্ছেদ দেননি ।

আবার 'জোড় কলম' কবিতায় কবি এক চরণ পরপর অন্ত্যমিল দিয়েছেন। যেমন

কথার সঙ্গে কথা কেবল
জুড়লেই তো হয় না

হয় না যেন হাতের শেকল
কিংবা গলার গয়না।
—জোড় কলম/ একবার বিদায় দে-মা

আবার পরপর তিন পংক্তি(র অন্ত্যমিল দিয়েছেন কবি ' এক অস্থায়ী চিত্র' কবিতায়—

বুকের কাছে ফুলের গুচ্ছে
নড়ছে কাছে-থাকার ইচ্ছে
ওঠানো হাত বিদায় নিচ্ছে
— এক অস্থায়ী চিত্র/ এই ভাই

এছাড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবার চরণের মধ্যেও মিল দিয়েছেন ।

ফুল তুলে কেউ যেন আমাকে কাটতে
খাঁড়া তুলে কেউ আমাকে
যেন গন্ধ শোঁকাতে না আসে
—গদির মধ্যে যদি/ধর্মের কল

এখানে প্রথম পংক্তি(র শেষ 'কাটতে' -এর এবং তৃতীয় পংক্তি(র মাঝের 'শোঁকাতে'-এর সঙ্গে মিল দিয়ে এক ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছেন কবি।

রূপতাত্ত্বিক বিচলন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় রূপতাত্ত্বিক দিকেও বিচিত্র বিচলন ঘটেছে। কবি ব্যতিত্র(মী ব্যবহার বিশিষ্টতায় নিজস্বতার পরিচয় বহন করেছেন।

সমাস সমাসবদ্ধ পদের বিচিত্র ব্যবহার করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে কয়েকটি —গোনাগাঁথা, টেবিলঝাড়া, জলছবি, মুখপুড়িটা, মণি-জ্বালা, রহস্যকৌতুক, মিশকালো, শতাব্দীলাঞ্ছিত ইত্যাদি। কবি সুদ্ধু পদের সঙ্গে 'বাড়ি' এবং 'পাড়া' যুক্ত(করে সমাসবদ্ধ পদের সৃষ্টি করে কবিতার পংক্তি(র মধ্যে পর পর ব্যবহার করেছেন। —

তখন অনেক রাত
পাড়াসুদ্ধু বাড়িসুদ্ধু ঘুমোচ্ছে সবাই।
—কাল মধুমাস/ কাল মধুমাস

'ফেরাই' কবিতায় কবি পর পর সমাসদ্ধ পদের প্রয়োগ করে শব্দগত সাদৃশ্যজনিত অনুপ্রাসে আলাদা মাত্রা সংযোজিত করেছেন—

ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ
অপাপবিদ্ধের দল
—ফেরাই/ ছেলে গেছে বনে

বিভক্তি(বিভিন্ন পদে বিভিন্ন বিভক্তি(র ব্যবহারে কবির বিশেষ আগ্রহ ল(্য করা

যায়। কবি যে যে বিভক্তি(র অধিক ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যায়।

'এ' বিভক্তি(অধিকরণ কারক ছাড়াও যে 'এ' বিভক্তি(র ব্যাপক ব্যবহার করা যায়, তার প্রচুর দৃষ্টান্ত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় দেখা যায়।

যখন হাঁটবে
খুব পা টিপে টিপে
পা টিপে টিপে।
—টানা ভগতের প্রার্থনা/বাঘ ডেকেছিল

মিশ্র শব্দে 'এ' -বিভক্তি(র ব্যবহার করেছেন যেমন— রেলিঙে

ধ্বন্যাত্মক শব্দেও 'এ'-বিভক্তি(র ব্যবহার করেছেন —

গনগনে আঁচে জ্বাল দিলেই
টকটকে লাল হবে।
—টানা ভগতের প্রার্থনা/ বাঘ ডেকেছিল

'তে'-বিভক্তি(— 'তে' বিভক্তি(র ব্যববার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন এই পদগুলি — ধমনীতে, টানাটানিতে, হাটতে, চেঁচাতে ইত্যাদি।

কবিতায় একটি প্রয়োগ উল্লেখ যোগ্য —

ম(ভূমির কড়াইতে টগবগ
টগবগ করছে
ফুটন্ত তেল—
—ঘোড়ার চাল/ যত দূরেই যাই

অধিকরণ কারকে 'তে' -বিভক্তি(র ব্যবহার করেছেন কবি নিজস্ব ঢঙে। যেমন— টুপিতে, ওখানটাতে, 'কে' -বিভক্তি(র ব্যবহারে কবি কখনও কখনও বস্তুবাচক শব্দকে ব্যক্তি(সত্ত্বা আরোপ করেছেন। যেমন — ' কলকাতাকে'

প্রত্যয় বিভিন্ন প্রত্যয় প্রয়োগেও কবি বিশেষ স্বতন্ত্র সত্ত্বার পরিচয় দিয়েছেন। কবির বিশেষ আসক্তি(কোন প্রত্যয়জাত শব্দের প্রতি তা বোঝা যায় কবিতায় সেই ধরণের পদের ব্যবহার প্রাচুর্য দেখে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় বিশেষ করে 'লাম', 'ইত' প্রভৃতি প্রত্যয়ের অধিক ব্যবহার দেখা যায়। তারই কয়েকটি উদাহরণ —

'লাম' প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করেছেন—

আমরা জীবনকে নিজের মতো করে
সাজাচ্ছিলাম—
আমরা সাজাতে থাকব। — জননী/জন্মভূমি

'ইত' প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রয়োগে কবি বিশেষ ব্যতিত্র(মী সৃষ্টিকৌশলের দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

যে ধরণের 'ইত' প্রত্যয়যুক্ত(পদের ব্যবহার তিনি করেছেন তার কয়েকটি — কুৎসিত, উদ্বেলিত, উত্তোলিত

শব্দগত বিচলন শব্দ ব্যবহারে কবির স্বাধীনতা আছে। তিনি নিজের মত করে যেমন শব্দ চয়ন করেন , তেমনি শব্দ নিয়ে ভাঙা-গড়াও করে থাকেন(কখনও কখনও শব্দের নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করেন। আবার বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি কবির অত্যন্ত বেশি আসক্তি(থাকে। কবি **সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের** কবিতায় বিভিন্ন শব্দের বিচিত্র ব্যবহার করেছেন, যেখানে কবির নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গির পরিচয় বহন করে।

প্রথমেই বলা যায়, একই শব্দের পর পর বারবার ব্যবহার কবির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট। তবে একই শব্দ ব্যবহারে অর্থের দিক দিয়ে যে আলাদা আলাদা মাত্রা বহন করছে তাই নয় , কবির ব্যবহার-বৈচিত্র্যও বলা যায় অভিনব ব্যতিত্র(ম। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ধরণার্থে আমি তবু পদাতিক (হাতে বাজছে রণবাদ্য দ্রিমিক দ্রিমিক—
— ছেলে গেছে বনে/ছেলে গেছে বনে
বহুত্বার্থে ঝরাতে ঝরাতে যাব সারা রাস্তামাঠের শিশির, —ছেলে গেছে বনে
বিষয়ার্থে বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে /এই কথা কানে এল—
—মেজাজ/যত দূরেই যাই

অবস্থার্থে ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে,
মালা
জমে জমে পাহাড়
ফুল জমতে জমতে পাথর —পাথরের ফুল/যত দূরেই যাই

কার্যার্থে বাঁদিকের বুক-পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়-হায়
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল
—লোকটা জানলই না/যত দূরেই যাই

একই শব্দের বহু ব্যবহারের কবির একান্ত নিজস্ব প্রয়োগ দেখা যায় 'যা রে কাগজের নৌকো' কবিতায় — যখন আমি জন্ম নেব বলে
জল ভাঙছি, জল ভাঙছি,
জল ভাঙছি, জল
—যারে কাগজের নৌকো/ যারে কাগজের নৌকো

কী অদ্ভুদ শব্দ প্রয়োগ এখানে, কোন ভারি বা দুর্বোদ্ধ শব্দ নেই কিন্তু কবির শব্দ প্রয়োগ কৌশলে এক অপূর্ব দৃশ্য চিত্রের সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে সন্তান জন্ম নেওয়ার

সময়ের দীর্ঘতা যেমন বোঝানো হয়েছে , তেমনি মায়ের কষ্টের কথাও কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কবির বহু কবিতায় এই ধরণের শব্দ ব্যবহার দেখা যায়। তার আরও একটি দৃষ্টান্ত — সেই ধূপ, সেই ধুনো, সেই মালা, সেই মিছিল—
রাত পোহালে
সভা টভাও হবে। —পাথরের ফুল/যত দূরেই যাই

শুধু একটি শব্দে দু'বার ব্যবহার করে যে এমন অব্যক্ত(কথা বলা যায়, পাঠক-স্রোতার কাছে এমন দৃশ্য চিত্র তুলে ধরা যায় তা 'মেজাজ' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন—
'বউ বলছে 'একটা সুখবর আছে।'
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
— মেজাজ/যত দূরেই যাই

শব্দের (ে ত্রে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বড় ব্যতিত্র(মি ব্যবহার হল কোন শব্দের সঙ্গে তার পিষ্টক শব্দের প্রয়োগ। পূর্ববঙ্গীয় সাধারণ মানুষের কথ্যভাষায় এমন ব্যবহার দেখা যায়। তারই কয়েকটি শব্দজোড় — লেখা-টেখা, সংসার-টংসার ইত্যাদি।

বাংলার আদর্শ শব্দরূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কবি কখনও কখও অদ্ভুত ভাবে একেবারে গ্রাম্য আটপৌরে শব্দের ব্যবহার করছেন। কিন্তু কোথাও কোন বেমানান বলে মনে হয়না। এমন কয়েকটি শব্দ হলো— সুয়োরাণীলো, কলকাত্তাওয়ালি, আলটাক্‌রা ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারকে কবি নিজস্ব রীতি ব্যবহার করেছেন। যেমন অনেক কবিতায় তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের যুগ্মব্যবহারের জায়গায় আলাদা করে ব্যবহার করেছেন। যেমন 'আমরা যাব' কবিতায় কবি লিখেছেন —
জলের কলে টিপ্ টিপ্
টিপ্ টিপ্ —আমরা যাব/ফুল ফুটুক

অনুরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার কবি কবিতার নামকরণেও ব্যবহার করেছেন, যেমন 'ফুল ফুটুক' কাব্যের দু'টি কবিতার নাম ' ড্যাং ড্যাং ক'রে' এবং ' লাল টুকটুকে দিন' আবার কখন তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈতের মাঝখানে একটি হাইফেনের ব্যবহার করে গঠনগত ভিন্নতা তো এনেছেন যা ধ্বন্যাত্মক শব্দের অভিনব ব্যবহার । সেই সঙ্গে অর্থের দিক দিয়েও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের
নীল ঘাগরা।
যেতে যেতে —যেতে যেতে/যত দূরেই যাই

উঠোনে খেলে বেড়ায়
একা একা
হাতের লাঠির ঠক ঠক
আর গাছের পাতার
টুপটাপ শব্দ। 'এসো হে'
—এসো হে/ যারে কাগজের নৌকা

আবার ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ কবির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট । কারণ কবি অনেক কবিতায় এমন ব্যবহাব করেছেন।

টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর
বাজছে কারও পায়ের নূপুর
—যা রে কাগজের নৌকা/যারে কাগজের নৌকা
সেও এক ব্রিজ-ই
ওপরে টমটম যায় গুড়-গুড় গুড়-গুড়
হিজিবিজি হিজিবিজি, —কাল মধুমাস/ কাল মধুমাস

শব্দ ব্যবহারে কবিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয় । কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও যে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতার স্বাভাবিক চলার ছন্দকে অটুট রেখে কবি শব্দ চয়ন করেছেন সে কথা বলা যায়। কিন্তু ভাব প্রকাশের জন্য প্রয়োজনমত শব্দ ব্যবহারেও কুণ্ঠিত হননি। সে ে(ত্রে কবি মিশ্র শব্দের অকপট ব্যবহার করেছেন। যেমন— আলো নেভানো । চোখ বন্ধ।
দেখতে পাচ্ছি সবই।
কাঠের বাক্স পোকায় কাটছে
পুরনো গ্রুপছবি।

এখানে কবি মিশ্র শব্দ 'গ্রুপছবি' ব্যবহার না করে অন্য কিছু শব্দ নিয়ে এলে বেমানান হয়ে যেত।

বাক্য প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়ম মেনে বাক্য বন্ধ করার বাধ্যবাধকতা যে কবিদের না থাকাই স্বাভাবিক । কিন্তু কবিরা বাক্য ব্যবহারে তারই মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতা এখানে যে, তাঁর কিছু বাক্য ব্যবহার ধরন দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, এটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা । যেমন একই শব্দ বা প্রায় একই ধরণের শব্দ তিনি একই বাক্যে এমন ভাবে ব্যবহাব করেছেন যে, সেখানে কেবল বাচনিক ভঙ্গির অভিনবত্ব এসেছে তা নয় কবির বাক্য ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন— ঘরের বাইরে , বাইরের ঘরে
শিশিরে শ্রাবণে

জল বৃষ্টিতে তুফানে ও ঝড়ে
সভায় বা নির্জনে — ঘরের বাইরে, বাইরের ঘরে

কবিতার নামেও 'ঘরের বাইরে, বাইরের ঘরে' আবার ' একটু পা চালিয়ে, ভাই' কবিতায় একই শব্দের ঘূর্ণিপাক ঘটেছে এইভাবে—

বড়বাবু বললেন, আমি বললাম,
আমি বললাম, বড়বাবু বললেন,
শেষকথা বলবেন আপনারা ।
বলতে বলতে
বলতে বলতে
মুখে ফেনা বেরিয়ে গেল
—একটু পা চালিয়ে ভাই/একটু পা চালিয়ে ভাই

এছাড়া আরও একটি দিকে বিচলনের নিরিখে আলোচনা করা যায়, তা হলো কবিতার আঙ্গিকগত দিক। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিচিত্র আঙ্গিকের কবিতা লিখেছেন। কবিতার নামে তিনি অঙ্ক সংখ্যার ব্যবহার করেছেন। যেমন 'পদাতিক' কাব্যের একটি কবিতার নামে কিছটা কথা কিছুটা অঙ্ক সংখ্যা যেমন — 'প্রস্তাব ১৯৪০' তারপর কবিতার আভ্যন্তরীণ গঠনেও কবি অভিনবত্ব এনেছেন । কবিতার শু(হয়েছে আবেদন নিবেদনের মধ্যে দিয়ে — প্রভু, যদি বল অমুক রাজার সাথে লড়াই
—প্রস্তাব ১৯৪০/ পদাতিক

পরের সাত পংক্তি(তে সাধারণ প্রজাদের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় স্তবকের শু(হয়েছে এইভাবে — হে সওদাগর, —সেপাই, সান্ত্রি সব তোমার।
—প্রস্তাব ১৯৪০/ পদাতিক

এই কাব্যের আর একটি কবিতা 'অত পর' একেবারই আবেদন পত্রের আঙ্গিকে লেখা — সম্পাদক সমীপেষু,
মহাশয়, ইতস্তত ভূসম্পত্তি আছে নিম্নস্বা(রকারীর।
এ-দুর্দৈবে জমিদারি র(া দায়।
বংশপরাম্পরাগত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভুবনে
ঈ(ের চালান, চলি। —অত পর/ পদাতিক

পংক্তি(বিন্যাস গদ্যের মত এবং প্রসঙ্গান্তরে প্রায় দুই পংক্তি(র পর পর অনুচ্ছেদ দিয়ে লেখা হয়েছে। কবিতার শেষটাও হয়েছে চিঠি-সমাপ্তির আদলে —
এ বিষয়ে পত্রপাঠ যুক্তি(চাই।
ইতি। বঙ্গচন্দ্র পাল । ঢাকা।। —অত পর/ পদাতিক

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষার দিকের বিচলন বা বিচ্যুতির দিকটি

আলোচনার প্রে(তে বলা যায়, কবিতার মধ্যেই কবির স্বাধীন স্বকীয় আত্মপ্রকাশ ঘটেছে । কবি এ (ে ত্রে সচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। কোথাও কোন বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ থাকেননি। যেখানে যেমন অনুভূত হয়েছে কবি সেখানে তেমনভাবেই সেই ভাবের প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত কাব্য-কাঠামোর বাইরে যেতে কোন ভাবেই দ্বিধাবোধ করেননি। তাই তাঁর কবিতায় এত বেশি ভাঙা-গড়ার নতুন নতুন রূপ আমরা দেখতে পাই। কবি এই স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গির জন্যই আলাদা ভাবে পরিচিতি লাভ করেছেন এবং আপন শৈলীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ২০০৮, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২। অভিজিত মজুমদার, ২০০৭, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

৪। বিপ্-ব চত্র(বর্তী, ২০০৩, শৈলী চিন্তাচর্চা (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা

৫। অপূর্বকুমার রায়, ২০০৬, শৈলীবিজ্ঞান, দে'জ, কলকাতা

৬। অচিন্ত্য বি(াস, ২০১০, কবিতার শৈলী, (৩য় সংস্করণ) বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৭। রামে(র শ', ১৯৮৭, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৮। বুদ্ধদেব বসু, ১৯৯৮, আধুনিক বাংলা কবিতা (সম্পা) এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

৯। পবিত্র সরকার, ২০০১, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, ২য় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা

১০। নারায়ণ হালদার, ২০১৫, ভাষা ও সংস্কৃতি (সম্পা), ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, নদীয়া

১১। বাসুদেব হালদার, ২০১৩, অমিয় চত্র(বর্তীর কবিতা ভাষাশৈলী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

১২। N.E. Enkvist,1964, On define style: an essay in applied linguistics'in: J. Spencer,

■ বাসুদেব হালদার—গবেষক

মধুশ্রী সেন সান্যাল

আধুনিক কবিতা ঃ মেয়েদের কলমে

মহিলা কবি, এমন শ্রেণিবিভাজনে আজকের দিনে আপত্তি থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু উনিশ শতকের পটভূমিতে 'মহিলা কবি' শব্দ দুটির গুরুত্বই ছিল আলাদা। পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে তখন কবিতায় মেয়েদের অনুভবের স্ফূরণ, এতটা অনায়াস সাধ্য ছিল না। কিন্তু আধুনিক কবিতার ইতিহাসে, পালাবদলের ধারাটি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল মেয়েদের কলমেও। উনিশ শতকের শেষে নারী প্রতিমার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নারীসত্তার অঙ্কুর। রেনেসাঁ-ঋদ্ধ বাংলায় ভেতর বাড়ির অন্ধকার থেকে কোলাহল মুখর সদরের আলোয় এসে দাঁড়ালেন মেয়েরা। যদিও সাহিত্যে সর্বপ্লাবী পুরুষ স্রোতের আধিপত্যে, তাঁদের সেই গন্তব্যে পৌঁছনোর যাত্রাপথ নেহাত মসৃণ ছিল না।

মেয়েদের পাঠ, পুরুষ পাঠের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। আলাদা এই কারণে, মেয়েদের অভিজ্ঞতার ভাষা ও চেতনা তো তাঁদের নিজস্ব। বিশ শতকে পৌঁছে দেখা যায় মেয়েদের কবিতায় এক অন্য উত্তরণের ছবি। মেয়েরা কবিতার দর্পণে নিজেদের প্রকৃত প্রতিবিম্ব দেখতে চাইলেন। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারীবীক্ষা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হতে চাইল। আদর্শ নারী প্রতিমার নীচে এতদিন চাপা পড়ে ছিল রক্তমাংসের মেয়েদের বাস্তব অবস্থান। তাই পুরুষের তৈরি মায়ায় আর বিভ্রান্ত হতে চাইলেন না তাঁরা। ততদিনে উন্নত প্রতীচ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘোষণা করেছে ঃ 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে একটু একটু করে নারী হতে প্ররোচিত করে।' বিশ শতক, মেয়েদের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে এল।

ইতিমধ্যে কবিতার ইতিহাসে বিস্তর পালাবদল ঘটেছে। বাংলা কবিতার আধুনিকতা-অভিমুখী বিবর্তনে 'কল্লোল' পত্রিকার অপরিসীম অবদানের কথা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয় দশক থেকে কবিতা চরিত্রগুণে বদলে যেতে থাকে। হয়ে যায় সাম্প্রত সময়ের সহচর। মেয়েদের কলমেও লাগল নতুন দীপ্তি। তবে প্রারম্ভিক পর্যায়ে মেয়েরা গদ্যে যতটা আত্মপ্রকাশ করেছিল, কবিতায় নয়। চারের দশকে রাধারাণী দেবী ও পরে বাণী রায় ছাড়া মেয়েদের কবিতাচর্চা ছিল নানা পত্রিকার পাতায় সীমাবদ্ধ। তবে মেয়েদের কবিতার পালাবদলের ইতিহাসে বিষয়-ভাবনায় যেমন পরিবর্তন এল, রূপান্তর ঘটল প্রকরণেও। বদলে গেল জীবনকে দেখার ভঙ্গি, ভাবনাচিন্তা, কবিতার উপজীব্য, শব্দচয়ন এবং ছন্দ-আঙ্গিক। এদিকে প্রগতি, কল্লোল, কালিকলম পত্রিকায় আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ কবিরা লিখে চলেছেন অন্য মেজাজের কবিতা। কোনো মেয়েদের কলমে তখনও তেমনভাবে ছায়া ফেলেনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের সেসব

উচ্চারণ। কারণ সময়টা তো সহজ ছিল না, নানা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে মেয়েরা লেখালেখি করেছেন। নিজের মতো করে মুক্ত মনের পৃথিবীর কথা বলতে চাইলেও, বলতে পারেননি তাঁরা। তাই তো রাধারাণী দেবীকে 'অন্দরমহলের চেয়েও কঠিনতর পর্দানসীন হয়ে অপরাজিতা ফোটাতে হল।' অপরাজিতা দেবী বাংলা সাহিত্যে সত্যিই অদ্বিতীয়া। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংস স্বীকৃতি দিয়ে নতুন নতুন বিশ্লেষণে এই অজানা কবিকে চিঠিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এমনই এক আবহে পাঁচের দশকে রাজলক্ষ্মী দেবী এলেন, কিন্তু তরতাজা ও অন্য ঘরানার কবিতা নিয়ে। তাঁর লেখার সূত্রপাত অবশ্য চল্লিশের দশকেই। অফুরান প্রেমের কবিতা আনাগোনা তাঁর কাব্যভুবনে। ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ উত্তাপে প্রেম কখন এসে নরম অনুভূতির জমি আঁকতে ধরে যা তাঁর ভাষা ব্যঞ্জনাকেও আকুল করে তোলে ঃ 'এ তুমি কী করলে! আমি পপিফুল ভালোবাসতাম।/কোথা থেকে তার মধ্যে এনে দিলে আমিষ মৌতাত।/ যত দূরেই যাই, তবু স্নায়ু কাটে নেশার করাত।' জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে মৌল অনুভূতি সঞ্জাত ভাষ্য, গভীর গোপনে তাঁর কবিতায় সংযোজন করেছে অন্যতর মাত্রা ঃ 'কালসমুদ্রে ফুটোর মতন ভাসছি ডুবছি ডুবছি ভাসছি/ কালসমুদ্রে ভাসছি বোতল, পেটের চিট্‌টা প্রাণের ভাষা।' জনৈক সমালোচকের মতে ঃ 'তিনিই প্রথম কবিমেয়ে যিনি বাংলায় প্রথম আধুনিক কবিতা লিখলেন, অনুভব করলেন বাংলা কবিতার জগতে সেই যুগান্তের যা পুরুষকবিরা বেশ কিছু বছর আগেই অনুভব করতে শুরু করেছিলেন।' (রাজলক্ষ্মী দেবী ঃ ভাস্বতী রায়চৌধুরী, কবিসম্মেলন জুন ২০০৫)।

পঞ্চাশের দশকে নারী মাধুর্যের মোহাঞ্জন মুছে ফেলে সত্যের পরাক্রমী উচ্চারণে যিনি কবিতার মঞ্চে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন, তিনিই কবিতা সিংহ। পুরুষ সর্বস্ব জগতকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি গড়ে তুললেন এক ঈপ্সিত জগতের বিকল্প ছবি। এত সাহসী উচ্চারণ, এমন প্রতিবাদের ভাষা তখন সত্যিই বিরল ছিল। একটি ক্রুদ্ধ প্রতিবাদী মেয়েকে আমরা বারবার খুঁজে পাই তাঁর কবিতায় ঃ

জ্বলন্ত রমণী চলে যায়, বিদ্যুৎ বল্গায় টান
গ্রীবা ঘোরে।
অগ্নিহ্রেষা তোলে অশ্ব ক্রোধ বহ্নিময়
ক্ষুরে ক্ষুরে উল্কারেখা ছুঁড়ে দেয় উগ্র খর ঘৃণা।
স্ফীতনাসা হল্কা ঢালে, হাই করে ফুলের দ্রাঘিমা
অনলবার্ষিণী যায়, তীব্র অশ্বে শুশ্রুষার, নাগালের সম্পূর্ণ বাহিরে।
(জ্বলন্ত রমণী চলে যায়)

সমকালে ও বাস্তবকে ছুঁয়ে এই কবি কবিতার মর্মে তুলে এনেছেন অনাগতের কথা, মানবী বেদনার দলিল। 'হরিণা বৈরী' তাঁর এক বহু আলোচিত কবিতা। এখানে

চিত্রকল্পের অভিনব আস্বাদ ভাবনার সঙ্গে ভাষাকেও তীব্রতা দিয়েছে। তাঁর কাব্যে ঈশ্বর নেই, আছেন ঈশ্বরী যিনি একা, যিনি নিরীশ্বর। অগ্রজ কবিদের গণ্ডি ভেঙে, প্রচলিত ছকের ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে এসে, তিনি ভাবনায় ও ভাষায় গড়ে তুলেছেন এমন এক চেতনাবিশ্ব যা পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দিয়েছে নতুন আলো।

নবনীতা দেবসেন পারিবারিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত সাহিত্যিক উত্তরাধিকার এবং এক স্বতন্ত্র ঘরানার বাঞ্ছিত আবেদন নিয়ে কবিতার জগতে এলেন পঞ্চাশের দশকে। আপাত নিরুত্তাপ স্বরে ব্যক্তিক অনুভবের আন্তরিক ভাষ্য তুলে এনে, নবনীতা কবিতায় গড়ে তোলেন নারীর নিজস্ব পৃথিবী। সেই দশকে, পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ পরিসরে নবনীতা মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্বেষণ করেছেন প্রেমের একান্ত স্বরূপ। ফিরে তাকাই একটি মন্তব্যের দিকে ঃ "প্রথম প্রত্যয়' পড়ে ভুল ভাঙল। প্রেমের এমন মেয়েলি উচ্চারণ, পুরুষদের প্রেমের কবিতা থেকে এমন পৃথক, খুব বেশি চোখে পড়ে না। প্রথম কবিতা 'আরোগ্য' থেকেই আমাদের অনুভবে সঞ্চারিত হয়ে যায় প্রেমের সেই বৈশিষ্ট্য। দয়িতের আরোগ্য কল্পনা করে কবিতার কথক দিতে চায় তার বিগত বছরের 'মরা পাখির মমতা' আর 'আগামী বছরের কলা গাছটার স্বপ্ন'। এই দিতে চাওয়া কি জানিয়ে দেয়না কথকের নারীসত্তা?" (নবনীতার কবিতা ঃ সুতপা ভট্টাচার্য, একান্তর বইমেলা ২০১১) প্রেমের পাশেই থাকে বিরহ, বিষাদ এবং যন্ত্রণার ছবি যা নারী হৃদয়ের গহন থেকে উঠে আসা হাহাকারের কালো ধোঁয়ায় বিহ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর সাম্প্রতিক উচ্চারণ আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় আরও মিতকথনের দিকে, শব্দাতীত এক শিল্পের জগতে ঃ 'বিষজলে গলা অবধি ডুবে আছি, প্রিয়/ তারই নাম স্নান হয় যদি/তবে তো আমার মতো/ যোগমুদ্রা শেখেনি যোগীও।' (স্নান) গদ্যের অমোঘ হাতছানিকে তিনি উপেক্ষা করতে না পারলেও, অতিরিক্ত গদ্যের ফলন তাঁর কবিতসৃজনে কোনও তারতম্য ঘটাতে পারেনি।

সময় এগোয়, সমাজ এগোয়, কবিতাও। ছয়ের গোড়ায় রাজনৈতিক ডামাডোলের আঁচ যতটা পড়েছিল পুরুষের গায়ে, মেয়েরা তখন ততটা বাইরে ছিলেন না। কিন্তু ছয়ের দশকে সারা পৃথিবীতে ঘটে যাচ্ছিল মানবীচেতনাবাদের উজ্জীবন। তাই এই দশকের মধ্যভাগ থেকেই বাংলায় মেয়েদের কবিতার প্রেক্ষাপটে এল এক আমূল পরিবর্তন। নারী অস্তিত্বের বাস্তবতাকে একেবারে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরলেন যিনি কবিতা বিন্যাসের নানা স্তরে, তিনি দেবারতি মিত্র। এই কবির এমনই এক অন্যস্বাদ মানস জগৎ আছে, যেখানে চেতন ও অবচেতনের সুনিবিড় মিশ্রণে গড়ে উঠেছে শব্দ-স্পর্শ-দৃশ্যের এক আলাদা জগৎ, যার ভেতর থেকে কবিতায় জেগে ওঠে প্রেম-অপ্রেম। সংশয়, বিষাদ, একাকিত্ব ও মৃত্যুচেতনার নানা অনুষঙ্গ। দেবারতি স্বপ্নপ্রতীকের অন্তরালে কবিতায় ক্রমে ফুটিয়ে তুললেন মেয়েদের অন্তর্লোকের যাবতীয়

নির্যাস। সেই সময় তিনি বুঝেছিলেন যে মেয়েদের ব্যক্তিগত পরিসরগুলি কবিতায় উপস্থাপন করতে হলে তাঁকে ভাঙতে হবে পরিচিত ভাষার গণ্ডি। সংকেতময় গূঢ়ভাষ্যে তিনি কবিতায় নির্মাণ করলেন এমন অনবদ্য সব চিত্রকল্প যা পুরুষ-পৃথিবীর কাছে এতদিন সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল ঃ 'চুপিচুপি গুঁড়ি মেরে তুমি টাইগার ঘাসে ডুবে/গুমরানো শিকড়ের গতিবেগ ছুঁয়ে দেখ/ আমার গভীরে—/কতখানি জেগে থাকা, কতখানি ঘুম—/পদ্মগোখরোর শিস একটানা নিষ্ঠুর নিঃঝুম'। (পদ্মগোখরোর শিস) নারীর শাশ্বত অনুভূতি, তার লিবিডোকে এক অভিনব আঙ্গিকে বয়ন করলেন কবিতার শরীরে। বাস্তবের নঞর্থক অন্ধকারও তাঁর পরিবেশনার গুণে নানা উচ্চারণে যেন পরীকথায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতাপাঠে অদ্ভুত এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয় মন। ব্যক্তিগত ভাবনার স্নিগ্ধ মাধুর্য তাঁর সৃজনশীলতার অনন্য সম্পদ। তাঁর কবিতায় নারীবাদের দ্রোহ নেই, বরং আছে আন্তরিক সমর্থন ও সহমর্মিতার কথা। মানবীজন্মের সমাজ আরোপিত সমস্যার এক অনবদ্য আলেখ্য পেশ করেছেন। তিনি কবিতায় আপাত নিস্তরঙ্গ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ঃ

বিশ্বের সমস্যা পূরণের ভার
তোকে দেওয়া হয়নি, পুঁটি।
ভারতবর্ষ বোমা বানাবে কিনা
আমেরিকা ভিয়েতনাম ছাড়বে কবে
অটোমেশনের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর জরুরি—
এসব ভাবনা তোর নয়।
....
তুই তোর ঘর গুছিয়ে নে
প্রদীপের সলতে পাকা
মনে রাখিস পুঁটি
এই তোকে ছেলে মানুষ করতে হবে
ধিঙ্গিপনা তোকে কি সাজে, ছি! (পুঁটিকে সাজে না)

কেতকী কুশারী ভাইমন এই দশকেরই সেই বিরল ও ব্যতিক্রমী স্রষ্টা, যিনি ইংরেজি ও বাংলা, দুই ভাষাতেই সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতায় তাঁর বিষয় ভাবনা বহুধা বিস্তৃত, অন্য এক জগতের অনুভব নিয়ে এলেন উচ্চারণে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন পরিদৃষ্ট হয় তাঁর ভাবনাপটে, নানা বর্ণমালায় ফুটে ওঠে নারীর অবরুদ্ধ যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। মেধায়, বৌদ্ধিক চর্চায় ও শ্লোকের গাম্ভীর্যে কবিতা বিশ্বে এক অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন গীতা চট্টোপাধ্যায়। ষাটের দশকেই যাঁর লেখালেখির সূচনাপর্ব। তাঁর

রচনা বাংলা কবিতার সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরসূরী। সেই দশকে নারী-কলমের এই বৈদগ্ধ্যে বিস্মিত হয়েছিলেন অনেকেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ত্যাগ ও যন্ত্রণার ভার বহন করে চলেছে নারী, তাকে যথার্থ অনন্যতায় তিনি পরিবেশন করেছেন একটি কবিতায় 'খ্রিস্টকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল এক গাধা/ জেরুজালেমের পথে, আমিই কি তা থেকে আলাদা?' এ হল সেই বিকল্প স্বর যা নারীকে তার প্রকৃত স্বরূপকে আবিষ্কার করতে চাইছে। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষ্যের আড়ালে কোথাও-কোথাও লুকিয়ে থাকে শ্লেষ কিংবা কৌতুকের আভাস।

বাতাবরণে পালাবদল ঘটে, কবিতা ক্রমশ পালটে যেতে থাকে শরীরে, মননে, মেজাজে। শেষ ষাট থেকে মধ্য সত্তর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে অতুল রক্তস্রোত। রাজনৈতিক ঘোলাজল স্থির থাকেনি, জটিল আবর্তের দিকে এগিয়ে গেছে। অথচ নারী উপলব্ধির যে জগৎ ষাটের মধ্যভাগে উন্মোচিত হয়েছিল। সাত ও আটের দশকেও তার বিন্যাস একই থেকেছে। প্রথাগত পিতৃতন্ত্রের পরাক্রমের বিরুদ্ধে মেয়েদের লেখায় তখন এক নিজস্ব পরম্পরা ক্রমশ গড়ে উঠেছে। সেই উত্তরাধিকারেরই বারুদ, সত্তরের দশকে প্রজ্বলিত হতে দেখি কৃষ্ণা বসুর সৃষ্টির চিত্রপটে। মেয়েদের প্রতি যুগান্তরের অবিচার, অসম্মান ও অত্যাচারের বিক্ষত কাহিনি সচেতনভাবে দানা বাঁধে তাঁর ভাবনাভূমিতে। অনিকেত মেয়েদের কথা, তাঁর কবিতার একটা বিরাট অংশ অধিকার করে আছে। গার্হস্থ্য জীবনে নানা জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে মায়ামমতার প্রলেপে মেয়েরা তৈরি করে যে ঘর, সেই ঘর কি কোনোদিন তার নিজের হয়?

মাগো, আমি কার কাছে যাবো?
নাকি, মুখ বুজে, মার খেয়ে রান্না করে
সেবা করে, 'রমণীতরন' হয়ে জীবন কাটাবো?
মাগো বলো, আমার নিজের বাড়ি কোনখানে আছে?
মেয়েদের নিজেদের বাড়ি থাকে কোনওদিন? (একটি সামান্য চিঠি)

এমনই সব ছবি, আক্রান্ত হাহাকারের টুকরো, রক্তক্ষরণের নানা নেপথ্য কাহিনির মধ্যে ধরা থাকে তাঁর মৌলিক উচ্চারণের এক একটা প্রতিধ্বনি।

সত্তরের আরেক প্রতিভাময়ী কবি রমা ঘোষ। অন্ধকার পার করে তাঁর কবিতা, পাঠককে মানব অস্তিত্বের বর্ণময়তার দিকে নিবিড়ভাবে টেনে নিয়ে যায়। নারীর নিজস্ব অনুভব নিয়ে তাঁর কবিতাভূমির এক প্রান্তে থাকেন মা: অন্যদিকে সেই বাঞ্ছিত কন্যা যে তাঁর বৈরাগ্যবাসের অবসাদ নিমেষে ঘুচিয়ে দিতে পারে 'তোমাকে ধরতে চাই রোদ বৃষ্টি জ্যোৎস্নার মায়ায়/মেয়ে না থাকলে বাড়ি মানায় না, খাঁ খাঁ কুয়োতল,/মেয়ে তো শ্রাবণ মাস, ফুল ফোটে কদমের ডালে।' এই দশকের বিশিষ্ট কবি অনুরাধা মহাপাত্রের নারীত্ব বোধ প্রখর, কিন্তু কবিতায় তা উচ্চরোল নয়। তাঁর চেতনায় যেন অবচেতনের

সমারোহ। সমাজের অভ্যন্তরীণ ক্ষত যেমন একাধারে তাঁকে অস্থির করে তোলে, আবার নারী জীবনের বঞ্চনার ইতিবৃত্তকে শিল্পিত সূক্ষ্মতায় কবিতার দেহে বিন্যস্ত করে, তাতে ফুটিয়ে তোলেন নানা আর্ত-অসহায়তা! অভ্রান্ত এক কবিতা ভাষা নিয়ে অনুরাধা অর্জন করেছেন এমন এক স্বাতন্ত্র্য, যেখানে তাঁর নিজস্ব ঘরানা আর অপ্রকাশ্য থাকে না। নমিতা চৌধুরী, জয়া মিত্র, দেবাঞ্জল মুখোপাধ্যায় এই দশকের অন্যান্য উজ্জ্বল প্রতিভা। নমিতা চৌধুরীর সহজ সরল উচ্চারণের আড়ালে থাকে এক সমাজমনস্ক নারীর দরদি মন। 'ঝুলনযাত্রা' তাঁর এক স্মরণীয় রচনা, যেখানে রাধা নামের দরিদ্র ঘরের একটি মেয়ের, কৃষ্ণের সঙ্গে দোলার আকাঙ্ক্ষা এক অদ্ভুত, করুণ পরিণতি পায়। জয়া মিত্র তাঁর সাহস ও অঙ্গীকারের জন্য সকলের শ্রদ্ধেয়। মননে, প্রজ্ঞায় তিনি এক স্বতন্ত্র পরিসর রচনা করেছেন কবিতার ভূমিতে। দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের কবিতা অসাধারণ ব্যঞ্জনায় ও ধ্বনির শ্রুতি মাধুর্যে পাঠককে মুগ্ধ করে। স্বপ্লায়ু এই কবির, অনবদ্য শব্দ প্রয়োগে ও অনন্য চিত্রকল্পের উপস্থাপনায় অভিভূত হয় মন। মেয়েদের কলমে এমন শক্তিশালী লেখা নিঃসন্দেহে বিস্মিত করে। পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় অনেক বেশি নারীকণ্ঠের উচ্চারণ পাওয়া যায় আশির দশকে। মেয়েদের কবিতায় এমন স্বরবহুল দশক আগে আমরা পাইনি। প্রজ্ঞার ঘনতায়, প্রতীকের নানাবিধ বুননে এক ঝাঁক মেয়েরা কবিতায় নিয়ে এলেন এক অন্যরকম আবহপট। আশিতে দাম্পত্যে অনিশ্চয়তা, সম্পর্কের ভাঙন কবিতায় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। এই দশকের প্রধান অস্ত্র কটাক্ষ। মেয়েদের লেখার পরম্পরায়, আলাদা অভিজ্ঞান নিয়ে এই দশকে কবিতা জগতে এলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। কবিতা তাঁর কাছে নিজেরই তৈরি বসবাসের এমন এক জগৎ যা একটু বেশি মাত্রায় নারী পরিসর গ্রহণ করলেও, মূলত সামাজিক নানা অন্ধকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার উচ্চারণভূমি! নারী মহিমার সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক কত গভীর ও চিরন্তন, সেই বোধের বিস্তৃত ব্যাপ্তি তাঁর কবিতাকে অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে। তিনি প্রকৃতই সেই কথামানবী, ঋগ্বেদ থেকে একুশ শতকের ভারতবর্ষকে ছুঁয়ে যাঁর কবিতার বিস্তারঃ

যুগ যুগ ধরে পথে পথে আমি হাঁটছি
আমি কল্পনা চাওলার থেকে কুন্তী
সীতা থেকে রূপ কানোয়ারে আমি, আমরা....
সরস্বতীর তীর থেকে আমি মেধা পাটেকরে লড়ছি...
আমি দ্রৌপদী, রূপান বাজাজ আমরা
আমার বস্ত্রহরণ চলেছে হস্তিনাপুরে, হাওড়ায়
বুক ফাটে মুখ ফোটে না আমার এখনও (কথামানবী)

আলাদা ঘরানার বাক্‌শৈলী নিয়ে এই দশকে চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের পথ চলা শুরু। পুরুষতন্ত্রের একতরফা লিঙ্গ-রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন করতে, প্রতিবাদের পটভূমিতে

দাঁড়িয়ে গহীনকে ভাষ্যপাঠ আয়ত্ত করেছেন তিনি। সকলের হয়ে লিখেছেন শেকল পরানো হাতের দ্রোহকথা ঃ 'শিকল কখনও পুরো হত্যা করে না, শুধু/রক্ত ঝরায়।" বিয়ের বাজারে পণ্যায়িত মেয়েদের যন্ত্রণাময় আলেখ্য, নানা মাত্রায় পরিব্যপ্ত হয়েছে তাঁর উচ্চারণে!

সুতপা সেনগুপ্ত আশির বিশিষ্ট কবিদের অন্যতমা নারী হিসেবে কোনো শ্রেণিভেদকে গুরুত্ব না দিলেও তাঁর কবিতায় ঝিলিক দিয়ে যায় মেয়েলি জীবন ভাষ্যের ইশারা। কখনও মেধাবী আত্মসম্ভ্রমবোধ এগিয়ে যায় যন্ত্রণার দিকে, যার অনিবার্য পরিণতি শ্লেষ ঃ 'ধীবর তোমার মারণ জালে/অনেক বছর আগেই আমি/ গোপনে এক ছিদ্র করেছিলাম।' তাঁর কবিতার স্বতন্ত্র নির্যাস পাঠককে রুদ্ধবাক করে তোলে। আশির আরেক শক্তিমান কবি সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির গভীর অন্তর্মুখীনতায় আমরা অভিভূত হই। নিজস্ব ভাষাকৌশল ও শব্দছবি তৈরি করে স্তর থেকে স্তরান্তরে নিয়ে গেছেন তিনি কবিতার পটভূমি, সমস্ত প্রচলিত ভাবনা ও বিশ্বাসকে চুরমার করে। এমনকি বিবাহের বিশেষ স্মারকচিহ্নও সেখানে নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে যায় ঃ 'আমার সিঁদুর কৌটো আয়নাসারির ফাঁকে ওই, প্রিয়, /টুপ ডুবে গেল।' অন্য মাত্রিক স্বরায়নে এই দশকেই কবিতায় এলেন অঞ্জলি দাস, একটু আলাদা পথে হেঁটে কবিতায় নিয়ে এলেন বন্ধনমুক্তির কথা। আদিকাল থেকে বয়নশিল্পে সিদ্ধহস্ত মেয়েদের কথা কবিতায় এসেছে এভাবে ঃ 'আমরা আগুনে মেলে দিই আমাদের তাঁত বোনা স্বপ্ন সম্ভার।' সঞ্চয়িতা কুণ্ডুর কবিতার ভাবনাভূমি ভিন্নস্বাদের। রাজনৈতিক আলোড়নে বিভ্রান্ত বৃহত্তর সমাজের কথা অসাধারণ দক্ষতায় তিনি তুলে ধরেছেন কবিতা ঘোষণায় ঃ 'নীচে শুয়োর ছানাদের সাথে নুলো মানুষের বাচ্চারাও /প্রগতির উল্টোপিঠে জেনে নেয় কচুর স্বাদ।' পেশায় আই. এ. এস আধিকারিক অনিতা অগ্নিহোত্রী কবিতার মোড়কে সমাজের নানা অসুখকে চিনিয়ে দিতে আগ্রহী। ঈশিতা ভাদুড়ি, শবরী ঘোষ, তৃপ্তি সান্ত্রা, চিত্রা লাহিড়ি, রূপা দাশগুপ্ত, অহনা বিশ্বাস এই দশকে অনেক তাৎপর্যবাহী উচ্চারণ রেখে গেছেন।

নব্বইয়ের দশক যেন এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষারও প্রেক্ষাপট। বিশ্বব্যাপী নানা ঘটনার আবর্তে সংশয়াচ্ছন্ন এই দশক দেখেছে ভাঙাগড়ার আজব চেহারা। আধুনিক আবহে ক্রমে বিস্তার পেয়েছে জীবনের গতি, জটিলতর হয়ে উঠেছে জীবন। কবিতাও এক লহমায় হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে সেইসব জটিল উপকরণ। ব্যতিক্রমী ডিকশনের অভিনবত্ব নিয়ে এই দশকে কবিতার জগতে এলেন যশোধরা রায়চৌধুরী। এই দশক পণ্যবাদী, ভোগবাদী, বহুজাতিক ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর আগ্রাসনে বিপর্যস্ত। সেইসব অবক্ষয়ের মানচিত্র যশোধরা পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন পৃথক এক কণ্ঠস্বরে। ব্যক্তিগত যা কিছু কীভাবে ক্রমে তা পণ্য হয়ে যাচ্ছে তারই এক কাঙ্ক্ষিত ক্যানভাস পাই তাঁর রচনায়ঃ

'....কটা দৃশ্য হয় আজকাল রুমে
সকলই তো মাঠে হয়, আবুদানা-সাবুদানা ঢুঁড়ে
আউটডোর আউটডোর, বাতাসে যেও না যেন উড়ে
ওহো শ্যাম্পু দেওয়া চুল, ওহো সূক্ষ্ম সাবানের কাচা
রঙিন কাপড়, তুমি উড়ে উড়ে ঠ্যাং দেখিও না।' (বিজ্ঞাপন)

পণ্যায়নের প্রতি তীব্র কটাক্ষ তাঁর 'ভার্চুয়ালের নবীন কিশোর' কবিতাবইয়েও ভিন্নতর আকার ও আকৃতি নিয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে। শ্বেতা চক্রবর্তীর কবিতা ভালোবাসার চেনা চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত হয়েও নতুনভাবে ঘর বাঁধে আমাদের চেতনার অন্দরমহলে। শুধু হৃদয়ের ভালোবাসার জন্য তাঁর কবিতা আর্ত নয়, সে চায় শরীরের ভালোবাসাও। তাঁর কবিতারা বুঝিয়ে দেয় যে নারী তার ব্যক্তিভাবনাকে অনায়াসে প্রকাশ করতে পারে অন্যরকম ভাষা ও প্রতীকে, যৌন রূপকের অনন্য ব্যবহারে। অনেক পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গেও শ্বেতা নিজস্ব অনুভূতি যুক্ত করে তাদের নতুন তাৎপর্যে বিন্যস্ত করেন। দ্রৌপদীর কথা এক চিরন্তন বেদনাবোধের ওপর অবস্থিত ঃ 'শেষ রাতে উঠে বসেছেন। পাশে যে পুরুষ ম্যাদামারা, /তাকে ছেড়ে ভোরের আলোয় নদীজলে/ ফেলে এসেছেন প্রতিদিন এক একটি যৌনকেশ—"ওগো পার্থ, তোমায় দিলাম।" (অন্তরাল পর্ব ঃ মহাভারত)।

বাংলা কবিতার জগতে মন্দাক্রান্ত সেন যে শৌখিন পর্যটক নন, তাঁর প্রথম কবিতারই 'হৃদয় অবাধ্য মেয়ে' সেই সাক্ষরই বহন করে। কবিতার বহমান স্রোতে বরাবরই দেখা গেছে, পুরুষকে নারীর সৌন্দর্য চেতনায় মগ্ন হতে। কিন্তু মন্দাক্রান্তার কবিতায় নারীর চোখে পুরুষ, নিয়ে আসে এক অন্য মাত্রা। ভালোবাসার অফুরাণ উড়ানে ভর দিয়ে অবাধ্য হৃদয় অজান্তে যখন বৈধ সম্পর্কের বেড়াজাল টপকে হাজির হয় পরকীয়ার দরবারে আর সমাজ অস্বীকৃত ভালোবাসা রোমান্টিকতার মোড়কে কবিতা হয়ে ওঠে ঃ

কাল যাব তোমার অফিসে
ঠিক ঠিক চারটে পঁচিশে
তারপর ভুলে দিগবিদিক....
শহীদমিনারে উঠে গিয়ে
বলে দেব আকাশ ফাটিয়ে
ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক। (একটি অসম পরকীয়া)

পুরাণ প্রতিমার ব্যবহার, চন্দ্রানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় হয়ে ওঠে তাঁর আশ্রয়। আধুনিক সময়ের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন প্রাচীন পৃথিবীর পৌরাণিক চরিত্রগুলি। তাঁর নানা কবিতায় মেয়েদের আলাদা জীবনমন্ত্র অনূদিত হয়েছে।

এক সংবেদী মেয়ের ভালোলাগা, মন্দ-লাগা, বিউটি পার্লার ঘেঁষা মেয়েলি অনুষঙ্গের জগৎ—এমনই নানা রসদ নিয়ে গড়ে উঠেছে পৌলমী সেনগুপ্তের কবিতার ভুবন।

ইঙ্গিতময় বাচনভঙ্গি ও সংহত বাকপ্রতিমায় বিন্যস্ত অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাশৈলী। দর্শনজাত উপলব্ধি, প্রকৃতিমগ্নতা ও জীবনের প্রতি অনুরাগের পাশাপাশি তাঁর কবিতায় বস্তু পৃথিবীর দৈন্য জর্জরতা আক্রমণ করে সঠিক মাত্রায় ঃ 'শব্দ এবং শব্দহীন মুহূর্ত নির্মাণ/শূন্য থেকে আকর্ষিত গাঢ় অভিমান/গড়ে তোলে অপরূপ স্ফটিক বলয় ভিতরে নির্মিত থাক আসন্ন প্রলয়।' (প্রলয়) মিতুল দত্ত সাংকেতিকতা ভালোবাসেন। তাঁর কবিতা উপস্থাপনে জটিলমনস্কতার সাক্ষর থাকলেও অত্যন্ত পরিণত তাঁর উচ্চারণ। মিথকথনের ঠাসবুনটে, সঠিক শব্দের সাংকেতিক উচ্চারণে, তীক্ষ্ণ কবিতার জন্ম দেন রিমি দে। সংহত চিত্রকল্পে গড়ে তোলেন নানা সমকালীন ক্ষতলিপি। আবার বদলে যাওয়া জীবনের রকমারি বিপর্যয়কে কবিতায় উপজীব্য করেছেন সেবন্তী ঘোষ। তাঁর নারীচেতনায় যুক্ত হয়েছে রক্তে মিশে থাকা পুরাণ ও তার নবীকরণ। রোশেনারা মিশ্র, বুবুন চট্টোপাধ্যায়, দীপশিখা পোদ্দার, অনিন্দিতা বসু সান্যাল, জপমালা ঘোষ রায়, মিঠু সেন, সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়, সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা নব্বইয়ের নতুন ভাষা প্রকরণ এবং বহুকৌণিক কবিতা ভাবনায় ক্রমে ধনী করে তুলেছেন মেয়েদের স্বরায়ন।

ভাবতে অবাক লাগে মেয়েদের কবিতা আজ কতটা ঋদ্ধ। আশি, নব্বইয়ের মেয়েরাও এই সময়ে এসে অনেক বদলে ফেলেছেন তাঁদের বাক্‌প্যাটার্ন। কবিতা যা অর্জন করেছে এতকাল, সেইসব রসদ সঙ্গে নিয়েই, উত্তরসূরী মেয়েরা কবিতাকে পৌঁছে দিচ্ছেন ভিন্নতর জলহাওয়ার নতুন দিগন্তে। এই সময়ে মেয়েদের কবিতায় প্রায় অগণনীয় কবির সংখ্যা এবং তা ক্রমবর্ধমান। কোনো অংশেই তাঁদের ভাবনাবিশ্ব কিংবা ভাষার জগৎ পুরুষদের চেয়ে কম বিস্তীর্ণ নয়। মেয়েদের একক জীবনযাপন, একক মাতৃত্ব, স্বাধীন যৌনতার কথা আগেই কবিতায় আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এবার এগিয়ে গেল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণেও। শান দেওয়া ভাষা, অসাধারণ ছন্দপ্রকরণ, মেধাবী নির্মাণ শৈলীতে তাঁরা অধিকার করে নিলেন তাঁদের হারানো জায়গাটা। মেয়েদের কলম এভাবেই সমস্ত অভিযোগ অতিক্রম করে অনেক বেশি পরিণত হয়ে উঠল।

একুশ শতকের শূন্য দশক, একা ছাপ ফেলে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের জমিকেন্দ্রিক গৃহযুদ্ধে। আশির এক কলম তখন তার গদ্যের নিমগ্নতা থেকে উঠে এসে, সেই সময়ের সামাজিক সচেতনতার নজির স্থাপন করে ছন্দের বিন্যাসে ঃ 'চারিদিকে শুধু মৃত মানুষের গাদা।/ভূত ভেসে আসে ভূত ভেসে যায়, শাদা,/পায়ে জমি নেই, চোখে জল সরছে না-/কবিটিকে বলি, আজও ঘৃণা লিখবে না?' (মুখোমুখি / চৈতালী চট্টোপাধ্যায়) আমূল বদলে গেছে মেয়েদের চলাফেরা, ভাবভঙ্গি। সময়ের সঠিক ভাষাকে আয়ত্ত করে নিয়ে 'কীভাবে বলছেন'—সেই প্রাকরণিক দক্ষতা, তো অন্যস্তরে পৌঁছে দিতেই পারে বিষয়ভাবনাকে; 'এই জরুরি অবস্থায়/ ফুঁ দিয়ে ওড়ানো চুমুর মতো একটি বিল পাঠালাম/তুমি একবার বারান্দায় এসে, দাঁড়াও। /হাত পাতো, আমি তোমাকে অফুরন্ত

টক্‌টাইম দেব।' (সিম বদলে যায় ঃ তৃষ্ণা বসাক) তথ্যপ্রযুক্তিগত ঝকঝকে শব্দের বিন্যাসের সঙ্গে নিয়মিত কবিতায় দেখা হয় আজকাল। মোবাইল ও কম্পিউটারে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি এখন একুশ শতকের কবিতার অন্যতম রসদ।

এই মুহূর্তে মেয়েদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের সামর্থ্যের সাক্ষর মুদ্রিত রেখে, আমাদের প্রত্যাশাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছেন। যাঁরা এই সময়ে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন, তাঁদের মধ্যে রাকা দাশগুপ্ত বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। রাকা তাঁর উচ্চারণে, শিল্পকে সেই অনন্যতায় নিয়ে গেছেন যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবন-জগৎ-জীবিকা এবং বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞান। তাঁর কবিতায়, প্রাঞ্জল ভাষায় বহমান এক শান্ত দার্শনিকতা। পাঠক পড়েন নিজস্ব বোধের আলোয় ঃ

বাসের নম্বর গেছি ভুলে
লিখে দিয়েছিলে/ কিন্তু আজ এই নোটবুক খুলে
দেখি কোনও সংখ্যা নেই... ভরে আছে হিজিবিজি দাগে
উদ্‌ভ্রান্ত লাগে
যে বাস প্রথমে আসে, তাতে উঠি। পরবর্তী স্টপে
ফের নামি/ আবারও বাসের খোঁজে...মাঝে মাঝে কোনও কফি শপে
কিছুক্ষণ বসে থাকা/এইভাবে দিন যায়...মাস
ব্যপ্যাকে বয়ে চলি। একা...
তবে কি তোমার সঙ্গে আজও বাকি রয়ে গেল দেখা? (সফর কাহিনি)

অনবদ্য প্রান্তিক মিলের পরিবেশনে, কবিতা থেকে যায় সম্ভাব্য এক প্রাপ্তির অনুভবে।

স্বপ্নাতুর মন নিয়ে মেয়েরা এখন নিজের মতো করে কথা বলেন, কখনও প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত, কখনও পরকীয়ায় আচ্ছন্ন। তাঁদের কবিতা কোথাও ভেসে বেড়ায় জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির ভেতরে কোনও নিসর্গের গভীরে। কখনও আবার রান্নাঘরে বিবিধ অনুষঙ্গ এসে কবিতাকে আলাদা ঘ্রাণে মাতিয়ে তোলে। মেয়েদের কবিতায় এখন অতিকথনের ছিটেফোঁটা মেদ নেই। ভাঙা-ভাঙা রেখায়, টুকরো-টুকরো শব্দে কোথাও বা গল্পের রেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। যতটুকু বললে কাঙ্ক্ষিত অভিঘাত সৃষ্টি করা যায়, লেখায় ঠিক ততটুকুই রাখেন মেয়েরা। আড়ালে, কখনও নিখুঁত ছন্দের উপস্থাপনা অন্যস্তরে পৌঁছে দেয় সেই লেখাকে। অনেকে তাঁদের বাক্যবিন্যাসে ইংরেজি ও হিন্দির সময়োচিত মিশেলকে প্রয়োগ করেছেন নিদারুন দক্ষতায়। নতুন প্রজন্মের মেয়েরা ঠিক এই মুহূর্তে কেমন লিখছেন? নির্বাচন করে নিচ্ছি কিছু উদ্ধৃতি

১) প্রতিটি কথার শেষে পড়ে থাকে কিছু কথা
যেভাবে প্রতিটি ঢেউয়ের নীচে—
পড়ে থাকে কিছু বালি!

বুক হিম হয়ে আসে
হাত মুঠো খুলে দেখি....
খালি!
প্রতিটি কথার শেষে পড়ে থাকে...
বলে ফেলা কথার প্রণালী
(তারপর সমুদ্রে গেলাম ঃ সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়)

২) দম মারো দম বিষাদ রজনী
মধুমাস নেই আছে জমি আর যোনি।
দুজনেই ক্রীতদাস দুজনেই পাশা
একবার হেরে গেলে মরে ভালোবাসা।
তবুও দু ফোঁটা ভুল সঙ্গে জড়াই
ছায়া ও জননী আমি দুটোকেই চাই
(দম মারো দম ঃ কৌষিকী দাশগুপ্ত)

৩) প্রতিটা পদক্ষেপ নিষেধের পাশে ঘোরে-ফেরে
প্রতিটা পায়ের ছাপ স্থিতিহীন স্পর্শপ্রবণতা
আমার দৈনিক সুখ সব কথা জানে
স্নানঘরে ব্যর্থতা—কিছুটা মুখর দৃশ্য কিছুটা গোপনে
প্রতিটা সংকেতে ডাইন, প্রেতিনী বলে ভাবো
কথা দিচ্ছি—পরজন্মে ঈশ্বরী হয়ে জন্মাবো।' (বিষাদ ঃ প্রমিতা ভৌমিক)

বিগত শতাব্দীর শেষ দুই দশক ধরে মেয়েদের প্রেমময় শ্রীময়ীরূপের বিপরীত এক অভিঘাত থেকে কবিতায় জন্ম নিচ্ছে প্রেতিনী, যক্ষিণী, পিশাচিনীর মতো চরিত্রেরা। এইসব অতিমানবীদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হয় কবিতায় এই সময়েও।

স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণের ছক, ভেঙে দিতে চাইছে মেয়েদের কলম। গতানুগতিক ঐতিহ্যের ধারা ছারখার করে দিয়ে, উঠে আসছে উত্তর নারীরা। একুশ শতকে তুমুল তোলপাড় হোক মেয়েদের কবিতা নিয়ে, আধুনিকতার হয়ে সেই কবিতা হেঁটে যাক নতুন দিগন্তের অন্বেষণে, জয়ী হোক তার সব প্রবণতা। মেয়েদের কলমে নির্ভরযোগ্য এক বাসভূমি খুঁজে যাক, সাহিত্যের সবচেয়ে মায়াবী এই শাখাটি।

■ ড. মধুশ্রী সেন সান্যাল—অধ্যাপিকা, কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

মিষ্টু সামন্ত

সত্তাতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় শৈশব অন্বেষণ

আপেক্ষিক সময়ের বিচিত্র বিচ্ছুরণ এবং আপন অস্তিত্বের নানা মাত্রায় কবিতা হয়ে উঠেছে—আত্মগত এবং সমাজগত, আপনকথা ও সম্মেলক কণ্ঠধ্বনি—এই দুই কোটিতে নিরন্তর প্রবহমান সৃষ্টি চিহ্ন। কবির অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার এক আশ্চর্যের উদ্‌ভাস আমাদের অভ্যাসের ব্যাকরণে আনে নবদীপ্তি, চেতনার দ্রাঘিমায় নব কলরব। দ্রুত পরিবর্তনশীল এককেন্দ্রিক বিশ্বের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে আপাত সময়ও প্রকৃত সময় যে দ্বান্দ্বিক অভিঘাতের আবহ তৈরি করেছে অহরহ, সেই দ্বান্দ্বিকতা বিস্তৃত ভূগোল, তীক্ষ্ণ সমাজ বাস্তবতার ইতিহাস নির্দিষ্ট ভিন্নতা আর অভিজ্ঞতায় কবিতা সমৃদ্ধ হয়ে, সজীব হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতাবোধ, আত্মখণ্ডন ও যান্ত্রিক আকরণবাদের জটিল বুনন আর অসংখ্য স্তরবিন্যাস নিয়ে মানবিক অস্তিত্বের আনন্দ বেদনায় সঞ্চারিত হয়েছে।

এই মানবিক অস্তিত্বের কাছে দায়বদ্ধ থাকতেই বাংলা কবিতায় চল্লিশের দশকের সময় সমাজের উত্তাপ-দহন-ভঙ্গুঁরতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অবিশ্বাস ও অন্তর্ঘাতের এই দহনবেলায়—চল্লিশের দশকের বিস্তার ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০ —এই তেরো চৌদ্দ বছর ধরেই। চল্লিশের কবিতার সমকালীন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ইতিহাসের প্রেক্ষিতটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব বৃদ্ধি, খাদ্য ও বস্ত্রের অকুলান। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের উত্থান ও ১৯৩৫ থেকেই ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনারও সংগঠিত হওয়া, ১৯৩৬ এ স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ১৯৩৭ জাপানের চীন আক্রমণ। ১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ। ১৯৪২ ভারত ছাড়ো, ১৯৪৪-এ গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৬ -এ দাঙ্গা, ১৯৪৭-এ খণ্ডিত স্বাধীনতা, ১৯৪৮-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—এহেন সংক্ষুব্ধ সময়ের ও ইতিহাসের আবর্তে চল্লিশের কবিদের রচনাকর্মের সূত্রপাত।

চল্লিশের দশকের কবিতার আলোচনায় সাধারণত এই সমাজমনস্ক সমকাল স্পৃষ্ট উদ্দীপ্ত প্রতিবাদী কবিতার ধারাটিই প্রাধান্য পায়। চল্লিশের দশকের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করে ১৯৪০ এ প্রকাশিত আবু সয়ীদ আইয়ুব এর —'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি জানাচ্ছেন—"এঁদের (সাম্যবাদীদের) সম্ভাবনা প্রচুর কিন্তু সিদ্ধি এখনও এতটা নিশ্চিত নয় যে তাঁদের লেখা সম্বন্ধে আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। হয়তো এঁরাই অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করবেন যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিচেতনা সম্ভূত নয়, সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

চল্লিশের দশকের কবিদের এহেন বাধ্যতামূলক সমাজ সচেতনতা বা সমাজব্যবস্থার

প্রকৃতি নির্ণয়ে অধিক উৎসাহ সম্বন্ধে তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী গ্রন্থে 'চল্লিশের চোখে চল্লিশের কবিতা'র আলোচনায় সাক্ষ্য মেলে—

"...শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে চল্লিশের কবিদের অনেকটা শক্তি রাজনীতির সেবায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল....মাতৃভূমির পরাধীনতা, বিশ্বজোড়া যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতির মধ্যে থেকে কোনো যুবকের পক্ষেই সেদিন চোখ বুজে ধ্যান করা সম্ভব ছিল না..."।

—চল্লিশের সমাজসচেতন রাজনীতি-নির্ভর কবিতার পাশাপাশি কবির নিজস্ব অন্তর্মুখীনতার সঠিক মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন এই সময়ের যে সমস্ত কবিরা তাদের মধ্যে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অন্যতম। দ্রুত পরিবর্তনশীল সময় সমাজ বাস্তবতার তথা সময়ের গোপন ও প্রকাশিত অবয়বের সঠিক চিহ্নকরণ করতে সমর্থ ছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র বীক্ষণ বিন্দুর প্রেক্ষিতে।

কবিতা বিশ্বে নিজস্বতা অন্বেষণে রচনাকর্মের সূচনা 'নীল নির্জন' (১৯৪৫) প্রকাশের সূত্রপাত ধরেই। যার বিবর্তমান ধারাটি আজও প্রবহমান প্রাঞ্জল ভঙ্গিমায়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবি স্বভাবটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে 'দেশ' (২০০৬), এপ্রিল জুন সংখ্যায় মল্লিকা সেনগুপ্তকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই। তিনি জানান—"কবিতা কল্পনালতায় আমি বিশ্বাস করি না। যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি অর্থাৎ চোখ-কান-স্পর্শ কি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যোগাযোগ তৈরি হয় নি, তাকে নিয়ে আমি লিখতে পারি না। আমি এখন কোনও মানুষের মুখ আঁকবার চেষ্টা করিনি। যা আমার মাথা থেকে বেরিয়েছে, আমি শুধু আমার সামনে যে লোকটাকে দেখেছি তার মুখটাকে ধরবার চেষ্টা করেছি, সে ছাড়া আর কেউ আমাকে নাড়া দিতে পারে না...' সমাজ-সময়-মানুষের মধ্যেকার এক আন্তর্সম্পর্ক এক আত্মার বিনি সুতোর বাঁধন কবিকে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সহমর্মিতায় বিশ্বাসী করে তুলেছিল। কবিতা সম্বন্ধে কবির অভিপ্রায়টি এইরূপ ঃ—

"...কবিতার যাবতীয় উপাদান আমাদের চতুর্দিকেই ছড়িয়ে আছে। দরকার শুধু চিত্তে ঈষৎ বেদনা কিংবা চক্ষুতে ইষৎ কৌতুক নিয়ে তার দিকে তাকানো।....কিন্তু চেষ্টা করতে পারি পুরানো ফুল পুরনো পাখি আর পুরনো মানুষকেই অন্য চেহারায় দেখাতে।"

তাই ভঙ্গিটাকে সহজ রেখে অন্যরকম এক মোচড়ে পরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের বেদনা-উল্লাসকে আবিষ্কার করেন। আধুনিক জীবনের সংশয়, অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, দ্ব্যর্থকতাবোধকে অনায়াস কথোপকথনের ছন্দে প্রকাশ করে। কবিতা এই সহজাত প্রসাদগুণেই লৌকিক অলৌকিক, শৈশব-প্রাজ্ঞ, একক সমবেত কিংবা সীমাবদ্ধ ও সীমাহীনতার দ্বৈতসত্তাকে দ্বান্দ্বিক বিন্যাসে একসূত্রে বেঁধে ফেলেন।

কবিও সামাজিক মানুষ হওয়ায় এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁকেও একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাসের মধ্যেই প্রভাবিত ও প্ররোচিত হতে হয়। প্রশ্ন

থেকে যায় কবির সামাজিক দায়বদ্ধতা কি আদৌ আছে, অভ্যস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক সংগ্রামে সোচ্চার হওয়ার। নিশ্চয়ই সমকালীন সমাজ রাজনীতির বর্ণমালার ভিন্নপাঠের একটি অন্যতর ব্যাখ্যাও শোনাতে হয় তাঁকে, তবুও সামাজিক পাঠ ও নিজস্ব হৃদয় উন্মোচন কীভাবে এক আশ্চর্যে ভারসাম্য লাভ করেছে নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় তারই অন্বেষণ—অন্বেষণ এক 'আত্মদীপভব' শৈশবের।

সমাজ সংগীত রচনা করতে গিয়ে অকারণ ভাবালুতা, র‍্যোমান্টিক ধূসরিমা এবং আর্দ্র সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় দেননি। কেননা এক্ষেত্রে চিত্তচাঞ্চল্যের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় মেধাবী দৃঢ় উচ্চারণের। জরুরি হয়ে ওঠে শৈশবোচিত দুর্জয় সাহস ও প্রতাপী স্পর্ধার যা মানুষের সুপ্ত চৈতন্যের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করবে। সমাজ জীবনের অসংখ্য অসঙ্গতিকে ধিক্কার বা ঝাঁঝালো প্রতিবাদের চেয়ে ছদ্ম কৌতুক ও প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মোড়কে উপস্থাপিত করেছেন। অভিজ্ঞতার তাৎক্ষণিকতা অবসিত হয়ে যায় কবিতার সময়াতীত আবেদনে। সমাজ ব্যাখ্যার এবং সমাজবীক্ষায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন বিন্যাসের অসহায়তা ও বিপর্যস্ত জীবনের খণ্ড চিত্র চিরকালীন হয়ে ওঠে।

কবি নীরেন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে সংগ্রামশীল জীবনের সাধারণ রূপটি প্রকাশ পায়—সৃষ্টি হয় এক সত্তাতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের—উত্তরণ এক ধ্বনাত্মক উপলব্ধিতে। এক্ষেত্রে নীরেন্দ্রনাথের তিনটি অতি বিখ্যাত কবিতা—'উলঙ্গ রাজা', 'কলকাতার যীশু' 'অমলকান্তি'—কবিতা তিনটিকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানের প্রয়োজনে গ্রহণ করা যাক।

'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থের ব্লার্বে গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি ছিল এইরূপ—"নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা পড়লেই বোঝা যায় তিনি এই রুগ্ন সমাজের ব্যাখ্যাতা, এই দুঃস্থ দিবসের ভাষ্যকার। তাঁর কবিতা যেন সন্ধানী আলোর মত, দেশ ও কালের নানা গোপন যন্ত্রণাকে যা নিমেষে উদ্‌ঘাটিত করে। সর্বকালের যোগ সম্পর্কে আস্থাশীল হয়েও তিনি সমকালের সঙ্গী, ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি প্রতি মুহূর্তেই আবার নূতন কলেবরে দীপ্তিমান।"

সময়ের সংক্রমণকে ধারণ করেই কবিতাটিতে মধ্যবিত্ত বাঙালির কবি সেই আপাত ভীতু বাঙালির দুরু দরু বুকে বিপ্লবের স্বপ্নকে বুনে চলা কিন্তু বৃহৎ ক্ষেত্রে অন্যায়কে মেনে না নেওয়ার অভীপক্ষ—সুযোগের অপেক্ষায় থাকে বিদ্রোহের জাগরণের উত্তাল সত্তরের রক্তপাত আর প্রাণের ক্ষয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ভীরু পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের নিজস্ব ভঙ্গিমায় বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করেন কবি। সময়ের অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে এই সময়ের সমসাময়িক অনেক কবির কণ্ঠে স্পষ্ট অ্যাক্টিভিস্ট স্বর —রাগযন্ত্রণার তীব্রতর প্রকাশ কিংবা ধ্যানীর স্থিতধী দার্শনিকতা। নীরেন্দ্রনাথ জ্ঞানীর নির্মোহ বিশ্লেষণ কিংবা তাৎক্ষণিক তীব্র অকারণ বিদ্বেষ—কোনো পথটিকেই চূড়ান্ত মনে না করে একা সহজ সহাবস্থানের পন্থাবলম্বী হয়েছেন। শিক্ষিত, মধ্যবিত্তের সাধারণের

বিপ্লবের স্বপ্নকে—বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের অভীপ্সাটি গল্পকথনের দ্বিরালাপে প্রমূর্ত করে তুলেছেন।

'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটির অন্তরঙ্গ পাঠে ব্রতী হলে অনুভূত হয় এটিতে রয়েছে দ্বিসত্তার দ্বৈরথ—একটি সত্তা প্রাত্যহিকতায় উমেদারিতে অভ্যস্থ, অন্য সত্তাটি এক 'সত্যবাদীর, সরল, সাহসী' শিশুর অন্বেষণ —যে শৈশব সত্তা সরল মোসাহেবি হেলায় তুচ্ছ করে রাজা তথা উর্দ্বতন সর্বশক্তিমান শক্তির সামনে অবলীলায় সরল সত্য সাহসী উচ্চারণে দৃপ্তভঙ্গিতে ব্যক্ত করবে—এ কবিতা তাই এক সরল নির্ভীক শৈশবের অন্বেষণ।

'কলকাতার যীশু' কবিতাটিতেও একইভাবে এক শিশুর চিত্রকল্প উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। ধ্বস্ত সময়ে চাটুকারী, নির্লজ্জ মুখোশ সর্বস্ব মানুষগুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আলোচ্য কবিতার শিশুটি সচল ও নবীন মূল্যবোধের দ্বারা চালিত, শিশুটি দৃপ্ত সাহসী ভঙ্গিতে সকল স্থবির, গতানুগতিকতার অন্ধকূপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। সেই প্রতীকী ব্যাহ্যিক নির্ভীক শৈশবসত্তার অন্বেষণ আলোচ্য কবিতাটিতেও লক্ষণীয়। 'কবিতা ঃ চিত্রিত ছায়া' গ্রন্থে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্বন্ধে আলোচনায় বলা হয়েছে।—" প্রচলিত ঈশ্বর সাধনায় নয়। ভিখিরি মায়ের সম্পূর্ণ উলঙ্গ শিশুর মধ্যেই কবি কলকাতায় যিশুকে দেখতে পেয়েছেন, যে শিশু টালমাটাল পায়ে জনতার আর্তনাদ অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘটনাটি অগ্রাহ্য করে মূর্ত মানবতার মতো বিশ্বকে দু' হাতে পাবার জন্যে মূহূর্তে চলমান জীবন থামিয়ে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। এই শিশুর সরলতা ও মানবতাই কবির আকাঙ্ক্ষা।"

ব্যাখ্যা কবিতাটির উৎসভূমিটি সম্বন্ধে কবির—"আমার চিত্তে যখন বেদনা তখন কলকাতার এক নিরন্ন উলঙ্গ ভিখারী শিশুকেই আমি বেথেলহোমের জ্যোর্তিময় পুরুষ হিসাবে দেখতে পারি এবং চৌরঙ্গীর রাস্তায় তার টালমাটাল পদক্ষেপ দেখে ভাবতে পারি যে সে বিশ্বজয়ে বেরিয়েছে।" ('কবিতার দিকে', দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৯, পৃ-২৩৯)

"ভিখারি-মায়ের শিশু
কলকাতায় যিশু
সমস্ত ট্রাফিক তুমি যন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদে, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষ্টানি
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই,
দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে।"

মানবতার বিকৃতি ও সংকটের সময়ে দলবদ্ধ মোসাহেবী অভ্যস্ত সমাজের বিরুদ্ধে নির্ভীক শিশুটির দৃঢ় পদক্ষেপ সরলতা আর মানবতারই জয় ঘোষণা করে। ত্রিকালদর্শী

কবি বুর্জোয়াকেন্দ্রিক মনোভাবের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক নির্ভীক মানবিক শৈশবের অন্বেষণে ব্রতী।

ষাটসত্তর দশকের উত্তাল রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের ভাঙন তাঁর কবিতাকে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিসত্তাকে স্পর্শ করেছে ভিতর থেকে। দেশ, জাতি, ধর্মে ছড়িয়ে পড়া বিবিধ সংকট ও শৈশবের স্বপ্নকে চুরমার করে দিচ্ছে। নতুন সময়ের কলুষ-ক্লান্তি-তিক্ততা প্রতি মুহূর্তে কুরে কুরে খায় কবি সত্তাকে, তাঁর শুদ্ধ চেতনাকে প্রতিহত করে, বিষিয়ে দেয় শুভবোধকে। সেই সময়ের কালমাসকে প্রত্যাখ্যান করে এক অন্যতর সালোকসংশ্লেষের অভীক্ষায় দিনযাপন করে অমলকান্তি। পৃথিবীর জলবায়ুটা যাতে শুদ্ধ করা যায়, সেই শুদ্ধতর রোদ বৃষ্টির ঘ্রাণ এমন সুস্থ করে তুলবে অন্তঃসত্তাকেই। এই ধ্বনাত্মক উপলব্ধির অন্বেষণেই—এক সুস্থ শৈশবের আকাঙ্ক্ষাতেই কবিতাটির সৃষ্টি।

প্রথমটি পড়াশোনার অনীহা ও অভ্যস্ত প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে নিঃস্পৃহতা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যায় বর্তমানের ইঁদুর দৌড়ে অমলকান্তি ভাঁটির টানে ভেসে চলতে চায়। ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা, যশপ্রাপ্তির প্রত্যাশালীন এই অমলকান্তি শুধুমাত্র—'রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।' প্রকৃতির উন্মুক্ত সাহচর্যের আতিথ্যকে সপ্রাণ পৃথিবীর উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল রবীন্দ্র শিশু চরিত্রগুলির মতোই। প্রাত্যহিক পৃথিবীর নিষ্ঠুর চক্রান্তে তার ইচ্ছাপূরণ ঘটে না—চরম হতাশা আর ক্লান্তির মালিন্য নিয়ে আজ সে অন্ধকার ছাপাখানার সামান্য কর্মীমাত্র। রোদ্দুর হতে চাওয়ার শৈশব বাসনা সকল মানবসত্তারই আকাঙ্ক্ষিত সত্য, যাকে অভ্যস্ত পৃথিবীর দৈনন্দিনতায় ইচ্ছা ও ইচ্ছাপূরণের দ্বন্দ্বে পরাস্ত হতে হয়। সেই অনাবিল, সূর্যকরোজ্জ্বল শৈশবের অন্বেষণই আলোচ্য কবিতাটি।

বহুগুণিত সত্তা ও একক সত্তার দ্বন্দ্ব, অন্তর্মুখ ও সমাজমুখের দ্বন্দ্ব, দলবদ্ধ ও নিজসত্তার দ্বন্দ্ব—এসকল চিরন্তন থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্বে যে সিনথেসিসে পৌঁছান যায় সেটি হল এক সরল, নির্ভীক, সৃষ্টিকরোজ্জ্বল মানবিক শৈশব সত্তার অন্বেষণেই ব্রতী নীরেন্দ্রনাথের কবিসত্তা; যা শত শত জলঝর্ণার ধ্বনির মতো বেদনা—সংবেদনা, অভিজ্ঞতা—অভিমান, কালোচ্ছায়া রৌদ্রচ্ছায়া—দিনরাত্রির সন্ধি সমাজের নিখুঁত পাণ্ডুলিপি রচনা করে—পুষ্ট করে, শুদ্ধ করে, শুচি করে তোলে মানবিক শৈশব স্বপ্নকে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। আধুনিক কবিতায় ইতিহাস, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেজ' পাবলিশিং, ২০১১, কলকাতা

২। 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, ১৪১৮, কলকাতায়।

■ ড. মিষ্টু সামন্ত—অধ্যাপিকা ও প্রাবন্ধিক

রাসবিহারী দত্ত

কবিতায় কৃতি-বিকৃতি ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন পথে চলার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই লেখককে নবযুগের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করে না। বিচিত্র জটিল মানব জীবন প্রতিটি মুহূর্তে সংঘাতে সংঘাতে নবজন্ম লাভ করছে। এই নিত্য সমৃদ্ধ রূপান্তরিত মানব জীবনের অনিঃশেষ রসমূর্তি যে অন্তর্দৃষ্টিতে না ধরতে পারে সে সুযোগের সদ্ব্যবহারের সুখ বিলাসের গোলকধাঁধায় চোরা স্রোতে আটকে যেতে পারে। সে প্রচারের কলাকৌশলে অনুকৃতি সর্বস্ব কাব্যকুশলী কবিবর মাত্র আখ্যায় আখ্যায়িত হতে পারে—এর বেশি কিছু নয়। নিজস্ব নতুন কিছু যার মধ্যে নেই তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা কোনদিনই হয় না। নূতন যা কিছু তা কালের বিবর্তনেও চিরনতুনের বিকাশ তুলে ধরে। অতীত সাহিত্যকৃতির সকলেই জীবনের পরিচয় অন্যের আয়নায় নয় নব নব সৃষ্টিতে উন্মুখর জীবনপঞ্জী নিজের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে চলতি সংস্কার থেকে মুক্ত প্রজ্ঞায় সাক্ষাৎদৃষ্টিতে উপলব্ধি করে তার রসরূপ প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁদের রচনা কালাতীত। যে মুহূর্তেই পঠিত হোক না কেন তা নতুনের আস্বাদন দেয়। তাই নতুন পথে চলার কেবল আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট নয় তার জন্য পারিপার্শিক অবস্থার চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে নিজস্ব উপলব্ধির আলোকে গতানুগতিকতা মুক্ত নতুন ধারা আবিষ্কার করতে হবে। যে পারে তার রচনা সার্থক হয় যে তা পারে না, তার রচনায় যতই কাব্যকুশলতা থাকুক না কেন প্রচারের ফানুস যে মুহূর্তে শেষ হয় তা চোখের আড়ালে থাকতে থাকতে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কথা উঠতে পারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য আলোচনা করতে বসে এমন কথামুখ কেন? তা প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা সাহিত্য এক সময় কয়েকজন প্রতিভাবান তরুণ প্রজন্মের হাতে গতানুগতিক বাঁধা পথ ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্ত তৈরি করেছিল। সাড়া পড়েছিল বুদ্ধির জগতে। এই শুভ শঙ্খনাদ চোখে পড়েছিল কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতির কর্ণধারদের। তারা সময় বৃথা নষ্ট করেনি। এই সম্ভাবনার উৎস যে দুটি তরুণ তাদের টোপ ফেলতে ব্যবস্থা করল সুরা সাকি ও সায়রের। ঠাণ্ডা ঘরে বসে নিয়নের জ্যোৎস্নায় আদি রসের রগরগে উপাচারে মদালসা চোখকে করে দেয় ঘোলাটে। নতুন পথের চলার আকাঙ্ক্ষার আতসকাচ ঝাপসা বিবর্ণ গতানুগতিকতার ঠুলি পরে নেয়। স্বচ্ছ স্বাধীন বিচার প্লাস্টার অফ প্যারিসের মসৃণ দেয়ালে পিছলে পিছলে পিছল পথের বোরখা পরে নেয়। শক্তি-সুনীলের ক্ষেত্রে এই বিড়ম্বনা উৎসুক বুদ্ধির মানুষজনকে নিরাশ করেছে।

কোথায় হারিয়ে যায় সুনীলের সেই সোচ্চার ঘোষণা 'আমি বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্র

ছাড়া আমাদের দেশের মুক্তি নেই। শ্রেণী বিহীন সমাজতন্ত্রই আমার কাছে বেশি কাম্য, যদিও সে সব দেশে যে ধরণের সমাজতন্ত্র বর্তমানে আছে, সেখানে অনেক দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে।...পৃথিবীর সব মানুষ খেয়ে পরে বাঁচুক বর্ণবৈষম্য দূর হোক ও শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপিত হোক—এই আমিও মনে প্রাণে চাই।",

(সাহিতসেতু পৃঃ ৩৮, ৬০ সুনীল সংখ্যা)

কারণ তখনো যে বুকের মধ্যে কলেজ জীবনের ছাত্র রাজনীতির প্রচ্ছায়ায় সযত্ন লালিত আদর্শ। তা থেকে থেকেই ফুটি ফুটি স্ফোটন তৈরি করে চলেছে। কিন্তু মন ও বুদ্ধি বাঁধা পড়েছে কর্তৃপক্ষের ঘেরাটোপে। তাই কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত সংস্কৃতির চর্বিত চর্বন উগরে চলেছেন সুনীল। শ্রেণী বিহীন সমাজের স্বপ্ন শ্রেণী বন্দনায় নতুন যুগ খুঁজে পেয়েছে—

'কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা এলো চলে গেল কিন্তু এই বোষ্টুমি আর এলো না।
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।
বুকের মধ্যে সুগন্ধী রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
সেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে।
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়,
বিশ্ব সংস্কার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮ টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে কোন নারী।
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনা!'

সুনীল এখানে কোন শ্রেণী দর্শনের কথা বললেন? জীবন প্রবাহে কেউই কি কথা রাখেনা? এমনকি মানুষের পূর্ব জন্ম যে বানর, তারাও যুথবদ্ধ জীবন যাপন করে, নদী পেরোতে গিয়ে একটি বাচ্চা বানর মায়ের কোল থেকে পড়ে যায়, আমরা শুনেছি পরের বানর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণাপন্ন বানর বাচ্চাকে বাঁচিয়েছে। বানর বলতে প্রায় নর, বানর। বানর কুলেই যখন সবাই কথা রাখে মনুষ্য সমাজে কি তার সত্যিই দেখা মেলে না!

কবির নিজের উদাহরণ তুলে ধরা যাক। মনুষ্য সমাজ যদি কথা না রাখতো আজকের কবি, এই জায়গায় পৌঁছোতে পারতেন? জন্মের সময় শুধু বাবা-মা নয় ডাক্তার নার্স

ধাইমা সকলেরই ঠিক ঠিক সহযোগিতা না থাকলে কবির জন্মই তো বৃথা হতো। কেবল ডাক্তার নার্স পড়শিনীরা উলু বাজিয়ে কথা রেখেছে তাই নয় প্রতিমুহূর্তের বেড়ে ওঠাতে সমাজের প্রতিটি সচেতন কর্মী যারা ক্ষেতে কলে কারখানায় কাজ করে তারা তাঁদের শস্য দানা, তেল নুন তৈজসপাতি, পোষাক আসাক কাগজ কলম নিয়ে হাজির না হতো তবে নধর শরীরের কবি শিক্ষায় দীক্ষায় প্রচারের যে জায়গায় পৌঁছেছেন এই মুহূর্তে তা কি সম্ভব হতো? বলতে পারেন কবি, এ আমার বাবা মার টাকার জন্য সব সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কেবল টাকা দিয়েই কি এসব সম্ভব হয়? কবি নিজে ভালো করেই জানেন তা সম্ভব নয়। এইভাবে প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষের কান্না-রক্ত-ঘাম তার শরীরেও প্রবাহিত। কেবল এখানেই শেষ নয়। যখন মানুষ জন্মগ্রহণ করে তখন যেমন পাড়া পড়শি শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে বরণ করে ঠিক তেমনই মৃত্যুর পর অন্তত চারজন কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে শবদেহের সৎকার করে, ধূপ ধুনো চন্দন ফুল মালায়ও শঙ্খধ্বনিতে। ফলে কেউ কথা রাখেনি এমন নয়। এমন কি কবির তেত্রিশ বছর জীবনেই কথা রেখেছে। তবু কেন কবি এই পঙক্তি লিখলেন বা লিখতে গেলেন?

একথা সোচ্চারে বলা যায় কবি, গতানুগতিকতার রোমন্থন করেছেন মাত্র। আমাদের কর্তৃপক্ষ দর্শনের সার কথা হলো সব মিছে রে সব মিছে, এই মায়া কাননের পিছনে ঘুরে কিছু লাভ নেই। এই জগতে সবই মায়া। কেউ কারো নয়। এইভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়। তুই কার জন্য জীবন পণ করিস। তোর যে এই ছেলে যাকে তুই জন্ম দিয়েছিস, তুই মরে গেলে তোর শবদেহকে চিতেয় তুলে বাঁশ দিয়ে খোঁচাবে। ছেলে পুত্র পরিবার কেবা কার কে তোমার। ছেলে বড় হলেই ডবকা ছুঁড়ি নিয়ে আসবে, আর বলবে বুড়োটা মরে না কেন। বুড়িটা মরলেই বাঁচি। এই মায়া মোহ পেছনে ফেলে আয়। কেবল তারই সাধনা কর। সেই অন্তর্যামীই তোকে উদ্ধার করবে।

এই গতানুগতিকতার অনুবর্তনই কবি তাঁর কবিতায় করেছেন। তা তিনি জেনে করেছেন না কি না জেনে করেছেন কবি নিজেই একথার উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু যে দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে কবিতায় তা শ্রেণী দর্শনই। যে শ্রেণীকে পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর জীবনের প্রয়োজনে বেছে নিয়েছেন।

সেই শ্রেণী দর্শন ওঁকে শ্রোণী বন্দনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেমিকা বরুণা তার সত্যবদ্ধ উচ্চারণ করেছিল 'যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে/সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে।' প্রেমিকার এই স্বীকারোক্তির উত্তরে কবি কি বলছেন?

'ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি/ দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়।/এমন কি বিশ্ব সংস্কার তন্ন তন্ন করে খুঁজে ১০৮ নীলপদ্ম'ও, যোগাড়

করেছেন শুধু বরুণাকে পাওয়ার জন্য। অথচ বরুণা চেয়েছিল একজন নিষ্ঠাবান প্রেমিককে। যে প্রেমিক এলো তার হাতে খুনের দাগ, নৈরাজ্যবাদী আক্রোশ তার চোখে মুখে। বরুণা তো সেই প্রেমিককে চায়নি। ওতো সত্যিকারের ভালোবাসা চেয়েছিল। আর সত্যিকারের ভালোবাসা তো বঞ্চনা করে না। প্রতীক্ষায় ধুনি জ্বেলে নিজেকে নিষ্ঠার ত্যাগে জাগিয়ে রাখে। তা তো কবির লেখায় ফুটে উঠে নি। বরং ফুটে উঠেছে একরাশ আক্রোশ, রিরংসা, যৌন বিকার। এখন বরুণার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ এখনো সে যে কোন নারী।

কর্তৃপক্ষের ঠাণ্ডা ঘরে এর বেশি কিছু আশা করার থাকে না কবির কাছে। এই কবি এখন বিক্রীত বিবেক। শ্রেণী সেবা ও শ্রেণী চর্চাই এখন কবির প্রধান বিষয়। সে আক্রোশ তাঁর লেখায়ও ফুটে উঠেছে।

'কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো—
কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়াল কাঁটা
অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে,
চোখের জলের মতো চায়ে তুমি চিনি দিতে ভুলে যাও,
এত উপপতি,
তোমার দিনে দুপুরে উরুতে সম্মতি।
দিল্লীর সুপ্রিমকোর্টে, সুন্দরী তোমাকে আমি এখন সহজে যেতে দিতে পারি?
তোমার শরীর ভরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বারুদ ছড়িয়ে
আমার গোপন যাত্রা, একদিন শ্রোণীযুগে জ্বালাবো দেশলাই—
উড়ে যাবে হর্ম্যসারি, ছেটকাবে ইটকাট, ধ্বংস হবে
সব লাস্য, অলঙ্কার, চিৎপুরের অমর ভবন....
আমি ও কলকাতা।'

চোখ বাঁধা কবির চোখে তখনও প্রত্যাশার বীজ মাঝে মাঝেই উঁকি দেয় স্বাভাবিক ভালোবাসা হাসি কান্নার সংসার—

যদি ভালোবাসা দাও, অরুন্ধতি, কবিতার পিঠে ছুরি মেরে
সহমরণের ব্রতে চলে যাবে,
'বুকের উপরে দুই পা, ফ্লরোসেন্ট উরুদ্বয়।'

কবি কি সত্যি সত্যি ভালোবাসা পেতে চান, নাকি ভালোবাসা পেতে আগ্রহী? কোন ভালোবাসা তিনি পেতে চান? যে ভালোবাসার জন্য তিনি সহমরণের ব্রতে চলে যাওয়ার শপথ ঘোষণা করেন? এই বিংশ শতাব্দীর শেষে চিত্রকল্প চয়ন কি অষ্টাবিংশ কি উনবিংশ

শতাব্দীর বাতিল জীবনাচরণকে তুলে ধরতে পারে যখন সমাজের বুকে ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দল ও সহমরণের তত্ত্ব নিয়ে জিগির তোলে তখন কি সমাজের শ্রেষ্ঠ চেতনার অধিকারী কবিও ইন্ধন জোগাতে চান? তাছাড়া প্রেমিকের গোপন ভালোবাসাকে কি সর্ব্বাংশে হাট করে বলা যায় এইভাবে, বুকের উপর দুই পা ফ্লরোসেন্ট উরুদ্বয়। এই স্খলন কবির পক্ষে অনিবার্য।

এরপরই কবির স্খলন পতন এত দ্রুত ঘটে যায় যে তাঁর আর রাখ ঢাক থাকে না, তিনি নিজেকে পশুরও অধম এক পর্যায়ে নামিয়ে আনেন, ভাদ্দর কুকুরের মতো—

'ছিলাম বাসনা লঘু, ছন্দ এসে আমাকে সুস্থির হতে বলে
প্রিয় বয়স্যের মতো তার দন্ত পঙ্‌ক্তি
আমি তাকে দূর হয়ে যেতে বলি নতুন বন্ধুর খোঁজে
আমি ছন্দহীন হতে হতে ক্রমশ ধর্মদ্রোহী অগোপন,
পাষণ্ড হয়ে যাই।
তবু সে দরজার কাছে মুখ চুন, আমি তাকে পালঙ্কের নিচ থেকে
জুতো মুখে করে আনতে হুকুম করেছি।
দ্বিধা নেই, সে এনেছে, সমালোচকের কানে মেরেছে চপ্পল।
'সকল ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী'
সে আমার হাত ধরে স্ফুটিকবর্ণের এক নারীর সান্নিধ্যে
টেনে আনে, মাত্রাহীন আঙুল তুলে নারীকে দেখিয়ে বলে,
সকল ছন্দের মধ্যে এই যে গায়ত্রী, তুমি নাও,
গায়ত্রীর মতো নারী শুয়ে আছে, বিশাল জঘন মেলে,
পর্ব ভেঙে ইশারায় আমাকে উপুড় হতে বলে
আমি তার শরীর বিস্তৃত করি, দুই বক্ষোদেশ ছিঁড়ে ক্রমশ পয়ারে
নিয়ে আসি উরুদ্বয়ে কিছু কথ্য অশ্লীলতা মিশিয়ে চকিতে
খুলে ফেলি আরবের অলঙ্কার, যদিও নিশ্চিত
কাঙাল কুকুর হয়ে মাঝে মাঝে আমি বড় মিলন প্রত্যাশী।'

শ্রেণী দর্শন ভড়ং ও ভান তৈরি করে। যার শিকার হয় সাধারণ জনতা। কিন্তু সচেতন কবিও বিলোল সুখের মোহে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে তার শিকার হয়ে যান। সেই কবে গীতা থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলী পর্যন্ত নিষ্কাম প্রেমের তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে। কাম গন্ধহীন প্রেমই আসল প্রেম। শরীর থেকে শরীরাতীত ভালোবাসাই সত্যিকারের ভালোবাসা। এইভাবে পরকীয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দখল করে ফেলে জনমানসকে। সাধারণ মানুষ বিলোল যৌন চর্চায় রত হলে সুস্থ চেতনা রহিত হবে। প্রথমে কামের ভোগ সম্ভোগের দুর্বার দুনিয়াকে দেখতে দিতে হবে। তাতেই কামের

মোহ লোপ পেতে পেতে উদাসীন কাম জন্মাবে। এই বস্তাপচা তত্ত্বের অনুকরণ সুনীলের কবিতাতেও।

'শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূর চলে গিয়ে ফিরে আসি শরীরের কাছে
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে...
শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি,
মধুকূপী ঘাসের মতোন রোম, কিছুটা খয়েরি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।
...এবার তোমার কাছে নিঃশেষে নতজানু
কথা রাখো। নয় রক্তে অশ্ব খুর, স্তনে দাঁত, বাঘের আঁচড় কিংবা
উরুর শীৎকার
মোহমুদগরের মতো পাছা আর দুলিওনা,
তুমি হৃদয় ও শরীরের ভাষ্য
নও, বেশ্যা নও, তুমি শেষবার
পৃথিবীর মুক্তি চেয়েছিলে, মুক্তি, হিমযুগ, কথা দিয়েছিলে তুমি
উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।'

একথা কেউ কেউ অনুমান করেছেন যুগের পর যুগ ধ্বংস হয়েছে হিমযুগের আগমনে। কিন্তু তাতে কি সত্যি সত্যিই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি ঘটেছে না সভ্যতার পর সভ্যতা লুপ্ত হয়েছে, মাটি চাপা পড়ে অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করেছে। উদাসীন সঙ্গম শিখতে গিয়ে কিভাবে রগরগে যৌন চর্চা।

এরপর কবিতার পঙক্তিতে পঙক্তিতে কেবল শরীর, নারীর শরীরই নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বালাই না রেখেই। 'মুঠো পিছলানো স্তনের সূর্যমুখী লঙ্কার মতো বোঁটায় ধাক্কা মারলো কুয়াশা পাছার বিপুল দোলানিতে কেঁপে উঠলো নাদ ব্রহ্ম।'

আক্রোপলিসের থামের মতো উরুতের মাঝখানে
ভাঁটফুলের গন্ধমাখা যোনির কাছে থেমে রইলো কাতর হাওয়া...
দ্বারভাঙ্গা জেলার রমণী

আমার দুচোখ তোমার সঙ্গে—লীলাময় হাত, মৃদু অঙ্গুলি—(লঘু পদযুগ, ক্ষীণ কটিতটে দারুণ দোলানি দেখে উরুদেশ) হেম দুই বুক জেগে ওঠে আজ স্তনে বর্ণে.....
'সিন্ধিতে এক উৎসব'

কাব্যের প্রয়োজনে, যদি যোনি জঙ্ঘা আসে তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু অনিবার্য চর্বিত চর্বন বিশেষ উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করে। সেই উদ্দেশ্যে যে বাড়িতে বসে আছেন কবি সেই

বাড়িকে খুশি করার জন্যই। আর তার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার তা সুনীল ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন। তা তাঁর স্বীকারোক্তিতেই রয়েছে।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় জীবন বদলে নিলাম আমি ও নিখিলেশ,
হাতঘড়ি ও কলম, পকেট বই, রুমাল—
...একা সিঁড়ি দিয়ে নামবার,
সময় মনে পড়লো—ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
এসবও বদলানো দরকার, যেমন মুখভঙ্গি ও দুঃখে, হাসির মুহূর্ত
নিখিলেশ ক্রুদ্ধ ও উদাসীন, এবং কিছুটা ধূর্ত।
...লোভ ও শাস্তির মুখোমুখি এসে আমার পূজা ও নারীহত্যা
তোর দিকে, রক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে আমিও অগত্যা
প্রেমিকের দিকে যাব, স্তনের উপরে মুখ, মুখ নয়
এক জীবনে উরুর সামনে উরুর ধ্যান ও অস্থিরতা
উরু নয়, যোনির সামনে লিঙ্গ,....
...দুপুরে হঠাৎ রাস্তায় আমি তোকে
সুনীল সুনীল বলে ডেকে উঠবো, পুরোনো আমার নামে,
দেখতে চাই চোখে
একশো আট পল্লব কাঁপে কিনা, কতটা বাতাস লাগে গালে ও হৃদয়ে
ক হাজার আলপিন কত রূপান্তর জন্মে, শোকে পরাজয়ে
সুখ, সুখ নয়, পাপ, পাপ নয়, দোলে, দোলে না, ভাঙে, ভাঙে না মৃত্যু, স্রোতে
আমি, ও আমার মতো, আমার মতো, ও আমি, আমি নয়
একজীবন দৌড়াতে দৌড়াতে....'জুয়া'

জীবনের ঘোড় দৌড়ে যেমন অমেয় সুখের আনন্দ ভোগ করেছেন, সেই সুখ সম্ভোগ সুখ। এই সুখ অমেয় কি না জানিনা। কবির ক্ষেত্রে যে তা হয় নি, সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

'বড় বেশি ভালোবাসা দিয়েছিলে চরিত্র দূষিত হয়ে গেল
কী করে খরচ করব সে সম্পদ, অথচ জমিয়ে রাখা সেই কারণে
যায় না কিছুতে
পচে যায়, গন্ধ হয়, সমস্ত শরীরে
প্রণয়ের পচা গন্ধ, পাশের চেয়ারে কেউ ঘৃণায় বসেনা। 'বড় বেশি'

এখন সবেতেই বিস্বাদ বন্ধুবান্ধবরা তার তেমন করে বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে হাজির হয় না। প্রতিটি দিন, রাত্রি একাকীত্বের যন্ত্রণায় জেরবার। সালতামামি করতে গিয়ে কেবলই মনে হয়—

'আমি ভুল সময়ে জন্মেছি। তাই কিছুই চিনতে পারি না
বেলা বাড়ে, দিন যায়, তবু একি ঘোর একাকীত্ব
এই সব শুকনো নদী, পিচ বাঁধানো রাস্তা কিছুই
আমার ভালো লাগে না

নারীদের কাছে আমি পশুর মতন গন্ধ শুঁকি, তাদের ওষ্ঠ, বুক ও নাভি লেহন করি, মনে হয়, এ নয়, এ নয়... 'ভুল সময়ে'

কোন কিছুতেই মন লাগে না। পল অনুপল কেমন যেন দীর্ঘ অমানিশা মনে হয়। সবেতেই বিরক্তি লাগে। এমন কি প্রিয় আকাঙ্ক্ষার যে নারী, সেই নারীকেই ছুঁতে আজ গা ঘিন ঘিন করে—

এখন আমার ওষ্ঠে লাগেনা কোন প্রিয় স্বাদ
এমনকি নারী এমনকি নারী এমনকি নারী
মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই...

'মন ভালো নেই'

আজ আর কোন নারীকেই প্রেমিকা লাগেনা। গোটা সমাজ আজ পচনের মুখে। নারীরাও। ভারতীয় নারীর সেই সনাতন ঐতিহ্য কোথায় হারিয়ে গেছে। ওদের জীবনের ছন্দ কেটে গেছে।—

যদিও সম্প্রতি দেখছি তোমাদের শরীরের বাহার খুলেছে আরও /বেশি চামড়ায় মসৃণ গন্ধ, বুকটুক চমৎকার, দাঁত থাকলে আরও কথা শুনতে ইচ্ছে হয়।

ওষ্ঠাধর ভেজা ভেজা, শীতের দেশের মতো হাসাহাসি পোষাকের নিচে /এসব কিসের জন্য, এই দ্রুত জেগে ওঠা, প্রতীক্ষার তীব্র আক্রমণ?

সন্ধ্যের পরেও বাড়ির বাইরে থাকতে পারো, একা একা সব রাস্তা চেনা
বিবাহের আগেই এই পৃথিবীটা ধ্বংস হবে কিনা না জেনে

বায়োলজিকাল ফুর্তি করা চলে, সাজনের সঙ্গে এক সুরে হল্লা করে /অন্তত সাতটি আত্মা নিয়ে খেলা— 'মেয়েদের জন্য ভুল ছন্দে'

কিন্তু নারীর এই আনাড়ি স্বভাব অন্তত সাতটি আত্মা নিয়ে খেলা করার বদলানো স্বভাব এর জন্য কবি নিজে কম দায়ী নয়? একথা কে বলবে? যে বাড়িতে বসে তিনি যে সংস্কৃতি চর্চা করছেন সেই সংস্কৃতির অনিবার্য ফলশ্রুতি তো এই বেলাল্লাপনা। কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতি তো এইটাই চেয়ে এসেছে এতোকাল। তারা তো খুশি, ভীষণ খুশি।

কবি ও নারীসঙ্গকে এখন খেলা নিছক খেলা মনে করেন। যে কোন সময় উৎসবে ব্যসনে শ্মশানে সর্বত্রই নারীর মুখোমুখি হলেই অন্তরাত্মা অভ্যস্থ খেলায় লীন হয়ে যায়।

'আমাদের জিভে জিভে খেলা শুরু হয়
নদীর ছোট কোমল স্তন ও

পারস্য ছুরিকার মতন উরুদ্বয়ে
আমি দিই গরম আদর' 'পুনর্জন্মের সময়'

কবি নিজেই যে পারিপার্শ্বিক গড়ে তুলেছেন সেখানে নারী পণ্য, নিশ্চয়ই পণ্য। পণ্যের সমাজে নদী, নারী সবই পণ্যের সম্পর্কে বাঁধা। অথচ কবির অন্তরাত্মা চায় পবিত্র কুমারী। যে কুমারী অনাঘ্রাতা পুষ্প। অন্তত কয়েক মুহূর্তের প্রশান্তিতে খুঁজে পাওয়া যাবে।

'অরুণা রয়েছে ঘুমে—
যেরকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে ঘুম স্পটত নীল,
যে স্তনে লাগেনি দাঁত তার খুব মৃদু ওঠাপড়া
তলপেটে একটুও নেই ফাটা দাগ, এ শরীর আজও ঋণী নয়...
আমি অরুণার ঘুমে এক ঘুম ঘুমোতে চাই আজ মধ্যরাতে
অরুণার শাড়ি ও সায়ার ঘুম, বুকে ঘুম, কুমারী চোখের
পবিত্র নরম ঘুম, আমি ব্রাহ্মণের মতো তার প্রার্থী।' 'কঙ্কাল ও সাদা বাড়ি'

কিন্তু পবিত্র অনাঘ্রাত পুষ্প এখন কোথায় পাওয়া যাবে? এখন প্রেমের সংজ্ঞা নিরুপণ করতে কবি অপারগ।

'—প্রেম কি নেশার বস্তু; শুধু ঘাম?
— কি বললে শুধু কাম!
মোটেই না!
ওষ্ঠের লাবণ্য স্পর্শ, সে কি কাম?
কোমর জড়িয়ে ধরে শরীরের গন্ধ নেওয়ার
কিংবা যদি মিলনের নেশা জাগে
কী মধুর তীব্র খেলা....' 'ধ্যানী'

প্রেম, কাম, নারী নরক সবই একাকার কবির কাছে। যেন তিনি অভিশাপে জর্জরিত। ক্ষত বিক্ষত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চিহ্নে অস্থির দিশেহারা

'প্রতিদিন পথ চলা কি পথের বুকে পদাঘাত?
নারীর বুকে দাঁত বসানো কি শারীরিক আক্রমণ?
শীতের সকালে খেজুর রস খেতে ভালোলাগা
কি শোষক সমাজের প্রতিনিধি হওয়া?
প্রথম শৈশবে সরস্বতী মূর্তিকে আলিঙ্গন করা কি পাপ?
এসব বিষয়ে আমি মনস্থির করতে পারিনি...' 'দুটি অভিশাপ'

এখন বন্ধুরা আসতে যেতে আড়ালে কটাক্ষ করে। সেই কটাক্ষ ও কুটবাক্য কানে এসে লাগে। তীব্র জালা অনুভব করে কবি এক হাত নিয়েছেন সমালোচকদের।

'কেউ শরীরবাদী বলে আমায় ভর্ৎসনা করলে, তখন ইচ্ছে হয়
অভিমানে অশরীরী হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাই।
...আমি অশরীরী এখন, আমি যেন গীর্জার অন্দরের মতন
পবিত্র বিশেষণ, সমস্ত প্রতীক অগ্রাহ্য করা শ্রেষ্ঠ প্রতীক, এখন
'সমাজ' শব্দটি শুনলে পাট ভেজানো জলের গন্ধ মনে পড়ে। কেউ
'ক্ষিদে পেয়েছে' বললে, মনে হয়, আহা লোকটি বড় নিষ্ঠাবান
অর্থাৎ ধ্যান, এখন আমার ধ্যান, আর বিস্মরণ নয়, ধ্যান—
কিন্তু যাই বলে। চারপাশে অপ্সরীর নৃত্য না থাকলে চোখ বুজে ধ্যানও জমে না।
এও তো শরীর, পথের ধুলো ও শরীরবাদী
আহা, শরীরের দোষ নেই। সে অশরীরীর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে—
—'শরীর অশরীর'

প্রেম, কাম, নদী, নারী এমনই কবির জীবনে জল ভাত যে সকাল দুপুর সন্ধ্যে মধ্যরাত এমনকি সুখ স্বপ্নের ভোর সবেতেই নারীর সান্নিধ্য চাই। এমন কি তথাকথিত পবিত্র ধ্যান নিদিধ্যাসনেও নারীসঙ্গ চাই। এই শ্রোণী সাধনা কবির জীবনে যৌবন বিকাশের সময় থেকেই নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। কবির স্বীকারোক্তি।

'আমার ঠাকুরদাদা মন্দিরের পুজুরী ও ঘন্টা বাজাতেন
ছোট মাসী নামাবলী কেটে ব্লাউজ বানিয়েছেন লো-কাট;
ছোট মাসী, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে গিয়ে
প্রথম যৌন আনন্দ পেয়েছিলাম 'এক সন্ধেবেলা আমি'

কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে না। নষ্টের বীজ যার মধ্যে থাকে সে সন্নিষ্ঠ পরিবেশ, জল, হাওয়া পেলেই অঙ্কুরিত বিকশিত হয়ে ডালপালা মেলে ধরে। ফলে কবির এই বখে যাওয়া সুযোগ সন্ধানী ঠাণ্ডা বাড়ির ডাক পেয়ে শিবিরকে তুড়ি মেরে গোত্রান্তরে যাওয়া সবই আজ কবির পক্ষে অভিপ্রেত মনে হয়। কিন্তু সব কিছুতেই এক সময়ে একঘেঁয়েমি পেয়ে বসে। বাড়ি, গাড়ি, নদী নারী সবেতেই। এই যে এখন অঢেল সম্পদ, অফুরন্ত—চাইলেই হাতের কাছে সবই আসে। তবু কেন বিচ্ছিন্নতা যে পেয়ে বসছে। অতীত ভিড় করে। কিন্তু অতীত জীবন নিয়ে ভাববার ফুরসৎ নেই। ফুরসৎ থাকলেও সাহস হারিয়েছেন কবি। এখন কেমন যেন ন্যুব্জ কুব্জ কঠিন কর্কশ জীবন যাপন। ভাই বন্ধু প্রিয় পরিজন সবই একাকার—

'আমার যমজ ভাই দুঃখ আজ বহুদিন পলাতক
তার খোঁজে ইতি উতি যাবো—ইদানীং সময় পাই না...
...সে অনেক/ আগেকার কথা
তখন বাতাস ছিল হিরন্ময়

তখন আকাশ ছিল ব্যক্তিগত
তখন মাংসের লোভে যাইনি আমরা কেউ উঁচু প্রতিষ্ঠানে
তরল আগুন খেয়ে মাঝরাতে দেখিয়েছি হাজার ম্যাজিক
তখন বাতাস ছিল... সে অনেক
আগেকার কথা।
এখন অন্যের বাড়ি অকস্মাৎ ঢুকে পড়লে সব কথা থেকে যায়
বিষয় বদলাতে গিয়ে গ্রীষ্মকালে কেউ শীতে কাঁপে
এমন কি নারীরাও...
আমার কঠিন মুখ, আচমকা কর্কশ বাক্য... নিজেই চমকে উঠি
যেন এক রণক্ষেত্র, পিঠ ফেরালেই আছে শত শততীর... 'ভাই ও বন্ধু'

যে ঠাণ্ডা ঘরে এখন তাঁর আসন পাকাপোক্ত তিতিবিরক্ত হয়ে যে ছেড়ে চলে যাবেন সে উপায় নেই। তিনি ছাড়তে চাইলেও কমলি ছাড়বে না। তাই কবির আর্তনাদ।

'যাবার কথা ছিল ফেরার পথ নেই
এখন বেলা গেল।
পিশাচী সভ্যতা ঝড়ের ছল করে
ওড়ায় পারাবত...
... জেনেছি মৃত্যুর আড়ালে খেলা করে
স্নেহের শৈশব
যাবার কথা ছিল ফেরার পথ নেই
এখন বেলা গেল।' 'বেলা গেল'

কবিতা দিয়ে যেটুকু প্রয়োজন ছিল কতৃপক্ষের সেই প্রয়োজন মিটতেই কবিকে বানালো গদ্যকার। তার শেষের দিকে লেখা কবিতা আর আগের মতো সাবলীল নয়। কেমন যেন প্রাণহীন রসকস হীন বাধ্য উচ্চারণ। অবশ্য এর জন্য কবি উৎসাহিতই ছিলেন প্রথম দিকে—

... গদ্য লিখলে ক্যাশ আসে। পারি না। কবিতায় দশ টাকা/ তাইবা মন্দ কি। কত দীর্ঘ দিন বন্ধুদের টেবিলে বসিনি।/ কতই তো দিলে বিধি—চোখ, নাক, হাত, ডিগ্রি, জিভ, ঘোরাঘুরি/কয়েকখানা বড়ো সাইজ উপন্যাস শেষ করার সামর্থ দিলে না?/শিল্পের জননী নাকি দুঃখ? সর্বনাশ, আমার তো কোন দুঃখ/ নেই। খুব গোপনে জানাচ্ছি/ (একমাত্র টাকা কিংবা দুঃখ না-থাকার-দুঃখ যদি গণ্য হয়।)/ কে কোথায় পায়নি প্রেম, এর সঙ্গী ভোগ করছে ওর সন্ধ্যেবেলা/ এসব চমৎকার লাগে। 'অনর্থক নয়'

আর্থপ্রাপ্তি কবিতা লেখা ছাড়তে উৎসাহিত করলেও প্রথম দিকে, কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতি তাঁকে ব্যবহার করলেন নানাভাবে। সুনীল নিজেকেও ব্যবহৃত হতে দিলেন প্রচারের

লোভে। তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি এখানে তুলে ধরছি—

'তবে আমার এখনও মনে হয় এখন অনেক লেখা লিখতে হয়, যেগুলো আমার লিখতে ইচ্ছা করে না। তাই মনে হয়, মাঝে মধ্যে ছুটি পাওয়া যেত এই বছর দুয়েক। তাহলে বেশ কাটাতাম। তবে যে লিখতাম না তা নয়, তবে কম। ধীরে ধীরে লিখতাম। তাতে ভালো হতো, কিন্তু আমার তো উপায় নেই।' (সাহিত্য সেতু, সুনীল সংখ্যা ৮৫)

সম্পাদকের নির্দেশে ফরমায়েসি লেখা লিখতে লিখতে, কেবল লেখার জন্য লেখা লিখতে কবি এখন ক্লান্ত। বিধ্বস্ত। ওঁকে দিয়ে কর্তৃপক্ষ যখন শ্রোণী বন্দনায় সফল হল। এক কথায় নারী শরীর নিয়ে কুৎসিৎ চটকানো শেষ হলো তখন নতুন কোন বিষয় তো কবিকে দিতে হবে সেই বিষয় ও কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত সম্পাদক ঠিক করে দিলেন তা হলো অতীত মনীষীদের অন্তর্গত জীবন নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করো। আর এই টানা হ্যাঁচড়ায় অবশ্যই যৌনতা মুখ্য হবে।

কবি নতুন বিষয় পেয়ে গিয়েই ফরমায়েসি লেখা লিখতে শুরু করলেন। 'সেই সময়'। শুরু হল হৈ চৈ। মনীষীদের অতীত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নাকি খুঁজে পেলেন কেউ সমকামী, কেউ জারজ, কেউ তৃতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক ইত্যাদি। এমন কি বামপন্থী সরকারও এই উপন্যাসকে পুরস্কৃত করলেন। আগ মার্ক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী যিনি একই সঙ্গে দুই নৌকায় পা রাখতে অভ্যস্ত, তাঁরই একান্ত উদ্যোগে এই ব্যাপারটা ঘটে। সমস্ত বাঙ্গালী সংস্কৃতির লজ্জাকে সার্টিফিকেট দেওয়ার মত ঘটনাও দেখা গেল। কিভাবে পশ্চিমী চক্রান্ত রন্ধ্রপথে ঢুকে পড়েছে তার অন্যতম উদাহরণ এই ঘটনা।

অবশ্য সারা কলকাতায় এই নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ঋজু বক্তব্য রাখতে কেউই পিছপা হননি। তখন কবির নিজের জবাবী ভাষণ শুনলে সত্যিই স্তব্ধবাক হয়ে যেতে হয়। আমি তা আনুপূর্বিক তুলে ধরলাম।

প্রশ্ন ঃ 'সেই সময়' উপন্যাসে আপনি উনবিংশতি শতাব্দীর প্রাতঃস্মরণীয়, বিভিন্ন চরিত্রকে মুখ্য না ধরে কালীপ্রসন্ন সিংহকে ধরলেন কেন? এই রকম একটা অপরিচিত চরিত্রকে জনমানসে আপনার ভাবনায় এলো কি করে? নবীনকুমারকেই বা জারজ হিসাবে দেখালেন ক্যানো?

উত্তর ঃ আমার মনে হয়েছিল কালীপ্রসন্ন সিংহকে একটা প্রতীকি চরিত্র তৈরী করা যেতে পারে। তাকে কেন্দ্র করে বাকী সবাইকে আনা উচিত। ধরো ঐ সময় কেউ ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছিলো, কেউ খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছিলো, কেউ হিন্দু কেউবা ডিরোজিওর শিষ্য হচ্ছিলো, কালীপ্রসন্নর মধ্যে এর সবগুলি মিশ্রণ আছে। ও ব্রাহ্ম সমাজে গ্যাছে, ব্রাহ্ম হয় নি। খৃষ্টানদের মধ্যে মিশেছে কিন্তু খৃষ্টান হয় নি। আবার গোঁড়া হিন্দু ছিল না। অথচ বিদ্যার চর্চা করেছে। সবগুলোই ছিল। এই জন্য ওকে আমি বাস্টার্ড করেছি। মানে ঐ জন্মের ব্যাপারের মিশ্রণের একটা প্রতীকি ব্যাপার আর কি। সব একটা জায়গায় মিশে

গেছে এই রকম আবার কোন একটা দিকে বিরাট একটা কিছু করছে তাও না।

তারপর ওর তো অনেক ত্রুটিও ছিলো। সেই সময় ও বাবু কালচারের প্রতিনিধি হিসাবে ওপরে উঠতে চেয়েছিলো। বিজ্ঞানচর্চা করেছিলো। মহাভারত অনুবাদ করেছে। আবার মদ্যপান, বারবনিতা গমন ইত্যাদি দোষও অনেক আছে। দোষগুণে ভরা একটা চরিত্র। মানুষ হিসাবে যাকে উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ উনবিংশতি শতাব্দী কালচারটা তো মিশ্র?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়, কালচারটা মিশ্র। তখনকার দিনে সংস্কার মুক্তির যত কথা আছে; গরীবদের বিষয়ে কোন কথা নেই। সবই ধনী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা। এইভাবে কি একটা দেশকে পাল্টানো যায়? না, পাল্টানো যায় না। এদেশে গরীবদের সংখ্যা বেশি। এই ধরো ব্রাহ্মদের কথা। কোন চাষা, ধোপা, মজুর, নাপিত কি ব্রাহ্ম হয়েছিলো?

প্রশ্ন ঃ ঐ উপন্যাসে মধুসূদন ও গৌর বসাকের সম্পর্ক নিয়ে আপনার প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছিলো?

উত্তর ঃ ঐ বিষয়ে আমি কনভিনসড। আমি যা লিখেছি, ওরকম একটা ঘটনা ঘটেছিলো—তা চিঠিপত্র পড়ে জেনেছি। তার মানে এই নয় মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে গৌর বসাকের ঐরকম সম্পর্ক সারাজীবন ছিলো। ঐ রকম বয়সে ঢের হয় তারপর কেটে যায়। এই এখনই ধর না, আকছার ঘটছে না? (সাহিত্যসেতু, সুনীলসংখ্যা ৭৬-৭৭)

কি অপূর্ব যুক্তি। ভাবতে অবাক লাগে ঐরকম সর্বাধিক প্রচারিত ব্যক্তি কি করে সর্বাধিক খেলো যুক্তি খাড়া করতে পারেন। যেহেতু কালীপ্রসন্ন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল তিনি ধর্মের অন্ধত্বে ধরা দেননি তাই বাস্টার্ড বলেই তাঁর এইরকম দৃঢ়তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বিজ্ঞানচর্চা যেমন করেছেন, মহাভারত অনুবাদ করেছেন তেমনই আবার মদ্যপান, বারবনিতা গমন ইত্যাদি দোষও অনেক আছে। অতএব তিনি বাস্টার্ড নামের যোগ্য। কি হাস্যকর এই বক্তব্য। সুনীল নারীদেহ নিয়ে যে এত চটকালেন। শয়ে শয়ে লেখা লিখলেন, কিন্তু এর জন্য তিনি নিজেকে কি বলতেন? তিনি বোধ হয় কখনোই মদ্যপান করেন না, বারবনিতা, ছিঃ, তোবা তোবা। কোন মেয়েকেই কখনো নষ্ট করেননি? সেই সুনীল কালীপ্রসন্ন সিংহকে বাস্টার্ড আখ্যা না দিয়ে কাকে দেবেন? কারণ কালীপ্রসন্নের অনেক ত্রুটি ছিল। আজকের সুনীল যে একদম ত্রুটিমুক্ত পৌরুষ!

তিনি উনবিংশ শতাব্দীর কালচারকে একহাত নিয়েছেন কেননা তাঁদের লেখায় সংস্কার মুক্তির যত কথা আছে গরীবদের বিষয়ে কোন কথা নেই। সবই ধনী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা। অতএব তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করায় বাধা নেই। অর্থাৎ সুনীলের শয়ে শয়ে লেখার গরীবদের বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে ধনী উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা নেই।

মধুসূদন ও গৌর বসাকের অন্তর্লীন জীবনের সাক্ষীর জবানবন্দী থেকে জেনেছেন তাঁরা নাকি সমকামী। আবার একথাও বলছেন ঐরকম বয়সে ওটা হয় তারপর কেটে যায়। কি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি! ইতিহাস খুঁজে গবেষকগণ প্রত্ন খোঁজেন সুনীল যত্ন নিয়ে ইতিহাস থেকে কৃমিকীট খুটিয়ে তুলেছেন। তারজন্য যুক্তিও তৈরি করছেন এইভাবে,

প্রশ্ন ঃ ইদানীং দেখা যাচ্ছে যেখানে প্রতিষ্ঠিত লেখকরা পূর্বসূরী কবি সাহিত্যিক লেখকদের সমালোচনা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন তখন আপনি কিন্তু পূর্বসূরী লেখকদের শুধু নয় রাজনীতির নেতাদের এমনকি বিধান যায় জহরলাল নেহেরু ইত্যাদিদেরও নির্মম সমালোচনা করতে ছাড়েননি। এই অপ্রিয় সত্য ভাষণের সাহসিকতা কি করে পাচ্ছেন, যেখানে অন্যান্যরা সতর্কভাবে এড়িয়ে গ্যাছেন বিতর্কের পথ থেকে।

উত্তর ঃ না না সাহসিকতা টাহসিকতা কিছুই নয়। আমি বলব আমি কিছু ভেবে চিন্তে লিখিনা। মানে সাবধানী নই। এটা লিখলে অমুক মনে কষ্ট পাবে বা অমুক রাগ করবে এসব চিন্তায় আসে না। আমার যেটা মনে আসে সেটাই লিখে দিই। তবে বিদেশী সাহিত্যিকদের লক্ষ্য করে দেখেছি তারা সব সময় আগেকার লেখকদের এ্যাসেসমেন্ট করে। আমরা করি কি, সবাইকে মাথায় তুলে পুজো করি। আমি আগেকার লেখকদের সঠিক ত্রুটি খুঁজে বের করি তাহলেই এটা অশ্রদ্ধা করা হলো না। অনেকে এড়িয়ে যায় মানহানির ভয়ে। আমার ওসব মাথায় আসে না।" (সাহিত্যসেতু ৮৫-৮৬)

বাঃ সুনীল বাঃ। আপনি নাকি সঠিক ত্রুটি খুঁজে বের করেছেন আগেকার লেখকদের। কে জারজ, কে সমকামী, কে তৃতীয় শ্রেণীর ইত্যাদি। এসবই তো তাঁদের সাহিত্য কর্মেরই ত্রুটি। ব্যক্তিজীবন বাদ দিয়ে কি সাহিত্যকর্ম হয়? তাই না? এই দেখুন আপনার ব্যক্তি জীবন কত স্বচ্ছ সুনির্মল শয়ে শয়ে লেখা জোগায় দেশ পাল্টানোর কথা, গরীবদের শোষণ মুক্তির লেখা-কি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আপনি। আপনারই তো কেবল সাহস টাহস আছে. আর সবাইতো ভীতুর ডিম।

কে বললো আপনি শোষণ মুক্তির কথা লেখেননি। কবিতায় তো আপনি সেই কাজটুকু বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই অন্তত একবার হলেও করেছেন। যার জন্য প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রেও আপনার লেখা নিষ্ঠার সঙ্গে ছাপা হয়। একথাটুকু অন্তত না লিখলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

'একজন মানুষ মুক্তিফল আনতে গিয়েছিল,
সে বলেছিল, আমি ফিরে আসবো
প্রতীক্ষায় থেকো।
... আমি দ্বাদশ বৎসর থাকবো তার জন্য পথ চেয়ে
তার পরেও সে না ফিরলে
আমাকে যেতে হবে...

আমিও না ফিরলে যাবে আমার সন্তান-সন্ততিরা। 'আমার স্বপ্ন'

আপনি যদি প্রগতিশীল না হোন তো কাকেই বা প্রগতিশীল বলব? ইদানিং আপনি আপনার অবস্থান সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

প্রবন্ধ ও রম্যরচনা, অনুবাদ, পাঁচ বছর আগের
শুরু করা উপন্যাস, সংবাদ পত্রের জন্য জল মেশানো।
গদ্য থেকে আজ এই সাড়ে দশটায় আমি সব ভেঙেচুরে
উঠে দাঁড়াতে চাই—অন্ধ চোখ, ছোট চুল—ইস্ত্রি করা পোষাকও
হাতের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে আমি এখন তোমার
বাড়ির সামনে, নীরা থুক করে মাটিতে থুতু ছিটিয়ে
বলিঃ এই প্রাসাদ একদিন আমি ভেঙে ফেলবো।
এই প্রসাদে এক ভারতবর্ষ ব্যাপী অন্যায়।
এখানে থেকে পুনরায় রাজতন্ত্রের উৎস।' 'নীরা ও জিরো আওয়ার'

এতদিনে সত্যি সত্যিই ঠাণ্ডা ঘরকে চিনে ফেলেছেন সুনীল। কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতির সর্বশেষ পরিণতি গণতন্ত্রের নামাবলীর আড়ালে রাজতন্ত্রের নখর। সবই ধরতে পারলেন। কিন্তু সেখানে থেকে তো আপনার বোরোনোর কোন পথ নেই। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে যেভাবে প্রথম আলোয় আলোকপাত করে চলেছেন তা আপনার কর্তৃপক্ষ ভজনার শেষ পেরেক হিসেবে চিহ্নিত। ঐ বাড়িতে ঢোকা যায় বোরোনো যায় না। এই কিছুদিন আগেই তো একজন বেরিয়ে আসার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। তার প্রতিফল তো সচক্ষে দেখেছেন। দশলক্ষ টাকার ইনকাম ট্যাক্সের অনাদায়ী বিল। শেষ পর্যন্ত সুড় সুড় ঐ রন্ধ্রে ঢুকে পড়া ছাড়া কোন গত্যন্তরই ছিল না।

আপনারও ফেরবার পথ নেই। একথা আপনি লিখেওছেন। আপনি ফেরেনওনি। আপনাকে আমাদের মতো কাগজের পক্ষ থেকে কোন একজন লেখা চাইতে গেছিল, আপনার আক্ষেপ শুনে তো সে তাজ্জব বনে গেছে। যদি সে এসে ঠিক ঠিক সত্য কথা বলে থাকে তো কথাটা এইরকম দাঁড়ায়। প্রগতিশীল কাগজ চাইছে দেশ হতে, আর দেশ চাইছে প্রগতিশীল হতে, এর বাইরে একটা স্বচ্ছন্দ লেখার জায়গা চাই।—আমরা সেই বাতাবরণ তৈরি করেছি। আপনি কি আপনার ঠাণ্ডা বাড়ির অভিজ্ঞতা সাহস টাহসের সঙ্গে আরো কিছু লিখতে পারবেন?

অন্তত আপনার সম্পর্কে একটু ভিন্ন লেখা লিখতে পারবো তাহলে। সেই আশায় রইলাম কিন্তু..... না, হল না, আপনি বিদায় নিলেন।

■ ড. রাসবিহারী দত্ত—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা

জসীমউদ্দীন ঃ পল্লীকথার রূপকার

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে বাংলা কাব্যজগতে রবীন্দ্র-নজরুলের প্রভাব ছিল সক্রিয়। সেই অপ্রতিহত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চেয়ে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হল কল্লোলগোষ্ঠী। শুরু হল আধুনিক কবিতা। কবি জসিমউদ্দীনও কল্লোল যুগের কবি হলেও তাঁর কবিতায় কখনোই তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল না। আধুনিক কবিতার জগতে তাঁর আবির্ভাব পল্লীর মেঠো পথের ধূলি গায়ে, রাখালের বাঁশি হাতে। সোচ্চারে তিনি বলেছিলেন—

"আমার পল্লী মায়ের কুটির কোণেই রয়েছে জীবনের শত ঐশ্বর্যের ঝাঁপি।
আমি তা থেকেই উপকরণ নিয়ে লিখব আমার কবিতা।"[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সারা বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বাংলা কাব্যজগতে কবি জসিমউদ্দীনের (০১.০১.১৯০৩—১৪.০৩.১৯৭৬) আবির্ভাব। আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে তাঁর কাব্যধারা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির দাবি রাখে। সাবলীলতা, সহজবোধ্যতা, সুর সম্পৃক্ত বর্ণময়তার ভুবন নির্মাণ করেছিলেন তিনি; গ্রাম-বাংলার অনাড়ম্বর জীবনচর্চার শিকড়ের সন্ধান করেছিলেন তিনি। তাঁর কাব্যধারার ছত্রে ছত্রে মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও আন্তরিকতা দৃশ্যমান। একদিকে রাবীন্দ্রিক কাব্যদ্যুতি, অন্যদিকে আধুনিক কবিদের দুর্বোধ্য জটিল কাব্য প্রকরণের মাঝখানে কবিতায় রাখালিয়া সুরের আন্তরিকতায় স্বভাবতই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি।

রবীন্দ্র-নজরুল প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের স্নেহধন্য কবি জসিমউদ্দীন বাংলা কাব্যের জগতে প্রধানত 'পল্লী কবি' হিসেবেই সুপরিচিত। ১৯০৩ খ্রিঃ ১লা জানুয়ারী (মতান্তরে ১৯০২ বা ১৯০৪) বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত তাম্বুলখানা গ্রামে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর। তাঁর পিতা মৌলবী আনসারউদ্দীন আহমেদ মোল্লা, মা আমেনা খাতুন। তাঁর ডাক নাম রাঙা ছুট্টু। আনসারউদ্দীন স্কুল শিক্ষক এবং একসময় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রূপেও সম্মানিত ছিলেন। কবির বংশগত উপাধি 'মোল্লা'। কিন্তু তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, কিশোর বয়সে কাগজ প্রকাশের জন্য তিনি কাজী নজরুল ইসলামের কাছে একটি কবিতা পাঠালে নজরুল স্বয়ং জসিমউদ্দীনের নামের পর 'মোল্লা' শব্দটি কেটে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি দ্বিতীয়বার আর 'মোল্লা' শব্দটি ব্যবহার করেননি। পিতা আনসারউদ্দীনের সাহিত্যানুরাগ এবং অন্ধ দাদা দানুমোল্লার লোকগানের প্রতি অনুরাগ কবিমনে শৈশবে সঞ্চারিত হয়। স্বয়ং কবির স্মৃতিচারণা—'আমার কবি-জীবনের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল এই দাদার গল্প, গান ও কাহিনীর ভিতর দিয়া।...."[২]

জসীমউদ্দীনের প্রাথমিক শিক্ষা গোবিন্দপুরের অম্বিকা মাষ্টারের পাঠশালায়। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বি. এ. (১৯২৯), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা এম. এ. (১৯৩১) পাশ করেন। ১৯৩১-৩৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্রসেনের তত্ত্বাবধানে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট রূপে কাজ করেন। ১৯৩৮-৪৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক এবং ১৯৪৪ সালে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত-ভাগের পর ঢাকায় এসে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগে Additional Song Publicity Organizer রূপে নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালে প্রচার বিভাগে Deputy Director রূপে অবসর গ্রহণ করেন।

সরকারী প্রচার দপ্তরের কর্মকর্তা রূপে জসীমউদ্দীন দেশে ও বিদেশে নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র, স্কটল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক, বার্মা, চীন, পশ্চিম জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীতের সভ্যরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫১ সালে যুগোশ্লাভিয়া, ১৯৫৩ সালে Good-will Mission-এর সভ্য রূপে মধ্য এশিয়া ও তুরস্ক এবং ১৯৫৬ সালে রেঙ্গুন ভ্রমণ করেন। এই সমস্ত ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তিনি নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন—যুগোশ্লাভিয়ায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় লিখেছেন 'হলদে পরীর দেশে', আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় লিখেছেন 'চলো মুসাফির', রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় লিখেছেন 'যে দেশে মানুষ বড়', জার্মানীর অভিজ্ঞতায় লিখেছেন 'জার্মানীর শহরে বন্দরে' প্রভৃতি।

জীবিতকালেই কবি জসীমউদ্দীন দেশে ও বিদেশে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভে সমর্থ হন। যেমন ১৯৫৮ খ্রিঃ প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'Pride of Performance', ১৯৬৯ খ্রিঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে D. Lit. উপাধি, ১৯৭৪ খ্রিঃ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (অবশ্য পরে কবি তা প্রত্যাখ্যান করেন)। ১৯৭৬ খ্রিঃ 'একুশে পদক', 'হলদে পরীর দেশে' UNESCO পুরস্কার, ১৯৭৮ খ্রিঃ 'স্বাধীনতা দিবস' পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রভৃতি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ১৪ই মার্চ রবিবার তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী তাঁর নিজ গ্রাম গোবিন্দপুরে ডালিম গাছের তলায় সমাধিস্থ করা হয়।

কলেজে ছাত্র থাকাকালীন 'কবর' কবিতা লিখে সাহিত্য সমাজে জসীমউদ্দীন কবিরূপে খ্যাতিমান হন। তিনি মূলত কবি; গদ্য রচনাও অনেক আছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি উল্লেখ করা গেল—

কাব্য ঃ 'রাখালী' (১৯২৭), 'নক্সীকাঁথার মাঠ' (১৯২৯), 'বালুচর' (১৯৩০, 'ধানক্ষেত' (১৯৩৩), 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪), 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি' (গান ১৯৩৫),

'রূপবর্তী' (১৯৪৬), 'মাটির কান্না' (১৯৫১), 'গাঙের পাড়' (গান), 'সকিনা' (১৯৫৯), 'জলের লিখন' (১৯৫৯), 'সুচয়নী', (১৯৬১), 'মা যে জননী কান্দে' (১৯৬৩), 'হলুদবরণী' (১৯৬৬), 'জারীগান' (গান ১৯৬৮), 'পদ্মানদীর দেশে' (কাব্যানুবাদ, ১৯৬৯), 'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে' (১৯৭২), 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো' (১৯৭৬), 'মুর্শিদাগান' (১৯৭৭)।

নাট্যগ্রন্থ ঃ 'পদ্মাপার'/'গাঙের পার' (১৯৫০), 'বেদের মেয়ে' (১৯৫১), 'মধুমালা' (১৯৫১), 'পল্লীবধূ' (১৯৫৬), 'গ্রামের মায়া', 'ওগো পুষ্পধনু' (১৯৬৮)।

শিশুতোষ গ্রন্থ ঃ 'হাসু' (১৯৩৮), 'এক পয়সার বাঁশি' (১৯৪৯), 'ডালিমকুমার' (১৯৫১), 'পাকিস্তানী রূপকথা' (১৯৫৩)।

গল্পগ্রন্থ ঃ 'বাঙ্গালির হাসির গল্প' (১৯৬০)।

উপন্যাস ঃ 'বোবাকাহিনী' (১৯৬৪)।

স্মৃতিকথা ঃ 'যাঁদের দেখেছি' (১৯৫২), 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনা' (১৯৩৮), 'স্মৃতির পটে' (১৯৬৮)।

ভ্রমণকাহিনী ঃ 'চলো মুসাফির' (১৯৫২), 'হলদে পরীর দেশে' (১৯৬৫), 'যে দেশে মানুষ বড়' (১৯৬৮), 'জার্মানীর শহর ও বন্দরে' (১৯৭৬)।

জীবনীগ্রন্থ ঃ 'জীবনকথা' (১৯৬৪)।

জসীমউদ্দীনের শৈশব শিক্ষা ফরিদপুরে। ঈশান স্কুলের পণ্ডিতমশায় ক্ষীরোদ বাবু তাঁর কবি জীবনের একজন প্রেরণাদাতা। কবি নিজেই বলেছেন ".....কবিতা রচনা বিষয়ে তিনি আমাদের নানা উপদেশ দিতেন।"[৩] তাঁর কবি জীবনের আর একটি মনোরম আশ্রয় সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া ও আড্ডা—'এখানে আসিলে ভালোবাসা, স্নেহ মমতা, শান্তি। সুযোগ পাইলেই আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিয়া থাকিতাম।"[৪]

কবির শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কেটেছে গ্রামজ ও লোকজ পরিবেশে, বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ময়দানে, খাল-বিল-নদীতীরে, নাম-না-জানা ফলমূল আর পাখ্-পাখালির সন্ধানে, সাধু সন্ন্যাসীর আখড়ায় ও আড্ডায় এবং কখনোবা জনসেবায়। পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীজনের সান্নিধ্য লাভ এবং স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়া—ইত্যাদি তাঁর কাব্যকবিতার রসদ যুগিয়েছে।

কবি জসীমউদ্দীন বাংলা কাব্যে এক অভিনব ভাবধারা এনেছেন। অখ্যাত, অজ্ঞাত পল্লীজনদের প্রেম-বিরহের করুণ গাথাকে মর্মস্পর্শী ও আবেগধর্মী ভাষায় ফুটিয়ে তুলবার প্রেরণাই তাঁর কবি-মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই প্রেরণাই তাঁর কাব্যধারাকে এক অভিনব ভাবরসে অভিসিক্ত করেছে। নব্যরীতির আধুনিক কাব্যবলয়ে তাঁর আভির্ভাব ঘটলেও তিনি প্রচলিত আধুনিক কবিতার ধারায় কবিতা রচনা না করে পল্লী বাংলার গাথা রচনার ধারায় নিজের কবি প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। ভাব ও ভাষার কারুণ্য

ও কোমলতায় তাঁর কাব্যের আবেদন সর্বজনীন। তাঁর কবিতা বর্ণনাময় এবং ব্যঙ্গ-বর্জিত। দার্শনিকতার পরিবর্তে চিত্রময়তায় এবং ভাব গভীরতার পরিবর্তে ভাবালুতায় তাঁর কবিতা পাঠককে আকর্ষণ করে; এক নস্ট্যালজিক আবেগে ও আবেশে মুগ্ধ করে। কখনো-বা কল্পনার নৌকায় পাঠককে রূপকথার জগতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—

"কোন দেশে রাজ কনে-খালি ঘুম খায়,
ঘুম যায় আর হাসে হিম্-সিম্ বায়।
সেই দেশে যাব আমি কিছু নাহি চাই,
ছোট মোর বোন্‌টিরে যদি সাথে পাই"![৫]

জসীমউদ্দীন পল্লী-নির্ভর কবি। কেননা, পল্লীর প্রাণের ধারাই তাঁর কবিহৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধা। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের উপরও পল্লীজীবনের প্রভাব পড়েছে। পল্লীর জীবন ও প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর কাব্যের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে বলে তাঁর কাব্য আন্তরিকতার স্পর্শে সতেজ ও জীবন্ত। তিনি পল্লীর জীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশকে একেবারে নিজের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে নিয়েছেন। তাই তাঁর লেখায় শুধু নয়, তাঁর হাবে-ভাবে, চলনে-বলনে সর্বত্র পল্লীজীবনের আধিপত্য। শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জসীমউদ্দীনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"একেবারে সাদামাটা আত্মভোলা ছেলে এই জসীমউদ্দীন। চুলে চিরুণী নেই, জামায় বোতাম নেই, বেশবাসে বিন্যাস নেই। হয়তো বা অভাবের চেয়েও ঔদাসীন্যই বেশি। সরল শ্যামলের প্রতিমূর্তি সে গ্রাম তারই পরিবেশ তার ব্যক্তিত্বে, তার উপস্থিতিতে। কবিতায় জসীমউদ্দীনই প্রথম গ্রামের দিকে সংকেত, তার চাষা-ভূষা, তার খেতখামার, তার নদীনালার দিকে। তার অসাধারণ সাধারণতার দিকে। যে দুঃখ সর্বহারার হয়েও সর্বময়।

যে দৃশ্য অপজাত হয়েও উঁচু জাতের। কোনো কারুকলার কৃত্রিমতা নেই, নেই কোনো প্রসাধনের পরিপাট্য। একেবারে সোজাসুজি মর্মস্পর্শ করবার আকুলতা। কোনো 'ইজমে'র ছাঁচে ঢালাই করা নয় বলে তাঁর কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।"[৬]

বাংলার মাঠ-ঘাট, গাছ-পালা, লতা-পাতা, খাল-বিল এবং বাংলার লোক-সমাজের বিরহ ব্যথা ও শোক-দুঃখের কাহিনী তাঁর কবিতায় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দিয়েছে বলেই তাঁর কাব্যের আবেদন চিত্তস্পর্শী, আন্তরিকতায় পূর্ণ ও মর্মান্তিক। হৃদয়-নিঙড়ানো ভালোবাসা ও দরদ দিয়ে তিনি গ্রামবাংলার কৃষাণ-কৃষাণীর, তাদের স্নেহ-মমতা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যর্থতা ও শোচনীয়তাকে নিজের মন ও জীবনের সঙ্গে এক করে নিয়ে তাঁর কাব্যের ডালি সাজিয়েছেন। সেজন্য তিনি গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী জাতীয় কবি।

গ্রাম-বাংলার আনাচে-কানাচে জীবন ও প্রকৃতির যে রূপ ও ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে কবি পরম মমতায় সাহিত্যে তার চিত্রকল্প তৈরী করেছেন। তাঁর কাব্যের চরিত্রগুলিকে প্রকৃতির আদলে নিরীক্ষণ করেছেন বলে তাদের বর্ণনায় মানুষ ও প্রকৃতিকে নিয়ে অনেক উপমার মালা গেঁথেছেন। অনাড়ম্বর কবিত্বের নির্মল মাধুরীগুণে তাঁর কবিতার ভুবন নিরন্তর স্পর্শকাতর থাকে, পল্লীবালকেরা তাদের স্বজনদের নিয়ে অবলীলায় মূর্ত হয়ে ওঠে; ষড়ঋতু সেই অনুরাগের চিত্রে নিজেকে আবিষ্কার করে পুলকিত চিত্তে হিল্লোলিত হয়। আসলে তাঁর কাব্যে পল্লীবাংলার অনুরাগের সঙ্গে পল্লীবালকের হৃদয়কে জুড়ে দিয়ে তিনি চিত্রকল্প-নির্মাণ করেছেন এবং তার সঙ্গে লীলাময় হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্যও। গ্রামবাংলা যেন তাতে নতুনরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর কাব্য-কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে আমাদের আলোচনা তথা জসীমউদ্দীনের কবি-প্রকৃতি সুপরিস্ফুট করা যায়।

'রাখালী' (১৯২৭) জসীমউদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'কবর', 'মা', 'পল্লী জননী', 'কিশোরী' প্রভৃতি কবিতা এই কাব্যের প্রধান আকর্ষণ। জাতির অন্তরের বাণীকে 'কবর' কবিতায় কবি মর্মান্তিক রূপ দিয়েছেন। কবিতাটির ভাব ও ভাষা বিশ্বজনীন ধারা প্রবাহে অভিষিক্ত। অনাড়ম্বর পল্লীর ভাবকে কবি সহজ সরল অথচ মার্জিত ও মাধুরীপূর্ণ পল্লীর ভাষাতে ব্যক্ত করেছেন। উপমা প্রয়োগের কুশলতাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। বাংলা কবিতার নতুন দিগদর্শন এ কবিতাটি। কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনকে খ্যাতিমান করে তোলে। কবিতাটি পড়ে শ্রদ্ধেয় দিনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য—

"দূরাগত রাখালের বংশীধ্বনির মতো তোমার কবিতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।"[৭]

এই এলিজি ধরনের লোকগাথামূলক কবিতাটি ড্রামাটিক মনোলগ-এর আদলে রচিত। ক্রিশ্চিয়ানা রসেটির 'They grew in Beauty side by side", জন মিলটনের 'Lycidas', শেলির 'Adonoais', টেনিসনের 'In Memorium' প্রভৃতি কবিতার ভাবগত মর্মবাণী 'কবর' কবিতাটিকে যেন স্পর্শ করেছে বলে মনে হয়।

সবুজে ঘেরা গ্রামকেন্দ্রিক নদীমাতৃক পূর্ববাংলার সজীব প্রকৃতির অতি মনোরম বর্ণনা তিনি তুলে ধরেছেন "রাখালী" কাব্যে 'রাখাল ছেলে' কবিতায়—

"ওই যে দেখ নীল-নোয়ান সবুজ-ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়া পা;
সেথায় আছে ছোট্ট কুটীর সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ আকাশে ছড়িয়ে পড়া আবীর রঙে নাওয়া।"[৮]

"রাখালী" কাব্যের সব কবিতাই কবির ছাত্রাবস্থায় লেখা। "রাখালী" পাঠে কবি—সমালোচক কালিদাস রায়ের মন্তব্য—

"যতীন্দ্রমোহন ও কুমুদরঞ্জন বঙ্গের পল্লীপ্রকৃতিকে দেখিয়াছেন হিন্দুর চোখে। শ্রীমান জসীমউদ্দীন তাহাকে বাঙালির চোখে দেখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের দৃষ্টিতেই দেখিয়েছেন।"[৯]

ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'শান্তি' নামক এক মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায় সমালোচক আবুল ফজল লিখেছেন—"রাখালী" প্রসঙ্গে—

"শহরকে বাংলাদেশ বলিলে ভুল করা হইবে, শহরের জীবন বাঙালীর জীবন নয়। শহর বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। .... এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতায় পল্লী ও পল্লীজীবনের কাব্যরূপ অপূর্ব সুন্দর মূর্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[১০]

এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'কবর'-এ প্রিয়জন -হারা এক বৃদ্ধের দুঃসহ শোকচর্চার করুণ কাহিনী মর্মন্তুদ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। গ্রামীণ বৃদ্ধটি তাঁর পৌত্রের কাছে স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনীর অকাল-প্রয়াণের বেদনাদায়ক কাহিনী একের পর এক প্রকাশ করেছেন। বৃদ্ধের বক্তব্যের সুতীব্র জীবনানুভূতি ও অসামান্য হৃদয়বোধে ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত মোস্তাফা কামাল-এর মন্তব্যে প্রস্ফুটিত—

"উপকরণের ভেতরে জসীমউদ্দীন যে সুতীব্র সহানুভূতির বিদ্যৎ সঞ্চারিত করেছেন তার পরিণাম এক অবিমিশ্র করুণ রস। সেটাই শিল্প। পরিমিতির সামান্য তারতম্য এখানে রসাভাসের কারণ হতে পারতো।"[১১]

কবি একদা তাঁর বড় ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে একই পরিবারের কয়েকজনকে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছিলেন। এই শোকাবহ ঘটনা এই কবিতাটি রচনার বাস্তব ভিত্তি।

কবিতাটির শুরুতে বৃদ্ধটি তাঁর স্ত্রীর কবর দেখিয়ে শোকাবহ স্মৃতি রোমন্থন করেছেন এবং বলেছেন—"তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।"[১২]

স্ত্রীর মৃত্যুর তিরিশ বছর পরেও বৃদ্ধের এমন উক্তিতে তাঁর প্রকৃত প্রেমিক সত্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর পুত্র ও পুত্রবধূর মর্মান্তিক মৃত্যুর বর্ণনায় ও তাদের প্রেম-ভালবাসাপূর্ণ জীবনের কথা স্মরণ করে আবেগ-বিহ্বল হয়েছেন। সন্তান-হারা পিতা গভীর মমতায় বলেছেন—

"জোড়-মাণিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।"[১৩]

এর পর ছোট্ট নাতনীর কবর দেখিয়ে বৃদ্ধটি স্নেহার্ত হৃদয়ের ব্যথা ব্যক্ত করে আশ্চর্য আবেগময় ভাষায় বলেছেন—

"ব্যথাতুর সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।"[১৪]

—এইভাবে এক পল্লীগ্রামের বৃদ্ধের অবুঝ-প্রলাপোক্তিতে তাঁর একাধিক প্রিয়জনের মৃত্যু দর্শনের শোচনীয় স্মৃতি ঘনীভূত হয়েছে। এই মৃত্যু বর্ণনায় বৃদ্ধের সরলচিত্তের প্রেম-প্রীতি স্নেহ-ভালবাসার বিগলিত প্রকাশ ঘটেছে।

'পল্লীজননী' কবিতায় কবি পল্লীর দরিদ্র মুসলমান ঘরের এক নিঃসঙ্গ বিধবা নারীর একমাত্র সন্তান-বিয়োগের মর্মান্তিক করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে পল্লীগ্রামের সুপারীবাগান, বাঁশবন, পুকুর, ডোবা, হুতোম পেঁচা, মশা, মাছি প্রভৃতির বাস্তবধর্মী বর্ণনা অতি চমৎকার হয়েছে। পল্লীগ্রামে আজও হুতোম পেঁচার ডাককে অশুভ-মৃত্যুর সংকেত বলে মনে হয়। এ কবিতায় সেই প্রসঙ্গ চমৎকার রূপ পেয়েছে—

"ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এলো বুঝি হায়! হাঁকে মায়, দূর-দূর।"[১৫]

এ কবিতায় পল্লীগ্রামেরএক অসহায় পরিবারের করুণ মর্মন্তুদ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। রোগে পথ্য জোগাতে না পেরে বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে।

"রাখালী" কাব্যের 'পাহাড়িয়া' কবিতায় কবি পল্লীগ্রামের সাংসারিক স্নেহের আর একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। এক বৃদ্ধের একমাত্র কন্যার মৃত্যু এখানে করুণ ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এই কাব্যের 'মা' কবিতায়ও পল্লীগ্রামের মড়কের মৃত্যু কিভাবে মায়ের বুক শূন্য করে দেয় তার মর্মন্তুদ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এক মায়ের সাত ছেলে মেয়ে মড়কে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে সন্তানহারা মায়ের অসহায় বিলাপোক্তি করুণ হয়ে ওঠে।

'জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়' কবিতাটিতেও জেলে ও জেলেনীর শঙ্কাপূর্ণ পারিবারিক জীবনের বাস্তবচিত্র কবি তুলে ধরেছেন। 'বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়' কবিতায় পল্লী সমাজের বৈরাগী ও বোষ্টমীর সরল জীবনচিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। 'মেনা শেখ' কবিতায় কবি মেনা শেখ চরিত্রায়ণে পল্লীগ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর চরিত্র উন্মোচিত করেছেন।

"রাখালী" কাব্যগ্রন্থের 'সিঁদুরের বেসাতি' গীতিনাট্যে এক সিঁদুর বিক্রেতা বেনে কীভাবে সিঁদুর বিক্রয়ের ছলে ধীরে ধীরে এক পল্লীবালিকার মনে প্রেমের জাল বিস্তার করেছে তারই সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত। পল্লীবালিকার সেই অকৃত্রিম প্রেমের বিরহজ্বালা যে কী নিদারুণ তা তার মুখে ব্যক্ত হয়েছে—

"ওই বিদেশী বানিয়া মোরে পাগল কইরা গেছে
আমার মন কাড়িয়া নেছে রে সজনি!
শাঁখা না কিনিতে আমি হাতে বান্ধলাম ডোর,
সিঁথির সিন্দুর কিনে চক্ষে দেখি ঘোর।"[১৬]

"রাখালী" কাব্যের সর্বশেষ কবিতা 'বোশেখ শেষের মাঠ'-এ চৈত্রের শুষ্কতা ও

শূন্যতার পটভূমিতে বালুচরের বুকে জেগে ওঠা সবুজ ধানের প্রাণবন্যা এবং তা দেখে কবিচিত্তের আশা, আনন্দ ও ঘনীভূত আবেগ ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের কল্যাণে কৃষকের ত্যাগ ও সাধনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে কবি বলেছেন—

"ওগো চাষী! গাঁয়ের চাষী! সেলাম তোমার পায়,
বাড়ি তোমার উজান চরে কিম্বা গফর গাঁয়;
ম্যালেরিয়ায় মরছ তুমি রুগ্‌ণ জবুথবু;
সারাটি দিন মরছ খেটে পাও না খেতে তবু।"[১৭]

'বালুচর' ১৯৩০-এ কবির বেদনা-কাতর, হৃদয়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে। শূন্য বালুচরের বেদনা ও কবি-হৃদয়ের বেদনা এক হয়ে মিশে গেছে এই কাব্যে। 'উড়ানীর চর', 'হাসি', 'কাল সে আসিবে', 'কাল সে আসিয়াছিল' প্রভৃতি এই কাব্যের উৎকৃষ্ট কবিতা। এই কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। কাব্যটির আর্কৃণ এই কারণে যে—

"কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মত।
চখা আর চখি নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।"[১৮]

'বালুচর' কাব্যের বালুচরে বেদনা ও কবিহৃদয়ের বেদনার অনুভূতির পীড়নের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন—

"এই পুস্তক রচনার সময়ে রাতের পর রাত আমি ঘুমাইতে পারিতাম না,
আহার করিতে পারিতাম না।"[১৯]

'নকসী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯)-এ পল্লীর দুটি চাষীর ছেলে-মেয়ের প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে গাথা কাব্যটি রচিত। এখানে প্রেমের যে চিত্র আছে তার মধ্যে নর-নারীর বিচ্ছেদ-পীড়িত হৃদয়ের বেদনাকেই কবি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত করুণা ও দরদ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। পল্লী প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাষার সহজাত লাবণ্যে মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে অপরূপ হয়ে উঠেছে :—

"মাঠের মাঝে জলীর বিলে জলো'রঙের টিপ,
জ্বলছে যেন এ-গাঁর ও-গাঁর বিরহেরই দীপ।"

কিংবা

"জনম কালো মরণ কালো, কালো ভুবন ময়,
চাষীদের ঐ কালো ছেলে সব করেছে জয়।"[২০]

বসন্ত ও গ্রীষ্মের শুরুতে পল্লী বাংলায় যে ভীষণ খরা দেখা দেয়, তাতে মাঠ, ঘাট যেন পুড়তে থাকে; এই অবস্থায় এক পশলা বৃষ্টির জন্য গ্রামের লোকের যে কী আকুল প্রার্থনা তা প্রকাশিত হয়েছে এ কাব্যের কবিতায়—

"আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,

নাকের নোলক বেচিয়ে দিব তোমার মাথার ছাতি,
কৌটা-ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়।
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।"[২১]

বর্ষাকালের শ্যামল সবুজ তমাল তরুর সঙ্গে এ কাব্যের রূপাই এর যৌবন সুন্দর দেহটিকে উপমিত করে যে চরণ রচিত হয়েছে তার শিল্পগুণ কবির বিরল কবিকৃতির স্বাক্ষর বহন করে—

"বাদল-ধোওয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী-মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।"[২২]

ঋতুচক্রের চিরাচরিত নিয়মে বর্ষার পরে আসে শরৎ, আসে ভাদ্র—বিচ্ছেদ -পীড়িত নারীর হৃদয়ের জ্বালা তাতে কতটুকু প্রশমিত হয় বোঝা যায় না। তারপর আসে পাকাধানের ঋতু হেমন্ত, মাঠেমাঠে হলুদ বরণধানের অফুরন্ত শোভা। কৃষকের বুক ভরে উথলে ওঠে আশা-ভরসার ফেনায়িত ফল্গু। ষড়ঋতু গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবন ও তার চিরায়ত প্রকৃতিকে যে শোভা আর সৌন্দর্যের ডোরে বেঁধে রেখে অপরূপ করে তোলে, তার সঙ্গে পল্লীর কোন যুবক-যুবতীর অনুরাগের সৌহার্দ সম্পর্ক যোজনা ঋতু জীবনের সমন্বিত বৈশিষ্ট্যে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে—

"আজও এই গাঁও আঝোরে চাহিয়া ঐ গাঁওটির পানে
নীরবে বসিয়া কোন কথা যেন কহিতেছে কানে কানে
মধ্যে লুটাইয়ে দিগন্ত জুড়িয়া নক্সীকাঁথার মাঠ
সারা বুক ভরি কি ব্যথা সে লিখি নীরবে করিছে পাঠ।"[২৩]

কবির "রাখালী" কাব্যগ্রন্থের পর প্রকাশিত হয় বহুপ্রশংসিত কাব্যগ্রন্থ "নকসীকাঁথার মাঠ" (১৯২৯)। এই কাব্যে সম্পূর্ণ পল্লীর পটভূমিতে ১৪টি পরিচ্ছেদে দুটি গ্রাম্য ছেলের প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ ও বিষাদজনক পরিণতির চিত্র এঁকেছেন কবি। শ্রদ্ধেয় চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্যসম্পর্কে বলেছেন—

"'নকসীকাঁথার মাঠ' রচয়িতা শ্রীমান জসীমউদ্দীন নতুন লেখক, তাতে আবার গল্পটি একেবারে নেহাৎই যাকে বলে ছোট্ট এবং সাধারণ পল্লীজীবনের। শহরবাসীদের কাছে এই বইখানি সুন্দর কাঁথার মতো করে বোনা লেখার কতটা আদর হবে জানি না। আমি এটিকে আদরের চোখে দেখেছি, কেননা এই লেখার মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীজীবন আমার কাছে চমৎকার একটি মাধুর্যময় ছবির মতো দেখা দিয়েছে।"[২৪]

তবে অবনীন্দ্রনাথ বাবুর এ আশঙ্কা সত্যতায় পরিণত হয়নি। নাগরিক জীবনের জয়জয়কার যুগেও এ কাব্য সর্বজনচিত্ত জয় করেছে। পল্লী ও পল্লীজীবন এ কাব্যের মুখ্য আকর্ষণ। কাব্যটিকে গ্রামবাংলার বাস্তব জীবনের দলিলও বলা যায়। এই কাব্যে পল্লী

বাংলার বালক-বালিকার অপরূপ প্রেমের পাশাপাশি গ্রাম্য উৎসব-অনুষ্ঠান, জমিজমা নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা, লুঠ-ত্রাস, গ্রাম্য-কলহ প্রভৃতি তুলে ধরেছেন কবি। কাব্যটির ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন—

"এই গ্রন্থের চরিত্রগুলি সবই গ্রাম্য। আমরা যেভাবে ভাবি, তাহারা সেভাবে ভাবে না। আমাদের হইতে তাহাদের জীবন একেবারে ভিন্ন রকমের। তাই গ্রন্থের চরিত্রগুলির ভিতরে কথোপকথন জুড়িতে আমি যতদূর পারিয়াছি, তাহা গ্রাম্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।"[২৫]

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৩-৩৪) কাব্যটিতেও পল্লীর দুটি চাষীর ছেলে-মেয়ে সোজন ও দুলির প্রেমের বেদনাময় আলেখ্য বিচ্ছেদ-পীড়িত হৃদয়ের বেদনা কবি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত করুণা ও দরদ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কবির কবিত্বশক্তির মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে এ কাব্যে। দুটি নর-নারীর দাগহীন প্রেম ভালোবাসা কিভাবে দুটি ভিন্ন সমাজের নানা প্রতিকূল অবস্থা বিষের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে—সেই বেদনা বিধূর চিত্র কবি এঁকেছেন এ কাব্যে। দুলির দেহের রূপ বর্ণনা প্রকৃতির রঙে এবং সংরক্ত আবেগে চিত্রিত—

"দূর্বা বনে রাখলে তারে দূর্বাতে যায় মিশে
মেঘের ঘাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।"[২৬]

—এ কাব্যে সোজন-দুলির বাল্য প্রেমের মধ্যেও প্রকৃতির সুনিপুণ কারিগরী চিহ্ন বর্তমান—

"সোজন হল বা তটিনীর কূল দুলারী নদীর পানি,
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছড়িয়া করে কূল টানাটানি।"[২৭]

—এই কাব্যে প্রকাশিত ধানের শিষ, টিয়া, ফুলবন, দূর্বাঘাস, লাউ, লতা, বটগাছ, তেপান্তরের মাঠ প্রভৃতি যেন আমাদের নাগরিক কৃত্রিমতায় এক মধুর স্বপ্ন রচনা করে দেয়। রূপকথার রাজ্য হঠাৎ যেন জীবন্ত বা মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের সামনে।

"সোজন বাদিয়ার ঘাট" কাব্যটি ২২টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। 'নকসীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' উভয় কাব্যে গ্রাম্য কিশোর-কিশোরীর করুণ প্রণয়গাথা বর্ণিত হলেও উভয় কাব্যের আবেদন বাস্তব কারণে কিছুটা পৃথক। 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যের প্রেমচিত্র কিছুটা সরল; শেষ পর্যন্ত নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে। কিন্তু 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এ প্রেম অনেকটা জটিলতর হয়েছে। নায়ক-নায়িকা দুই ভিন্ন ধর্মের মানুষ হওয়ায় সমাজ প্রতিবাদী শক্তিরূপে দেখা দিয়ে প্রেমের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হয়েছে। বাহ্যিক প্রতিরোধ ছাড়াও এখানে নায়ক-নায়িকার মানস-দ্বন্দ্বও তাদের প্রেমকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। ফলে প্রেম এখানে সহজ-স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারেনি। এখানে নর-নারীর প্রণয়াবেগ প্রবলভাবে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

তবে এই কাব্যটি মূলত প্রেমমূলক কাব্য হলেও এখানে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান চাষী সমাজের বাস্তবচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে গ্রাম্য মাতব্বর শ্রেণী কীভাবে নিজেদের স্বার্থ-চরিতার্থতার জন্য সাধারণ মানুষকে সর্বনাশের অতলে নিক্ষেপ করে দেয় তা এখানে প্রকাশিত। সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থার পার্থক্য এখানে দেখিয়েছেন কবি। এই কাব্য সৃষ্টির বাস্তব অভিজ্ঞতা কবির বক্তব্যেই সুস্পষ্ট—

"আমাদের ফরিদপুর অঞ্চলে বহু চাষী মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের বাস। তাহাদের মধ্যে সামান্য ঘটনা লইয়া প্রায় বিবাদের সূত্রপাত হয়। এইসব বিবাদে ধনী হিন্দু- মুসলমানেরা উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে সর্বনাশের পথে আগাইয়া দেয়।...এমনি একটি ঘটনা লইয়া এই পুস্তকের সূত্রপাত।"[২৮]

সমাজের কঠোর অনুশাসনে দুই অসমবর্ণের সোজন ও দুলীর প্রেমময় দাম্পত্যজীবন কণ্টকাকীর্ণ হয়েছে। এমনকি তারা অন্যত্র পালিয়ে গিয়েও সুখী হতে পারেনি। সোজনকে পাচারকারী অপবাদে শাস্তি দিয়েছে, দুলীকে অন্যত্র বিয়েও দিয়েছে। কিন্তু সেই বিয়ে সুখের হয়নি। পুনরায় সোজনের সঙ্গে দুলীর দেখা হওয়ায় তাদের দ্বিতীয়বারের বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনও বিপন্ন হয়। এইভাবে পল্লীজীবনের দুর্মর সমস্যাকে কবি আমাদের সামনে মর্মবিদারী চিত্রে রূপ দিয়েছেন।

'ধানক্ষেত' (১৯৩৩) একটি গীতি নির্ভর গ্রন্থ। কবি এ কাব্যের কবিতাগুলিতে পল্লীজীবন ও পল্লী প্রকৃতির অপরূপ ছবি এঁকেছেন। 'ধানক্ষেত', 'গ্রামের প্রান্তর', 'পল্লী বর্ষা', 'জলের ঘাটে', নিমন্ত্রণ' প্রভৃতি এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা। গ্রাম জীবনের সুখ-দুঃখের ভাবচিত্র এবং পল্লী বাংলার রূপচিত্র এই কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে লক্ষিত হয়। প্রকৃতি প্রীতির সঙ্গে জসীমউদ্দীনের কবিতায় মানবপ্রেম যে ধরা পড়েছে এ কাব্যটি তার প্রমাণ। লোকশব্দ দিয়ে গড়া সৌন্দর্যের মধ্যে বারবার ফুটে উঠেছে মানুষেরই জয়গান। তাই পল্লী মায়ের সোনালী স্মৃতির মধ্যে কবি আহ্বান করেছেন তাঁর পরম আত্মীয় ভ্রাতা-বন্ধুকে—

"তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়।"[২৯]

এই কাব্যে চাষী-জীবনের আনন্দ ও ধানক্ষেতের সৌন্দর্য নদীর চর, মাঠ-ঘাট, পুকুর এবং নর-নারীর জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য ও দুঃখ বেদনা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

'রঙিলা নায়ের মাঝি' (১৯৩৫) কাব্যে কবির কতকগুলি পল্লীগান সংকলিত হয়েছে। পল্লীবাসীদের কাছে এই পল্লীগীতির কদর অনেক।

"মাটির কান্না' (১৯৫১) কাব্যে কবিপ্রতিভার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কোন স্ফূরণ

ঘটেনি। অতি আধুনিকতার দিকেই যেন তাঁর মনের প্রবণতা। কাব্যটি তাঁর সৃষ্টি হিসেবে ব্যর্থ। জনৈক সমালোচকের মন্তব্য—

"নিজস্ব কাব্য চরিত্র বর্জন করলে একজন অসামান্য কবিরও যে কি পরিমাণ স্খলন হতে পারে—"তার দলিল মাটির কান্না।"[৩০]

'সকিনা কাব্য'-এ নর-নারীর জটিল প্রেমভাবনা ও আস্তিক্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। মুসলিম শরিয়তী সাধনার দ্বারা নর-নারীর চিরন্তন প্রেম এখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে—

"খোদার নিকট পঞ্চ রাকাত নামাজ আদায় করি
সাতবার সে যে মনে মনে নিল দরুদ-সালাম পড়ি।"[৩১]

এই কাব্যে চাষী-জীবনের আনন্দ ও ধানক্ষেতের সৌন্দর্য, নদীর চর, মাঠঘাট, পুকুর-এবং নর-নারীর জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য ও দুঃখ-বেদনা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

'সুচয়নী' জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন গ্রন্থ। এই কাব্যকে ইতালী ভাষায় অনুবাদ করেছেন ফাদার মারিনো রিগ্যান। 'মা যে জননী কাঁদে' কাব্যটিতে কবির প্রেম-ভালোবাসার মর্মভূমি ছেড়ে রুক্ষ বাস্তবভূমিতে উত্তরণ ঘটেছে। 'হলুদ বরণী' কাব্যে রোমান্টিক সৌন্দর্য, কবি-মনের আবেগার্তি ও প্রেম ভাবনার পরিচিত রূপের প্রকাশে কোনো নতুন চমক নেই। 'জলের লিখন' কাব্যেও প্রেম ও সৌন্দর্যই মূল বিষয়। 'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে' কাব্যে কল্পনার রঙিন রূপ ত্যাগ করে কবি এ কাব্যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সমাজ সচেতন কবি মনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো' কাব্যে লোকসংস্কৃতির প্রতি কবির তীব্র অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে—

"বিগত কালের কলা-কৌশল আনি
এ-যুগে সে-যুগে সেতুবন্ধন দিস মা যতনে টানি।"[৩২]

'হাসু' কাব্যটি মূলত শিশুতোষ গ্রন্থ। শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা হাসুকে উপলক্ষ করে কাব্যটি রচিত। এখানে শিশুমনের গভীরে ডুব দিয়ে তার স্বভাব চরিত্র, একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, আনন্দোল্লাস, চিত্তচাঞ্চল্য, আবদার, বায়না ও কৌতুকময় দেখানো হয়েছে। 'ঠিকানা', 'হাসুর দুঃখ', 'খুকীর সম্পত্তি' প্রভৃতি এই কাব্যের অন্যতম কবিতা।

পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের কাব্য-কবিতায় গ্রামীন-লোকজ শব্দ ব্যবহারের আধিক্য ও রচনারীতিতে গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গী মুখ্য বিশেষত্ব। নাগরিক চেতনা ও সুররিয়ালিজম্‌জাত ধারণাকে তিনি সচেতনভাবে বর্জন করেছেন। তবে গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করলেও তাঁর কবিতায় কোথাও গ্রাম্য রুচির স্থূলতা নেই। মুসলিম সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ প্রকাশে আরবী-ফারসী-উর্দু ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়েছে। যেমন—

"মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর!"[৩৩]

—এখানে 'মজীদ' শব্দের অর্থ মসজিদ, 'আজান' ইসলামী সাম্‌গীতি এবং 'রোজ কেয়ামত' হল শেষ বিচারের দিন।

তাঁর কাব্যে ঋণাত্মক শব্দ নীরস বর্ণনাকে কিছুটা সরস করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারও শ্রুতিমধুর ও অর্থপূর্ণ হয়েছে। যেমন—

"ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করে রে ভাই, ফুল ঝুর ঝুর করে।"[৩৪]

উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহারেও তিনি সমান দক্ষ এবং তার কাব্যে ব্যবহৃত উপমা ও চিত্রকল্পগুলি পল্লীজীবন থেকেই উৎসারিত। যেমন—

"এমনি করে কত কথাই কত জনের মনে আসে,
আশ্বিনেতে যেমনিতর পানার বহর গাঙে ভাসে।"[৩৫]

কবি জসীমুদ্দীনের জীবনদৃষ্টি মহোত্তম মানবিক অনুভূতিতে ভাস্বর। যাবতীয় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচিতি উদাত্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কণ্ঠস্বরে। 'শিশুর সংকল্প' কবিতায় শিশুর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছ মহামিলন মন্ত্র। তাঁর কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় গ্রাম-বাংলার শোচনীয় দুর্দশা, কৃষকদের অন্নহীনতা, অসহ্য যন্ত্রণা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, মানবপ্রেমের জয়গান প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে।

বস্তুত জসীমউদ্দীনের কৃতিত্ব এখানেই যে—

(১) 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক হয়েও কল্লোলীয় আধুনিকতা ও রবীন্দ্র-বিরোধিতা থেকে তাঁর দূরত্ব রক্ষা করা।

(২) উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবে সর্বশ্রেণীর পাঠকের আত্মীয় হয়ে ওঠা।

(৩) বস্তুস্বাতন্ত্র্য ও সহজ ভাবনায় মনকে স্পর্শ করবার দক্ষতা।

(৪) পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ বা একাত্ম হয়ে মানবপ্রেম ও দুঃখকে বোঝার প্রচেষ্টা।

(৫) প্রবাদ-প্রবচন, লোকগীতি, লোকনাট্যের অনুষঙ্গকে কবিতায় প্রকাশ করা। আঞ্চলিক বাগভঙ্গির নিখুঁত ব্যবহার।

(৬) সহজ-সরল ভাবনায় জীবনসত্যকে প্রকাশ করা

তবে তাঁর কাব্যে কিছু সীমাবদ্ধতাও দেখা যায়। তাঁর সুদীর্ঘ একান্ন বছরের কবিতাচর্চার (১৯২৫-৭৬ খ্রিঃ) মধ্যে প্রথম দিকের কাব্যগুলি (যেমন—'রাখালী', 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' প্রভৃতি) যতটা ভাবনা ও কল্পনায় উজ্জ্বল, পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যে উপাদানের স্বল্পতা ও ক্লান্তিকর অতীত রোমন্থন অনুভব লক্ষ করা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর আপন হাতে গড়া কাব্যের জগতে অমরত্ব লাভ করেছেন। গ্রামবাংলা এতখানি

জীবন্ত ও আন্তরিকভাবে ধরা দেয়নি অন্য কোনো কবির কাব্যে। এ দিক দিয়ে তিনি শুধু পল্লীকবি নন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী-কবিও এবং, পল্লীকথার অনন্য রূপকার।

তথ্যসূত্র ঃ

১। জসীমউদ্দীন ঃ 'যাঁদের দেখেছি', প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫২, পৃষ্ঠা-৭১। 'কবর' কবিতা প্রকাশের পর দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক জসীমউদ্দীনকে লেখা পত্রে উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্ট্য।

২। জসীমউদ্দীন কবিতা, গদ্য ও স্মৃতি—তিতাস চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ, আষাড়, ১৪০০, পরিশিষ্ট ক, পৃ. ১৭৫

৩। 'জীবনকথা' পৃ. ১৩০

৪। তদৈব, পৃ. ১৪৭

৫। 'পালের নাও' ৫

৬। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ (কোলকাতা ডি. এম. লাইব্রেরী, চতুর্থসংস্করণ, ১৩৬৬, পৃ. ১১২)

৭। জসীমউদ্দীন ঃ কবিতা, গদ্য ও স্মৃতি, পৃষ্ঠা-১৭৯

৮। জসীমউদ্দীন ঃ "রাখালী", বলাকা প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা-২১

৯। কালিদাস রায়, সম্মেলনী, ১লা পৌষ, ১৩৩৬। 'নক্সীকাঁথার মাঠ' কাব্যের নবম সংস্করণে (১৯৬০) পরিবেশিত 'রাখালী' সম্পর্কে বক্তব্য দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা-৭১-৭২

১০। আবুল ফজল ঃ 'রেখাচিত্র ঃ বইঘর চট্টগ্রাম ১৯৬৫, পৃষ্ঠা-১৩৫-১৩৬

১১। আবুহেনা মোস্তাফাকামাল ঃ 'জসীমউদ্দীনের কবিতা ঃ জীবন ও শি', শিল্পীর রূপস্তর', বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-১৩৩

১২। জসীমউদ্দীন ঃ 'রাখালী', বলাকা প্রকাশনী, নভেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা-২৩

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-২৫

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-২৬

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৪

১৮। 'কাল সে আসিবে', "বালুচর"।

১৯। জসীমউদ্দীন ঃ 'জলের লেখন', পলাশ প্রকাশিনী, ১৯৬৯। কাব্যগ্রন্থের শেষে সংযোজিত পুস্তক-পরিচিতি অংশ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা-৪

২০। 'নক্সীকাঁথার মাঠ'

২১। 'নক্সীকাঁথার মাঠ'

২২। ঐ

২৩। ঐ

২৪। জসীমউদ্দীন ঃ 'নকসীকাঁথার মাঠ', পলাশ প্রকাশনী, বিংশ প্রকাশ, ১৪ই মার্চ, ২০১৩, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ২১ শে জৈষ্ঠ, ১৩৩৬ সালে লিখিত 'নকসীকাঁথার মাঠ' কাব্যের ক্ষুদ্র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২৫। তদেব, কবি লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য
২৬। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'
২৭। ঐ
২৮। জসীমউদ্দীন ঃ "সোজনবাদিয়ার ঘাট ঃ স্টুডেন্টস্ ওয়েজ, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৬০, কবি-লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২৯। 'ধানক্ষেত'
৩০। শামসুর রহমান, বেতার বাংলা, মার্চ প্রথম পক্ষ ১৯৮০, জসীমউদ্দীন কবিতা, গদ্য ও সস্মৃতি, পৃ. ১২
৩১। 'সকিনা কাব্য'
৩২। 'মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো'
৩৩। 'কবর', জসীমুদ্দীন ঃ 'রাখালী', বলাকা প্রকাশনী, প্রথম বলাকা সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা-২৭
৩৪। 'সোজনবাদিয়ার ঘাট', জসীমউদ্দীন, পলাশ প্রকাশনী, ১৮শ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ২০১০, পৃষ্ঠা-১
৩৫। 'জসীমউদ্দীন ঃ 'রাখালী', বলাকা প্রকাশনী প্রথম বলাকা সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা-১০

■ ড. মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

পীযূষকান্তি অধিকারী

কবিতার যোগ-বিয়োগে 'গণিতের শূন্য' ঃ কবি বিনয় মজুমদার

বিশ্বসাহিত্যের বাজারে কবি ও কবিতার শেষ নেই! তার মধ্যে হৃদয়ে দাগ কাটার মতো কবিতার সংখ্যা সীমিত। বাংলা ভাষা সৃষ্টির হাজার বছরের ইতিহাসে কবিতার যোগ-বিয়োগ প্রক্রিয়া নিরন্তর চলছে। নতুন নতুন কবিতা লেখাই কবিতার যোগ। আর এই কবিতা যদি কবিতা না হয়ে ওঠে তাহলে যোগ হয়েও যোগ হল না। আবার কোনো কবিতা যদি যুগোপযোগী না হয় অর্থাৎ শুধু মনের শান্তি প্রাণের আরামের জন্য লেখা হয়, তাতে যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে নীরব থাকেন কবি, সেক্ষেত্রেও কবিতার যোগ, যোগ হয় না। আবার অনেক সময় বড় বড় প্রতিভাবৃক্ষ যদি উপযুক্ত পরিবেশ না পেয়ে শুকিয়ে যায়, বাইরের কোনো সূক্ষ্ম পরিকল্পিত আক্রমণে কবি সত্তা অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়ে—তখন সে ট্রাজেডিও এক করুণ বিয়োগের জন্ম দেয়। এছাড়া শিক্ষিত পাঠকের অভাবে কবিতা বাজারে না কেটে যদি পোকায় কাটে সেক্ষেত্রে কবিতার বিয়োগ বড় মর্মান্তিক। তবে এ বিয়োগের দায় কবির নয়।

কবিতার বিয়োগ অন্যভাবেও ঘটতে পারে। কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর 'শিক্ষাষ্টক' কবিতায় বলেছেন ঃ **"ফ্যাসিবাদীরা বানালে পত্রিকা/গ্রাহক আমি হতে যাব না তার"।** কবির বক্তব্য থেকে আরো একধাপ এগিয়ে জোরের সঙ্গে বলা যায় ফ্যাসিবাদীরাই এখন অধিকাংশ নামিদামি পত্রিকার হোতা, তারাই পত্রিকার। সেখানে সমাজ বিপ্লবী প্রতিবাদী নব প্রজন্মের কবির ঠাঁই মেলা দায়। ফলে অনেক প্রতিভা হারিয়ে যায়, ঘটে বিয়োগ। বর্তমান যুগ ভেজালের যুগ। এ-যুগে প্রশাসক, রাজনীতি, দুর্নীতি সমার্থক শব্দের মর্যাদা পাচ্ছে। 'রাজনীতি বনাম কাজনীতি' প্রবন্ধে ড. সনৎকুমার নস্কর মহাশয় যথার্থই বলেছেন ঃ "গত ১৫ আগস্ট আমরা পেরিয়ে এলাম ৬৫তম স্বাধীনতা দিবস। এই সাড়ে ছয় দশকের মধ্যে..... অসাধু রাজনৈতিক, ঘুসখোর অফিসার, দায়িত্বহীন ভাণ্ডার, সুযোগ সন্ধানী শিক্ষক, ফাঁকিবাজ কর্মচারী, ভাঁওতাবাজ ব্যবসায়ী ইত্যাদিতে সারাটা দেশ পরিপূর্ণ হয়েছে।" কথাগুলি মায়ের স্নেহের মতো খাঁটি। এমন এক ভয়ঙ্কর সামাজিক প্রেক্ষাপটে বড় বড় কবিদের নীরব থাকা বড় বিস্ময়ের। 'কবিরা বড় ভাল মানুষ' কথাটি এযুগে বড় বেমানান লাগে। কবি জয়গোপাল মণ্ডলের ভাষায় ঃ "বড় দুঃসময়। সূর্যের গায়েও অঙ্গারের গভীর ক্ষত।.... উলঙ্গ রাজার স্রষ্টাগণ আজ রাজার আলয়ে, ভোগের রসে হাবুডুবু,....সুনীল দূষিত বাতাসের গন্ধেও সুখে আছে। বাকিদের কথা। না বলাই ভালো।" ('সরণি' / সম্পাদকীয়') ঠিক এমন একটা দুঃসময়ে প্রকৃত যুগোপযোগী কবির অভাব বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় কবি প্রকাশ কুমার মাইতির কবিতা ঃ

"বাবুই এসে জিজ্ঞেস করল কবিকে, আমার
ভাঙা বাসায় একটু খড় দেবে,
এক টুকরো ঘাস? চিন্তিত কবি দুবার চোখ
ঘসলেন, তিনবার মাথা চুলকোলেন,
তারপর বললেন ঃ ঘাস পাবো কোথায়?
তার চেয়ে বরং নিতে পারো দুটো কবিতার বই,
কয়েকটা খোলা কাগজ, তোমার বিছানার
সাদা ধবধবে চাদর হবে।
বাবুই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল, জানালার থেকে
ঝড়ে ছেঁড়া বাসায় আবার ফেরবার সময়
ছুঁড়ে দিল কয়েকটা কথা ঃ
ওরে আর রাত জাগিস না, অ্যাসিড হবে।"

কবি এখানে বলতে চেয়েছেন অনেক কবিই কবি নয়। অনেক কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে না। আবার কোনো প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতা যদি জাতির দুর্দিনে জাতিকে রক্ষার কাজে না লাগে সে ক্ষেত্রে কবিতার 'যোগ' ও 'বিয়োগ' একই অর্থ বহন করে। অর্থাৎ যোগ হয়েও যোগ নয়। কবিতাকে শুধু আবেগ, অনুভুতির বাহন করে রাখলে চলে না। তাতে হুঁকো টানা তাস-আড্ডায় মজে থাকা কর্মবিমুখ বাঙালি স্বভাবের পরিবর্তন অসম্ভব। সমাজ চায় কর্মবিমুখ বাঙালিকে কর্মী হবার মন্ত্র শেখাবে কবিতা, কবি। একমাত্র কবিতা পারে দুর্নীতিগ্রস্ত অপদার্থ শাসক শ্রেণির ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিতে। যেমন দিয়েছিলেন পেত্রার্ক, বোকাচ্চিত, ভার্সেন্তেস; যেমন দিয়েছেন রবীন্দ্রোত্তর কালের দান্তে কবি বিনয় মজুমদার। ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত সমালোচক অমল কুমার মণ্ডল বলেছেন ঃ "বিনয় মজুমদার প্রকৃতই দান্তে কবি। বিনয়ের ডাকসাইটে সুন্দরী গায়ত্রীর মতো দান্তেরও ছিল বিয়াত্রিস। অপরূপা, অনন্যা। বিয়াত্রিসের মতো গায়ত্রীও বিনয়ের কাছে রমণী শ্রেষ্ঠা।..... বিয়াত্রিস হয়তো জানতোও না যে দান্তে তাকে এত ভালোবাসে। বিনয়ের ক্ষেত্রে গায়ত্রী প্রসঙ্গও সমান ভাবে সত্য। ২৫ বছর বয়সে বিয়াত্রিসের বিয়ে হয় এক অভিজাত পুরুষের সঙ্গে। বিনয়ও গায়ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে পান নি।.... কাব্যের মধ্য দিয়ে দান্তে-বিনয় উভয়েই বিয়াত্রিস-গায়ত্রীর সঙ্গ লাভ করেছেন। মানুষ হিসেবে দান্তে পেয়েছিলেন নির্যাতন ও নির্বাসন। বিনয়ও জীবিত অবস্থায় পেয়েছেন নিষ্পেষণ ও নিঃসঙ্গতা।" বিয়াত্রিসকে কেন্দ্র করে দান্তে যেমন লিখেছেন 'Vita Nouva' —নবজীবন; তেমনি গায়ত্রী চক্রবর্তীকে কেন্দ্র করে বিনয় লিখলেন অমর কাব্য 'ফিরে এসো, চাকা'। প্রেম-বিরহের দিক থেকে বিনয় প্রকৃত অর্থে বাংলার দান্তে। তবে বিনয়ের একটি বড় পরিচয় হল তিনি গণিতবিদ। তাইতো তাঁকে বলতে দেখা যায় ঃ

"পৃথিবীতে কোনোকিছু সরলরেখায় পাওয়া অসম্ভব।
ওই রেলগাড়িগুলি পৃথিবীর বাঁকা পিঠে
বাঁকা পথ ধরে চলে যায়।
আমরা যে হেঁটে যাই সেও বক্ররেখা ধরে যাই।
কে যেন আমাদিগকে সরলরেখায় যেতে দেবে না কখনো।
হয়তো বা আমাদের থানার বড় দারোগা কিম্বা অন্য কেউ!
বহু বাঁকা পথ ধরে ঘুরে ঘুরে আমি এই
সব কথা তোমাকে বোঝাই
বোঝাচ্ছি বর্তমানেই বহু বাঁকা পথ ধরে ঘুরে ঘুরে দ্যাখ।"

তাঁর অধিকাংশ কবিতায় গাণিতিক ভাবনা ঘুরেফিরে এসেছে। আসা স্বাভাবিক। ইঞ্জিনিয়ার কবি বিনয় তাঁর কবিতায় নিজেকে 'গণিতাবিষ্কর্তা' বলে তুলে ধরেছেন। একদা সমর তালুকদারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন ঃ "ম্যাথামেটিকস্ ইজ দা ভেরি বেসিস অফ দ্য মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং—আমার কবিতাও তো গণিত—"। সুসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "কফি হাউসের আড্ডার আমলে, বিনয়ের মুখে তার কবিতার চেয়েও বেশি শোনা যেত অঙ্কের কথা। তার উদ্ভাবিত অঙ্কের নতুন নতুন থিয়োরি, যা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না। অনেকেরই ছিল না, বিনয় সেইসব অঙ্ক-পদ্ধতি পাঠিয়ে দিত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, বেশ পয়সা খরচ করে।.....বিনয় তার বিদ্যুৎ চমকের মতন পংক্তিগুলি লিখে বাংলা কবিতাকে ধন্য করেছে।" আমরা জানি ফরাসী কবি পল ভালেরির ধারাবাহিকভাবে কুড়ি বছরের গণিত চর্চার ইতিহাস, কিন্তু বিনয় মজুমদারের মতো গণিত-প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গির কবি বাংলাভাষায় পূর্বে কখনো ছিল না, ভবিষ্যতেও আবার আসার সম্ভাবনা কম।

কবি বিনয়ের মতে, 'কবিতা হচ্ছে চিরস্মরণীয় বাক্য সমষ্টি যা হুবহু মুখস্থ করা যায়।' গণিতে step by step এগোনোর বিষয়টি যেমন থাকে, বিনয়ের কবিতায়ও এধরণের step by step এগোনোর বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। গণিতের মতো তাঁর কবিতায় আবিষ্কারের আনন্দ আছে। যেমন—

ক) মানুষ হল একমাত্র মিথ্যাবাদী প্রাণী।

খ) মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।

গ) পিঁপড়ের এত সরু পায়ে হাড় আছে, মাংসপেশী আছে।

ঘ) তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।

ঙ) রক্তের ভেতরে জ্যোৎস্না; তবু বুঝি আজ পরিশেষে মাংস ভোজনের উষ্ণ প্রয়োজন;.....

চ) বিয়ে করার আগে দেবী হতে হয় কনেকে
অধিবাস ক'রে দেবী হতে হয়।
দেবীর স্বামী স্বভাবত দেবতা।
তাহলে আমার গ্রামের বিবাহিত সব পুরুষ দেবতা।

—এধরণের অসংখ্য চরণ তাঁর কবিতায় হামেশায় চোখে পড়ে। বিনয় নিজেই নিজেকে **'গণিতের শূন্য'** বলেছেন। কবির এই শূন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় শ্রদ্ধেয় কুমারেশ চক্রবর্তীর বিনয় মজুমদার সম্পর্কিত কিছুটা বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে ঃ "শূন্য একটি যন্ত্রণা। দু'শো কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর এক ভয়াল বিশ্বাস উৎসমুখ, যার ভেতর থেকে শুধু জন্মাবার নিশ্চয়তা আছে। একটি শূন্য একটিমাত্র দৃষ্টিকোণের ভেতরেই অগণন দৃষ্টিবোধ হয়ে উঠে আসতে পারে। গাণিতিক নিয়মে এই শূন্য কখনো নেগেটিভ্ হতে পারে না, তার অবস্থানকে বিকৃত না করলে সে সবসময়ই গতির দিকে। গতির সঙ্গে প্রগতির এক মেলবন্ধন থেকে যাবেই। সেইখানে শূন্যের রহস্যময়তা। শূন্য মানে জন্মজন্মান্তরের ক্রিয়াশীল অপেক্ষা, ব্যত্যয়, এক অনাস্বাদিত যুদ্ধক্ষেত্রের হাতছানি, এক আন্দোলনের খোঁজ।.....শূন্য কোনো হাহাকার নয়, শূন্য এক চিরনতুন জন্মলগ্নের ক্যানভাস। কারো ক্ষতিকর রঙতুলি তাকে যত ইচ্ছে উল্টোপাল্টা করুক না কেন প্রয়োজনবোধে সময়মতো সে সাদা হয়ে উঠবে এবং তোমাদের আবার তার কাছে ডেকে নেবে তোমাদের পছন্দ মতো ত্রিভুজ অথবা জীবন ফুটিয়ে তোলবার তাগিদে।"

বিনয়ের কবিতায় অসংখ্য সংকেত আছে; সে সংকেতের হাত ধরে পাঠক সাধারণ বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে পৌঁছে যান বিমূর্ত গাণিতিক রহস্যের প্রাণকেন্দ্র—

"চেনা ও অচেনা সব নক্ষত্রের ভীড় বিশ্বময়।
নক্ষত্রদিগের চোখ, নাক, ভুরু, ঠোঁট, চুল, কান
মনোযোগ দিয়ে দেখি, নক্ষত্রদিগের সঙ্গে কথাবার্তা বলি।
* * * * * * * * *
চাঁদ এসে মাঝে মাঝে নক্ষত্রকে ঢাকে, হয় নক্ষত্রগ্রহণ—।
অথচ কেউই কিন্তু এ নক্ষত্রগ্রহণের হিসাব রাখি না।"

কবি বিনয় ব্যক্তি জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। এক আলাপচারিতায় তিনি বলেন ঃ "সবাই আমাকে নিষ্পেষণ করেছে। কংগ্রেসের নিষ্পেষণ, চাকরি সংক্রান্ত নিষ্পেষণ, বাড়ি ভাড়ার নিষ্পেষণ। নমঃশূদ্রদের তখন বাড়ি ভাড়া দিত না। চারিদিকে নিষ্পেষণ ঃ

"নিষ্পেষণে ক্রমে ক্রমে অঙ্গারের মতোন সংযমে
হীরকের জন্ম হয়, দ্যুতিময়, আত্মসমাহিত।"

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'বিনয় মজুমদার' বিষয়ক এক আলাপচারিতায় বলেন ঃ "একসময় বিনয়ের থাকা খাওয়ার অসুবিধা ছিল।"

যে কবি এক সময় বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেতেন, তাঁকেই বলতে শুনিঃ

"আমি এই ঘরে থাকি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে
তেইশ ঘন্টাই একা একা, বাকি এক ঘন্টা থাকি
বাড়ির বাইরে ওই চায়ের দোকানে
মেলামেশা করি সব দেবতাদিগের সঙ্গে।"

বলতে শুনি ঃ "শুধু আশা কোন্ দিন জীর্ণ বৃদ্ধ হব"—অর্থাৎ জীর্ণ বৃদ্ধ মানে একেবারে সব শেষ। 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যেও নির্যাতনের কথা ভাষা পেয়েছে ঃ

"আমিও হতাশবোধে; অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শুয়েছি একা-কীটদৃষ্ট নষ্ট খোশা, শাঁস।
হে ধিক্কার, আত্মঘৃণা, দ্যাখো, কী মলিনবর্ণ ফল।"

তবে শত নির্যাতন, অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর কলম থেমে থাকেনি। কখনো দীপ্তকণ্ঠে তাঁকে বলতে শুনি ঃ

"আমি 'রামায়ণ' পড়িনি এবং আমি 'মহাভারত' পড়িনি।
কারণ অতি সোজা। কোনো বই যদি যুদ্ধ বিষয়ক
হয় তবে আমি সে বই পড়ি না। পাঠকপাঠিকাগণই
ভালো পারেন যুদ্ধ বিষয়ক বইয়ের একটি তালিকা বানাতে।"

কখনো বলেন আমার কবিতাও তো গণিত ঃ—

"আমি গণিতাবিষ্কর্তা, আমার নিজের আবিষ্কৃত
ঘনমূল নির্ণয়ের পদ্ধতিটি বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক গণিতে
অন্তর্ভুক্ত আর পাঠ্য হয়ে গেছে, যেটি
ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সব বিদ্যালয়ে
পাঠ্য হবে। এর ফলে কুড়ি কোটি ছাত্রছাত্রী আমার গণিত
পড়ে যাবে যত দিন পৃথিবীতে মানুষ ও দেবদেবী রবে।"

কবি বিনয় মজুমদার মনের আনন্দের জন্য কবিতা লিখতেন। আনন্দের স্রোতে ভাসতে ভাসতে গণিতজ্ঞ ও কবির বিপরীত ধর্মী ভাবনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠলেন। দেখালেন কবিতা ও গণিতের মধ্যে সম্পর্ক কত সুগভীর। গাণিতিক দার্শনিকতাকে কবিতার অন্দরমহলে স্থান করে দেওয়ার ক্ষমতা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। এজাতীয় কবিতা সৃষ্টিতে বিনয় সিদ্ধহস্ত। গণিত-কবিতার প্রণয় ঘটাতে বিনয়ের কোনো জুড়ি নেই। তাঁর ভিতরের অনুভূতি বিজ্ঞানের অনুষঙ্গে গণিত কষে। 'সাহিত্যের গতি গণিতে' গদ্য রচনাকালেই তার শেষ অংশে বিষয় যে কবিতাটি লিখেছিলেন তা হলঃ

"অংক, এবং ইন্টিগ্রেশন যোগ অংক
আমাদের ক্লাসিকাল ডিফারেন্সিয়েশন হলো

সামান্য বিয়োগ অংক, এক, ইন্টিগ্রেশন হলো
সাধারণ যোগ অংক। বিশ্বের সৃষ্টির আগে থেকে ক্রমে
আমাদের পুরাতন ক্যালকুলাসের নিয়মসমূহ
বিশেষণ সমূহকে মুখস্থ করেছি, তারপরে
দেখা গেল ওইসব যোগ ও বিয়োগ অংশ
কেন ব্যথা পাও বলে পৃথিবীর বিয়োগে বিয়োগ?’

কবিতাটি সম্পর্কে হিমদল রায় বলেছেন ঃ “এ যেন গণিতের ভেতর দিয়েই রবীন্দ্র ভারাতুর বেদনার কথাই বেজে উঠল বিনয়-সুরে.....।” এ ধরণের সৃষ্টি কবিতায় এক মহাযোগ।

আমরা লক্ষ্য করি, বিনয় তাঁর কবিতায় বিচিত্র অলঙ্কারের প্রয়োগ এড়িয়ে গিয়েছেন। যাওয়া স্বাভাবিক। কারণ বিনয় মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন প্রকৃত রূপের কোনো অবস্থায় রূপান্তর হয় না। ঝঙ্কারমুখর গম্‌গমে ছন্দ, অনেক অলঙ্কার, ধ্বনিসৌকর্য, অন্তমিল সহ নানা সৌন্দর্য-বর্ধক-বিষয় অর্থাৎ হিমদল রায়ের ভাষায় ‘শাঁখা-সিঁদুর থেকে পান-আলতা’—যার সাহায্যে কবি ও তাঁর কবিতাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে দেয় তা কবিতায় নেই বললেই চলে। আসলে বিনয়ের কবিতা হল শ্বাশ্বত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার, যা পাঠককে দুর্বার গতিতে আকর্ষণ করে ঃ

“দৈর্ঘ্য, ভয় ও সময় এই তিন এককের কথা
প্রায়শই উচ্চারিত হয় পৃথিবীতে,
যেন আর কিছু নেই। তিন একক ব্যতীত....
আলোকের পরিমাণ মাপার একক আছে, আরো
শব্দ কত জোর হলো তা মাপার একক রয়েছে
এবং মানুষ—দিন নামেও একক আছে এই পৃথিবীতে।”

কবি বিনয়ের কবিতার বড় বৈশিষ্ট্য— চলার পথের টুকরো-টুকরো অভিজ্ঞতা, ছোট ছোট অনুভূতিগুলিকে মালার মতো গেঁথে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তুলতেন। তিনি শুভবুদ্ধিকে আশ্রয় করে গণিতের হাত ধরে মনুষ্যত্বের জয়গানে ডুব দিয়েছেন এভাবে ঃ

“.....মনে হয়, চারিপাশে মহাকাশময়
অনাদি সময় থেকে, গণিতেরই মতো, বহু কবিতা রয়েছে
চুপচাপ পড়ে আছে কোনো দিন একে একে আবিষ্কৃত হয়
কোনো অঘ্রাণের রাতে বকুল বাগানে খুব মৃদু জোছনায়,
সুডৌল পাতার ফাঁকে গহ্বরের মতো কিংবা ছিদ্রের মতন।”

‘পশ্চিমবঙ্গের পাগলা গারদ সমূহের পরিদর্শক’ জ্ঞানপাগল কবি বিনয় জানতেন

এবিশ্বের অলিতে-গলিতে অনাদরে পড়ে থাকা অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে কোনো না কোনো জায়গায় ‘শূন্যের সুস্থিতি আছে’ অর্থাৎ শুরুর চুন-দাগ আছে। এখানে কবির কাজ হল শুরুর দাগের কাছাকাছি এসে নিজস্ব ক্যারাভ্যানে সামনে পড়ে থাকা অধরা শূন্যের মধ্যকার অমূল্য রত্নের সন্ধান দেওয়া। বিনয় অত্যন্ত সাবলীলভাবে শূন্যকে ব্যবহার করেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর কবিতায় যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে যুক্তির শৃঙ্খল তৈরি করে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন ঃ

ক) ‘এই বিশ্বলোক
টিকে আছে পরস্পর আকর্ষণ ক’রে
এই আকর্ষণ আছে তারার ভিতরে
এই আকর্ষণ আছে পৃথিবীর প’রে।
নারীতে ও নরে
এইরূপ আকর্ষণ থাকা প্রয়োজন।
এই হলো আমার বচন।
একে বলি প্রেম ভালোবাসা।’
খ) ‘মরে গেলে মানুষ জীবিত থাকে স্বপ্নলোকে কল্পনালোকেও।’
গ) ‘.....স্বপ্নলোক আছে
আমাদের এই ইহলোকের মতোন হয়ে আছে।
স্বপ্নে দেখা বাড়িঘর লোকগুলি বর্তমান আছে।’
ঘ) ‘শুধুমাত্র যা আছে তা কল্পনায় দেখাই সম্ভব।
এর বিপরীতভাবে যা সব কল্পনা করি তাই সব আছে।”
ঙ) “মাটিই ধানগাছ হয় ধান হয় এই ধান শরীরের মাংস হয় মাটিই”
চ) “গাছের বুদ্ধিও আছে। /আমার পেঁপে গাছ দেখে/ এই কথা স্পষ্ট বুঝেছি।”
ছ) “গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে পৃথিবীর সব
মানুষের শরীরের যোগাযোগ আছে।
অমাবস্যা পূর্ণিমায় সব
মানুষের বাত বাড়ে। আমারি তো বাড়ে।”

একথা ঠিক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় এক নতুনতম আধুনিকতার স্রষ্টা হলেন বিনয়। গদ্যে-পদ্যে সর্বত্র তিনি এক স্বতন্ত্রভাষার সৃষ্টিকর্তা। আজ তিনি পৃথিবীতে নেই, আবার আছেন। এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের সপক্ষে কিছু কথা বিনয়ের ‘ধূসর জীবনানন্দ’ প্রবন্ধ থেকে তুলে ধরা যেতে পারেঃ

“মরে গেলে পুড়িয়ে ফেললে হয় ছাই। এবং সেই ছাইও ভাবতে সক্ষম, কারণ ছাইয়েরও প্রাণ আছে।

'প্রাণ থেকে প্রাণজন্মে—
জানি এই কথা
মাটি থেকে জন্মে দেখি লজ্জাবতী লতা।'

সুতরাং মাটিতেও রয়েছে প্রাণ; প্রাণ যখন মাটি থেকেই জন্মায়, তখন মাটিতেও প্রাণ আছে। এই কথা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। তবে প্রমাণ ছাড়াই একথা বহুকাল পূর্বে লিখেছেন বাল্মীকি, ব্যাসদেব। কারণ সীতা মাটিরই-কন্যা ছিলেন অর্থাৎ মাটি থেকেই তাঁর জন্ম।"

অর্থাৎ কবি বিনয় এরকমভাবেই এখনও জীবিত রয়েছেন। একথা বিশ্বাসযোগ্যও বটে।

ভালো কবিতা পাঠে এক ধরণের আনন্দের সৃষ্টি হয়; যা পাঠকের মনে এক প্রকার অনুভূতি সৃষ্টি করে। সত্য কথা হল, একটা ভালো কবিতা মনের অবস্থাকে পাল্টে দেয়। 'বহু গণিতের জন্মদাতা' কবি বিনয় শুধু রুমাল পুড়িয়ে কবিতা যাদুই দেখালেন না, উপরি পাওনা হিসেবে আমরা পেলাম দুর্লভ গাণিতিক ভাষায় কবিতা ঃ

" x = 0
এবং y = 0
বা x = 0 = y
বা x = y
শূন্য 0 থেকে প্রাণী x ও y সৃষ্টি হলো
এইভাবে বিশ্ব সৃষ্টি শুরু হয়েছিল।"

—এ এক কবিতার মহাযোগ। তাঁর জীবনে রোগ শোক দুঃখ-কষ্ট পাগলাগারদ অসম্মান প্রভৃতি হাজারো প্রতিকূলতার প্রাচীর সৃষ্টি রথকে থামিয়ে দিতে পারেনিঃ

" এ সকল অনিশ্চিত অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ভেদ ক'রে
তবুও পাইন গাছ, ঋজু হয়ে ক্রমে বেড়ে ওঠে।"

সবশেষে সুখবর হল এই যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার ধূমকেতু বিনয় মজুমদার কখনো পথভ্রষ্ট হননি। সারাজীবন তিনি নিজ আদর্শে অবিচল থেকেছেন। তাইতো ভয়ঙ্কর মরণের স্রোতে কালের গুণ টানতে তিনিই তরুণ প্রজন্মের একমাত্র আশা-ভরসা। এই জ্ঞানপুরোহিত একদা বাংলা কাব্য-সুমুদ্রে যে ঢেউ তুলেছিলেন তা সব বাধা অতিক্রম করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আছড়ে পড়েছে পশ্চিমের সৈকতে। শঙ্খ, শক্তি, সুনীল, অলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু প্রমুখের সমকালীন কবি হয়েও বিনয়ের তুলনা বিনয় নিজে। একমাত্র 'পরিবর্তন স্থায়ী' এই দার্শনিক উপলব্ধি তাঁর কবিতার পরতে পরতে ধরা পড়েছে। তিনি গাণিতিক শূন্যতত্ত্বের উপর ভর করে বাংলা কাব্য ক্ষেতে যে সোনার ফসল ফলিয়েছেন তা কাব্য কবিতার জগতে এক মহাযোগ ঃ

"আমিই গণিত-এর শূন্য। গণিতের বইতে শূন্য ছাপা হয় এইভাবে 0—এই ছাপা শূন্য।

আমার সন্তানদল, এসেছো? খোঁজ ক'রে দেখুন পাঠক পাঠিকাগণ 0 বিষয়ক যত তত্ত্ব পৃথিবীর লোকে শুনেছে ও জেনেছে তার সব তত্ত্বই একজন মাত্র লোক আমি বলেছি।"

তথ্যসূত্র ঃ

১। বিনয় মজুমদার—কাব্যসমগ্র ১ম খণ্ড; প্রতিভাস, ২০০০
২। বিনয় মজুমদার—কাব্যসমগ্র ২য় খণ্ড; প্রতিভাস, ২০০২
৩। প্রচ্ছায়া, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৯
৪। অধরা মাধুরী, ২য় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৮
৫। অমল কুমার মণ্ডল—'আমাদের কবি বিনয় মজুমদার', চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৪

■ পীযূষ অধিকারী—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

চন্দনা মজুমদার

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর পর্বের আধুনিক কবিদের মধ্যে কয়েকজন কিছুটা উপেক্ষিত বা স্বল্প-আলোচিত। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩)। জন্ম-লগ্নে আধুনিক কবিতাকে যেসব কবি লালন করেছেন, তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্র-মুক্তি। এই লক্ষণকে কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে তারা ইউরোপীয় কবিদের নানা আঙ্গিক ও রীতিকে গ্রহণ করেছেন। সমকালীন ইউরোপীয় কবিতার বিষাদ, একাকিত্ব, অশান্তি ইত্যাদি আধুনিক কবিরা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাব্যাদর্শ, ভাব, ভাষা, চিত্রকল্প, ছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, মানবিকতায় আস্থা—এসব থেকে সরে আসতে চেয়েছেন আধুনিক কবিরা। তাঁরা দাঁড়াতে চেয়েছেন বিবর্ণ বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাটিতে। তাঁরা মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। বাংলা কবিতায় তাঁরা বৈচিত্র, গতি ও নতুন কাব্যধারা এনেছেন। কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে যশোহরের নলডাঙায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। শৈশব কাটে নলডাঙায়। বাবার চাকরীর সূত্রে, ১৯২৯-এ নলডাঙা থেকে চলে আসেন বরিশালে।

বরিশাল জেলা স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন তাঁর মনে স্বদেশ-চেতনার উন্মেষ ঘটে। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের উত্তাপ অনুভব করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় উদ্দীপ্ত হন। চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হন। বরিশালের স্বদেশী মেলা, চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গানের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করেন। তাঁর শৈশবে বিপ্লবী আন্দোলন দানা বেঁধেছে। বাল্য কৈশোরের উদ্দীপনাময় বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে তিনি বড় হয়ে উঠছেন। মঙ্গলাচরণের বরিশালস্থিত বাল্যজীবন ১৯৩৪ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই জীবনের প্রভাব পরে দেখা যায় তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিতে। অষ্টম শ্রেণীতে এসে ভর্তি হলেন কলকাতার মিত্র ইন্সস্টিটিউশনে। নবম শ্রেণীতে তাঁর বন্ধু হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং মঙ্গলাচরণের জীবনের গতিপথকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ১৯৩৭ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। ১৯৩৮-এ বন্ধু সুভাষের কাছে শুনলেন আধুনিক কবিতা-আন্দোলনের কথা। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'-র কথা। ১৯৩৯-র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র দোল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একটি কবিতা। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১ সালে অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে, হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করে। ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের সামনে দাঁড়িয়ে, সব দেশের ফ্যাসীবাদ-বিরোধী

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। দেশের ভিতরেও পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। চল্লিশের দশকে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাদেশও উত্তাল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক বিক্ষোভ, আলোড়িত করে সমগ্র দেশকে। ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির কর্মীরা। এই দশকে ঘটেছে গান্ধীজীর ডাকে আগস্ট বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবর্গের মুক্তির জন্য আন্দোলন, নৌসেনা বিদ্রোহ, ডাক ও তার কর্মীদের হরতাল। ক্রমে তীব্র হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন। চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছেছে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। অন্যদিকে বিদেশী শাসকদের ঔদাসীন্যে ও হৃদয়হীনতায় ঘটেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। শাসকবর্গের প্ররোচনায় ঘটেছে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

চল্লিশের দশকের শেষে, দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এসেছে। উদ্বাস্তুর স্রোত আছড়ে পড়েছে নতুন সীমান্ত পেরিয়ে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের বিরুদ্ধে, বিপ্লবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টি। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। ফ্যাসি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই পরিস্থিতিতে গড়ে উঠেছে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন। এই আন্দোলন চল্লিশের দশকের কবিতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

কবিতার বিষয়ে হবে জনজীবন। যথাসম্ভব গণমুখী হতে হবে কবিতাকে। তাই আধুনিক কবিতা হবে সহজ। তার আবেদন হবে প্রত্যক্ষ। আশাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এই কবিতা। এই কাব্য আন্দোলনের পিছনে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ভূমিকা। এই প্রগতি-আন্দোলন প্রভাবিত চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

১৯৪০-এ কলকাতার সাহিত্য-জগতে আধুনিক কবিতার প্রভাব পড়েছে। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'-র আসরে গিয়ে মঙ্গলাচরণের আলাপ হল বহু আধুনিক কবির সঙ্গে। বুদ্ধদেব বসু সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। মঙ্গলাচরণ তাই সমাজ রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকেন। তবে পরবর্তীকালে মঙ্গলাচরণের কবিতায় রাজনীতি সমাজনীতি সম্পর্কিত চেতনা তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'র আসরে অবাধ উপস্থিতি ছিল তরুণ কবিদের। ঐ আসরে গিয়ে মঙ্গলাচরণ কবিতার অভিব্যক্তি, মিত ভাষণ, চিত্রকল্প ও ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেন— এর প্রকাশ দেখা গেল, তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'স্নায়ু'-তে। এটি 'কবিতা ভবন' থেকে ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়।

তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল —'স্নায়ু' (১৯৪১), 'মনপবন' (১৯৪২), 'ঘুম পাড়ানি ছড়া' (১৯৪৭), 'তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪৮), 'মেঘবৃষ্টিঝড়' (১৯৫১), 'কটি

কবিতা ও একলব্য' (১৯৫৬), 'বৈরী মন' (১৯৭১), 'সূর্যের সাম্রাজ্যে ভিনদেশী' (১৯৮২), 'কোথাও যাবার কথা ছিল' (১৯৮৬), 'ঝাপটদাপট অলৌকিক এক' (১৯৮৭) ইত্যাদি।

'স্নায়ু' সংকলনটিতে (১৯৪১) রয়েছে তেইশটি কবিতা, কবিতাগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ১৭টি কবিতা উৎসর্গীকৃত হয়েছে প্রয়াত মা-কে। পরে ৬টি কবিতা উৎসর্গ করেছেন বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে।

জীবনের প্রতি ভালবাসা কবিতাগুলির মূল সুর। কোন তত্ত্ব কথা নেই। রাজনীতি তখনও তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেনি। যদিও তাঁর বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কবিতাগুলি মূলত কলাবৃত্ত ছন্দে লেখা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে, কবির বয়স কুড়ি বছর। এরপর তিনি কবিতা লিখেছেন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, তাঁর অসাধারণ ছন্দ-জ্ঞান। ছন্দ ব্যাবহারের কুশলতা তাঁর 'স্নায়ু' কাব্যে প্রকাশিত। পর্ব-সমতা ও অন্ত্যমিলের সন্নিবেশে বৈচিত্র এনেছেন। মাঝে মাঝে অভ্যস্থ ছন্দের ছক ভেঙে নতুন ছক নির্মাণ করেছেন। পরবর্তীকালে গদ্য ছন্দেও তিনি স্বচ্ছেন্দে কবিতা লিখেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ আধুনিক কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের প্রভাব পড়েছে তাঁর লেখায়। নতুন ধরনের চিত্রকল্প ও বাগ্‌ভঙ্গি এসেছে তাঁর কবিতায়—

'শিরা আর ধমনীর গলিতে
নোনা ঢেউ আছে বুঝি জ্বলিতে
দেহময় দুটো সাপ দুমুখো।' ('রক্ত')

'স্নায়ু' সংকলনে পরিস্ফুট হয়েছে তরুণ কবির মানসিক দ্বন্দ্বের স্পন্দন। বুদ্ধদেব বসু সমাজ রাজনীতি সচেতন কবিতা পছন্দ করতেন না। বুদ্ধদেবের এই মনোভাব, 'কবিতা'র আসরে যোগ দেওয়া তরুণ কবিদের প্রভাবিত করে এবং মঙ্গলাচরণ প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করেছেন ঃ

'বিপ্লীবরা এসেছিলো; ফিরে গেলো। ফিরে গেছে আজ।
দূরে দূরে অন্ধকার; বিপ্লবীরা ফিরে গেছে আজ
এসো না শান্তির নীড় বেঁধে রাখি এইবার কপোত-কপোতী?' ('মা নিষাদ')

বিপ্লব ফিরিয়ে দিয়ে, শান্তির সংকল্পে কবি স্থির থাকতে পারেন কি। 'শকুনি' কবিতায় সমাজ-জীবনের জটিলতার কথা এসেছে। 'পরিস্থিতি' নামক কবিতা কোনো ঝড়ের সংকেত বহন করছে ঃ 'সন্ধ্যাতিমিরে উদ্ধত নাগকন্যা।
স্তব্ধ হঠাৎ যুদ্ধ জাহাজ দেখি।।' ('পরিস্থিতি')

একটি কবিতার নাম 'যুদ্ধ'। কবি বলেছেন ঃ

'আমাদের নারী আছে, আমাদের পুঁথি আছে

আমাদের কাছে
গলিত আগুন আর বন্যার ক্ষ্যাপামি; শুদ্ধ
যুদ্ধ ভুলে গেছি!! ('যুদ্ধ)

কবির উক্তিতে যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে কিছুটা আত্মগ্লানি এবং পথ বদলের আকাঙ্ক্ষা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক'-র (১৯৪০) কবিতাগুলির ভিন্ন সুর, তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মঙ্গলচরণও প্রভাবিত হয়েছেন।

তিনি ১৯৪১-এ বি. এস. সি পাশ করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন লেবার পার্টির সদস্য। পার্টির গোপন কাগজপত্র মাঝে মাঝে মঙ্গলাচরণের কাছে রাখতেন। রাজনীতি ক্রমে আকর্ষণ করেছিল মঙ্গলাচরণকে। ১৯৪২-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পিসতুতো ভাই জগৎ মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে কৃষ্ণনগরের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। সেই সময় তিনি মার্কসবাদী বইপত্র পড়তে শুরু করেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে বইপত্র পড়ে, নিজেকে মার্কসবাদী তত্ত্বে অভিজ্ঞ করে তোলেন। বামপন্থী লেখকদের মধ্যে মঙ্গলাচরণ ব্যতিক্রমী। তিনি আগে বইপত্র পড়ে সুস্পষ্ট একটি জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে তুলেছেন। তারপর তিনি কাব্য সৃষ্টি করেছেন।

তাঁর মার্কসবাদী চিন্তার ভিত্তিটি সুদৃঢ় ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টির জটিল ভূমিকায়, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে স্বাধীনতা বিষয়ে উচ্ছ্বাসহীনতা, স্তালিন-বিরোধিতা পর্যায়ের দ্বিধা সংশয় ইত্যাদি ঘটনায় অনেক বামপন্থী লেখক বিচলিত হয়েছেন। কিন্তু মঙ্গলাচরণ নিজের মতাদর্শে স্থির ছিলেন। বইপত্র পড়ে মার্কসবাদে শিক্ষিত হবার পর্বটি চলেছে ১৯৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত।

বাংলার পুরাণ, ইতিহাস, মঙ্গলকাব্য, লোককথার উপাদান ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। বাসুকি, ত্রিশঙ্কু, মাথুর ইত্যাদি শব্দের বিক্ষিপ্ত প্রয়োগ আছে। কবি 'শকুনি' কবিতায় মহাভারতের এই খলনায়ককে অবলম্বন করে সভ্যতার বিষাক্ত ছবি দেখিয়েছেন।

তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মনপবন' (১৯৪২), 'কবিতা ভবন' থেকে বুদ্ধদেব বসুর পরিকল্পনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। এটি ষোলো পৃষ্ঠার কবিতার সংকলন। এই কবিতাগুলির সুর, পূর্ববতী সংকলন 'স্নায়ু'-র থেকে আলাদা। গতানুগতিক রোমান্টিক কবিতা সম্পর্কে একটু উপেক্ষার ভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাবালুতাকে কিছুটা বিদ্রুপ করা হয়েছে। বিদ্রুপপূর্ব ও নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রয়েছে কবিতাগুলিতে—

".....বাণিজ্যের হাওয়া
যে দিকে ফিরবে মোড়—
সেই দিকে তোর

জাহাজের তুলে দিবি পাল,
কালের রাখাল।' ('মনপবন ২')

'লেকে সকাল', 'লেকে সন্ধ্যা', 'আত্মচরিত', 'গুরু' ইত্যাদি কবিতাগুলি লঘু ভঙ্গিতে রচিত। তির্যক দৃষ্টির মিশ্রণে কবিতাগুলি আস্বাদ্য হয়েছে—

'গরুর মত শুধু জাবর কাটে
পৃথিবী এইখানে শুকনো মাঠে। ('গরু')

১৯৪২-র সময় থেকে মঙ্গলাচরণের সামনে, নতুন জীবনাদর্শের দ্বার উন্মুক্ত হল। সেই সময়ের অনুভূতি প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তীকালে বলেছেন ঃ

'১৯৪৩-১৯৪৪ সালে প্রথম বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রধানত তর্জমার মধ্যবর্তিতায় মার্কসবাদী বুনিয়াদি সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার অন্তর জগতে এত বড় বিপর্যয় তার আগে আর কখনও ঘটেনি। বলা যেতে পারে জীবন দৃষ্টিতে একটা বিপ্লবই ঘটে গেল।' (''পরিচয়'-এ বিশ বছর'', 'পরিচয়', নভেম্বর ১৯৮১)

মধ্যবিত্তের এতদিনের পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হল। মার্কসবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব পাঠ করে সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কে অবহিত হলেন। নিজেকে মার্কসবাদী দেশকর্মী রূপে গড়ে তোলার কাজে পদক্ষেপ নিলেন। ১৯৪৪-এ ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিলেন।

বাড়ির মতের বিরুদ্ধে গিয়ে, 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক বিভাগে অবৈতনিক কর্মী হিসেবে যোগদান করলেন। ১৯৪৪-এ 'পরিচয়' পত্রিকার হাত-বদল হল। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের হাত থেকে 'পরিচয়' পত্রিকা এসেছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধীনে। সম্পাদক গোপাল হালদার ও হিরণ কুমার সান্যাল।

কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন মঙ্গলাচরণ। তিনি পার্টির সদস্যপদ নেন ১৯৪৪-র শেষে দিকে। তিনি আত্মনিয়োগ করলেন পার্টির কাজে। এক বছর মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কে কাজ করলেন।

১৯৪৬-এ 'স্বাধীনতা' (প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৪৫) পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে সামান্য বেতনে যোগ দিলেন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক তখন সোমনাথ লাহিড়ী, প্রচার সচিব প্রমোদ দাশগুপ্ত।

তাঁর লেখার দক্ষতা ছিল। তাই পার্টির থেকে তাঁর স্থান নির্দেশিত হল লেখকের কাজে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। মঙ্গলাচরণ মনে করেছেন, কমিউনিস্ট পার্টির একটা সমস্যা বেশ গভীর। অধিকাংশ সদস্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদী ও অন্যদিকে শ্রমজীবী জনতার মধ্যে অনেক সময় সংযোগের অভাব থেকে গেছে।

আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের নতুন ধারণা গড়ার কাজে, শিল্প-সাহিত্যকে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন বামপন্থীরা। মঙ্গলাচরণের কবিতায় সেই বিশেষ

মনোভঙ্গির রূপায়ন ঘটেছে। চারের দশকে বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে মঙ্গলাচরণ নিজেকে গভীরভাবে যুক্ত করেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।

১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয়েছে 'ঘুম পাড়ানি ছড়া'। এটি কিশোরদের জন্য চিত্র-শোভিত একটি কবিতা-সংকলন। এতে ছড়া ও কবিতা লিখেছেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এই গ্রন্থের পাঁচটি কবিতাতে মঙ্গলাচরণের নতুন কাব্যরীতির পরিচয় মেলে ঃ

'এই বাংলা দেশ। এর স্বপ্ন শেষ। এর প্রাণ জ্বালায়
সব পঙ্গপাল। ভাই ধান সামাল। ভাই মান সামাল,
ঘুম আসছে না। ঘুম আসছে না। ঘুম তাই পালায়।
('ঘুম তাড়ানি গান')

পাঁচটি কবিতার তিনটিতে কবি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা বলেছেন। রাম ও রহিম চরিত্রের কথা আছে একাধিক কবিতায়—

'আমরা ধান কাটার গান গাই আমরা লোহাপেটার গান গাই।
আমরা গান গাই।
আমরা রাম-রহিম সর্দার, সারছি যার যা কাজ কারবার—
এমনি দিন ভোর।'
('ধান কাটার লোহা পেটার গান')

এখান থেকে মঙ্গলাচরণের কবিতায় মিশে গেল মানুষের সুখ-দুঃখ, আন্দোলন, সংগ্রাম। কবিতায় আত্মমুখী থাকার প্রবণতাকে তিনি অপছন্দ করতেন। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি অবলম্বন করবে সমাজকে এবং ছড়িয়ে যাবে বিশ্বে—কবিতার কাছে এটাই তাঁর প্রত্যাশা। কবির নিজের মনের মধ্যে ডুবে থাকার ধারণাকে তিনি সমর্থন করেননি।

'নিস্পন্ন' পত্রিকায় তাঁর 'সমাজশরিকী ও একালের বাংলা কবিতা' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ (১৯৮৬) প্রকাশিত হয়। এখানে মঙ্গলাচরণ নিজের কাব্যাদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট অভিমত জানিয়েছেন—

'.....কবিতায় অখণ্ড জীবনবোধ ও ভাবকল্পনা ও ব্যাপ্ত সামাজিক আবেগের আপেক্ষিক অভাব এবং অতিরিক্ত মস্তিষ্ক নির্ভরতা এই কবিকুলের অনেকের পক্ষে মহৎ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

তাঁর মতে, চল্লিশের দশকের কবিতায় সমাজ-মনস্কতার প্রেরণা পরিস্ফুট হয়েছিল। সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলনের তত্ত্বগত ভিত্তি বা প্রয়োগের সাফল্য বিষয়ে তিনি সন্ধিহান ছিলেন। তবে তিনি মনে করেন যে, বাংলা কবিতার যথার্থ স্ফূর্তি চল্লিশের পর দেখা গিয়েছিল সত্তরের দশকে—

'সত্তরের দশকে আরও একবার বাঙালি কবিরা একদিকে দেশি সভ্যতা-সংস্কৃতির

সংকট এবং অন্যদিকে পশ্চিমী অবক্ষয়ের আক্রমণ একই সঙ্গে ঠেকানোর প্রাণপণ মরিয়া চেষ্টায় মেতেছেন'। ('সমাজশরিকী ও একালের বাংলা কবিতা')

একটি সুচিন্তিত বিশ্বাসকে তিনি সচেতনভাবে ধরে রেখেছেন। শব্দের উত্তেজনাময় ব্যবহার ও উচ্চকণ্ঠ ভঙ্গি তিনি পছন্দ করেননি। বিশ্লেষণ ও আবেগের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। সংগ্রামী চেতনাকে তিনি বিশ্লেষণী বুদ্ধির সঙ্গে মিশ্রিত করতে চেয়েছেন।

'ঘুমতাড়ানি ছড়া'র কবিতায় বাংলার ছড়া ও ঘুমপাড়ানি গানের কাঠামো ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে দেশের মুক্তি আন্দোলন ও বামপন্থী—বিপ্লবী কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। এ বিষয়ে যে কবিতাগুলি লিখেছেন, তার কয়েকটি প্রকাশ পেয়েছে ১৯৪৮-এ 'তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা' সংকলনে।

তেলেঙ্গানায় মার্কসবাদীদের পরিচালিত কৃষক অভ্যুত্থান ও স্বাধীন অঞ্চল গঠন, বামপন্থীদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। ভারত-ব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রচিত হল কবিতা। এই সংকলেনর কবিতাগুলি দীর্ঘ ও বক্তব্যমূলক। মিশ্র কলাবৃত্তের আধারে অনিয়মিত পর্ব-ব্যবহারে গদ্য ভঙ্গির একটা চাল উঠে এল কবিতাগুলিতে। এই সংকলনের কবিতাগুলির বক্তব্য সোজাসুজি ও স্পষ্ট।

'....ঘুরি গুপ্তচর গুপ্তঘাতক দালাল চোরাকারবারীর ফাঁদে লাঠি গুলি জেল অনাহার অপমান অপমৃত্যুর নরকে— হন্যে হয়ে পালিয়ে বেড়াই—' ('কোনো শহীদ কমরেডের উদ্দেশ্যে)

কথাগুলির আন্তরিকতা অনুভূত হয়। তবে স্পষ্টবাচনের জন্য চিত্রকল্পের মিশ্রণে বক্তব্য ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠেনি—

'অশান্ত কলকাতা ডাকছে.....
প্রচণ্ড কলকাতা ভাসচে চীনের চাষির ডাক
উদাত্ত ইউক্রেন ('শান্তির মশাল')

দরিদ্র মানুষের দাবিকে বিশ্বের আহ্বানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে স্পষ্টবাক্ কবিতাটিতে বৃহতের ব্যঞ্জনা এসেছে। মঙ্গলাচরণ বলেছেন, চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা যথার্থ বিশ্ববোধে উত্তীর্ণ হয়েছিল। মঙ্গলাচরণের লেখাতেও সেই যোগসূত্র দেখা যায়।

তাঁর কবিতা-সংকলন 'বৈরী মন'-এ (১৯৭১) দেশকে বহির্মুখী দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করবার প্রবণতা কম। রূপকথা উপাদানের ব্যবহার কমে এসেছে। এই সংকলনটি মঙ্গলাচরণের কাব্যধারার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত।

দেশকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতা 'বৈরী মন'-সংকলনে আছে। শৈশবে দেখা

বরিশালের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। পরে তেভাগা আন্দোলনের সময়, তিনি কৃষকদের ফসল ও জমির লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সমকালের তেলেঙ্গানা আন্দোলন ছিল কৃষকদের অভ্যুত্থান। তিনি বিপন্ন কৃষকদের কাছ থেকে দেখেছেন। জমি ও মাটির কথা তাঁর কবিতায় অনিবার্যভাবে এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার বেদনা থেকে সৃষ্ট একটি কবিতা—

'খুঁজে কৃষককে মুখে—সোনা—তোলা দেয়ালে ফুটেছি মাথা।.....চমকে ভাঙতে দেখি ফুটপাতে হা-অন্ন হাত-পাতা গ্রামছেঁড়া আর গঞ্জ না পাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের ছা—
আমার অন্নদাতা। ('অন্নদাতা')

চল্লিশের দশকের বামপন্থী কবিরা রিক্ত, সর্বহারা ও বিপন্ন সমাজকে কাব্য প্রেরণা করে তুলতে পেরেছিলেন, তবে অন্তর্মুখী হবার প্রবণতাকে, তাঁরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি।

কোন কোন কবি মনের অভ্যন্তর থেকে ভাবনা তুলে আনেন, যা তাদের সমাজবোধেরই এক ভিন্ন রূপ। এই ধারার কবি নেরুদা বা আরাগঁ। নেরুদার কবিতার প্রতি মঙ্গলাচরণ আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি নেরুদার কবিতাবলী অনুবাদ করেন।

১৯৫৬-র পর, তাঁর পরবর্তী কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয় দীর্ঘ ১৫ বছর পরে ১৯৭১-এ। 'বৈরী মন' (১৯৭১) সংকলনের 'ভূমিকা'-য় কবি জানিয়েছেন—

'এই তেরো বছর ব্যক্তিকে জাগতিক নানা সমস্যায় দুশ্চিন্তিত থাকা সত্ত্বেও, আদৌ আর লিখতে পারব কিনা বারে বারে এই আতঙ্কের মুখোমুখি হয়েও মন বিদ্রোহ জানিয়েছে, আবার নিজেকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠতে চেয়েছে আমার মন।'

এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েত দেশে স্তালিন-র সম্মানচ্যুতি ঘটেছে। সেই সূত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। এই সময়ে চীন আক্রমণ ঘটেছে। কম্যুনিস্ট পার্টি দুই খণ্ড হয়েছে। এই সময়-পর্বে তিনি পার্টির সদস্যপদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। 'বৈরী মন' কবিতা—সংকলনের 'ভূমিকা'-য় মঙ্গলাচরণ আরো জানিয়েছেন ঃ

'আমার কবিতার নায়ক সময় হলেও সরাসরি সময় নয়, মনের ত্রিশের কাছে ব্যঞ্জিত সময়।'

এই সংকলনের কবিতাগুলিতে তিনি মূলতঃ নিজের মনের কথা বলেছেন। পাহাড়, বন্দর, সমুদ্র, ঘুরে এসে কবি বলেছেন ঃ

'তখন আপনাকে চাই পৃথিবীকে পাই না, তখন ঘুম উঠে বসে। দ্যাখে পাহাড়ের স্থাপত্য এ-মুখ।...' ('দিন রাত্রি')

বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার উত্থান-পতন, সংঘাত-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে কবির ব্যক্তিগত চেতনা। এই সংকলনের প্রায় স্বীকাররোক্তিমূলক কবিতা—

'এ আত্মখোলসে চির নির্বাসন, সময়কে কড়ি গুণে দেয়া উৎকেন্দ্র যোগেশ যেন আমার শুকনো সাজানো বাগানে। ('যদি না')

'বৈরী মন'-এ আত্মগত কবিতা আছে। তেমনি আছে নানা স্বাদের কবিতা। পিকাসোর ছবি দেখে কবিতা লিখেছেন। মার্কস্, রবীন্দ্রনাথ, গোর্কি, লেনিন-এর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন। কবিতার বিষয় খরা, বন্যা, নিরন্ন কৃষক, ভিয়েতনাম, হো চি মিন ইত্যাদি।

প্রকৃতির সজীব স্পর্শে, সৌন্দর্য-মুগ্ধ কবির মনের ছবি ফুটে উঠেছে।

'বাতাস বাতাস আলোর হল্লা ধুইয়ে ধুলোয়
মন জেগে ওঠে মন বেজে ওঠে সর্‌গম্—বোলে।'

(হঠাৎ হাওয়ায়')

প্রেমের কবিতায়, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে কবির মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

'সেই আশরীর এলে—হাসির ওড়না খসে গেলে
সম্পূর্ণ আমার হাতে রমণীর মন অচঞ্চল।'

('দুই পৃথিবীর মাঝখানে')

এই সংকলনের প্রথমাংশের কবিতাগুলি আত্মমুখী ধরনের। তা যেন বিশ্ব স্পন্দনকে ধারণ করবার জন্য কবির মনের প্রস্তুতি।

১৯৭৮ এ প্রকাশিত হয় 'ঝাপট দাপট অলৌকিক এক' (অতীন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে যুগ্মভাবে)। এখানে তিনি দেশমাতৃকার মতো এক আশ্চর্য রমণী প্রতীক নির্মাণ করেছেন—

'আমাকে উন্মাদ করবি আস্ত গিলে খাবি বলে
রাক্ষসী স্বদেশ' ('ফেরা')

'রাক্ষসী' এখানে কোন অশুভ ইঙ্গিত নয়। এতে মিশে আছে স্নেহ সম্পর্কের রেশ। মঙ্গলাচরণের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর দেশপ্রীতি জড়িয়ে আছে। কবিতার নির্মাণে মঙ্গলাচরণ দেশজ ঐতিহ্যকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। দেশকে নারী ও জননী রূপে দেখা, ভারতীয় সংস্কারের অঙ্গ।

'ঝাপট দাপট অলৌকিক এক' (১৯৮৭) কবিতা-সংকলনে স্থান করে নিয়েছে নির্যাতিত মানুষ। অসহায় কৃষক, দরিদ্র জননী, বিপন্ন তরুণী, ফুটপাতের বালিকা, শরণার্থী, ভিক্ষুককে কবি দেখেছেন।

সময় জটিলতর। মানুষের মধ্যে আগের সারল্য ও সজীবতা নেই। রাজনীতিতে স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস ও বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ কবির বাগ্‌ভঙ্গি তাই বিছুটা বক্র ও বিদ্রুপময়। স্বার্থসর্বস্ব দলীয় রাজনীতির আবর্তে দেশের জটিল পরিস্থিতিকে কবি দেখেছেন। জনজীবনের সংঘাত-সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে কবিতাকে, এই অভিমত তিনি আজীবন পোষণ করেছেন।

মঙ্গলাচরণ কবিতায় স্বদেশের ও বিশ্বের জনসংগ্রামের মূল সূত্রটি ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে প্যালেস্টাইনবাসী ও নেলসন ম্যাণ্ডেলার দেশের মানুষের জনযুদ্ধ। বরিশালের সবুজ প্রকৃতি, স্বাদেশিক উন্মাদনা, মানুষের সুখ-দুঃখ, সাম্যবাদী দর্শন, দেশপ্রেম প্রভৃতি তাঁর কাব্যের বিষয় হয়েছে। প্রথম কাব্য 'স্নায়ু'র যুগ থেকেই তিনি আশাবাদী।

তাঁর কবিতা বলেছে প্রতিরোধ ও আশার কথা; নৈরাশ্য বা বিচ্ছিন্নতার কথা নয়, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা নয়। শোষিত সমাজের দরিদ্র মানুষের হাহাকার তাঁকে বিচলিত করেছে, সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ তাঁকে ভাবিয়েছে। কবি মঙ্গলাচরণ জীবনকে দেখেছেন লোক-জীবনের খুব কাছ থেকে, তিনি সংগ্রামের সমর্থক। তাঁর কাব্যে দেশপ্রেমের আবেগ আছে, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ভালোবাসা আছে।

চল্লিশের অধিকাংশ কবিই জনমুখিনতা থেকে সারা জীবনে সরে আসেন নি। চল্লিশের একজন কবির যথার্থ পরিণতি, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে অনুভব করা যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০১০

২। আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠ, সুস্নাত জানা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯।

৩। হাজার বছরের বাংলা কবিতা, অশ্রুকুমার শিকদার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।

■ ড. চন্দনা মজুমদার—অধ্যাপিকা ও প্রাবন্ধিক

শম্পা বসু

শঙ্খ ঘোষ ঃ বাংলাদেশের স্মৃতির আত্মপ্রক্ষেপ

পঞ্চাশের কবি শঙ্খ ঘোষ এখনো সৃষ্টিশীল। যে বিশেষ সময়কালে কোনো একজন কবি তাঁর নিজস্ব কবি-মানসের সাক্ষরসহ প্রথম আবির্ভূত হন, তাঁকে সাধারণত সেই দশকের কবি বলেই উল্লেখ করা যায়। দশক পরিচয়ের এই বহুল পরিচিত আঙ্গিকটিই এখানে অনুসৃত হয়েছে। এবং পরবর্তী কয়েক দশকেও তাঁর কবিতার ধারা অক্ষুন্ন থাকে অনেক সময়, আবার অনেক সময় বিবর্তনও আসে, তবু তাঁর আবির্ভাব কালটি স্মরণে রাখলে তাঁর কবি-মানসের গতি প্রকৃতি অনুভব করতে পাঠক ও আলোচকের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

পঞ্চাশ হল সেই কালপর্ব, যখন দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে, তরুণ কবি প্রজন্মের আবির্ভাব হয়েছে প্রধানত কলকাতা শহরে, কারণ তখন কলকাতা শহরই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র। স্বাধীনতার সঙ্গেই এল দেশ বিভাগ, পূর্ববঙ্গ থেকে বহু বাঙালি পরিবার চলে এলেন পশ্চিমবঙ্গে, প্রধানত কলকাতায়, সেইসব পরিবারের তরুণেরা তাঁদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে সম্মিলিত হলে এবং তাঁদের অনেকেই হয়ে উঠলেন এক নতুন বোধের ধারক। স্বাধীনতা লাভের সদ্য রোমান্টিকতা, বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা, আবেগের তীব্রতা—সে সময়ের অনেক কবির রচনাতেই দেখা দিয়েছিল। পঞ্চাশ-ষাট-এর বিপর্যস্ত বাংলা জনজীবনে বহু পরিবর্তন ঘটে যায়। অতি দ্রুত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে যে সব কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে সময়ের নির্যাসটুকু যথাযথভাবে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক আবেগকে ছাপিয়ে দৃষ্টিকে সুদূরপ্রসারী করতে ব্যর্থ হয়েছেন অনেকেই। তবুও জীবনের উথাল-পাথালের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে, সমাজ চেতনার স্পষ্ট প্রকাশে জেগে আছেন শঙ্খ ঘোষ।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা জেলা, বর্তমানে বাঙলাদেশের চাঁদপুরে মাতুলালয়ে শঙ্খ ঘোষের জন্ম। বাংলাদেশের পাবনা জেলায় পাক্‌শির চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে ১৯৪৭-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলে আসেন কলকাতায়। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৪৯-এ আই, এ, ১৯৫১-এ স্নাতক এবং ১৯৫৪তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর পাশ করেন। শঙ্খ ঘোষ অধ্যাপনা সূত্রে যুক্ত ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজ (১৯৫৫), জঙ্গীপুর কলেজ (১৯৫৫-৫৬), বহরমপুর গার্লস কলেজ (১৯৫৬-৫৭ জানুয়ারি), সিটি কলেজ (আমহার্স্ট স্ট্রিট) (১৯৫৭-৬৫), এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৫-১৯৯২)। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনভবনের অধ্যক্ষ পদেও

নিযুক্ত ছিলেন (১৯৮৯এর জুন থেকে মে. ১৯৯০ পর্যন্ত) এছাড়াও ১৯৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার-ন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে আমন্ত্রিত ছিলেন তিনি। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিমলার ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিতেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করেছেন। ভারত সরকারের এমিরেটাস ফেলো ছিলেনও তিনি (১৯৯৩-৯৫), কর্মজীবনে বহু প্রতিষ্ঠানকে নিজের মেধা ও মননের স্পর্শে সমৃদ্ধ করেছেন, পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার—নক্ষত্র পুরস্কার (১৯৭৬), নরসিংহ দাশ পুরস্কার (দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭), সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৭, বাবরের প্রার্থনা), রবীন্দ্র পুরস্কার (ধুম লেগেছে হৃৎকমলে ১৯০৯), কবীর সম্মান পুরস্কার (১৯৯৮) ইত্যাদি। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছেন সাহিত্যের সর্বোত্তম পুরস্কার 'জ্ঞানপীঠ'।

কবির শৈশব আর বাল্যকাল কেটেছিল অবিভক্ত বঙ্গে। আর কৈশোর শুরু হয়েছিল পদ্মাতীরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ সংলগ্ন ছবির মতো সাজানো পাক্‌শির রেলকলোনিতে। কবি বন্ধু অজিত মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"...সেখানে আমাদের ইস্কুল, সহপাঠী শঙ্খ ঘোষ। স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণের মিষ্টিমুখের ছেলেটি সবকিছুতেই সহপাঠীদের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তারই উদ্যোগে প্রকাশিত হয় আমাদের হাতে লেখা পত্রিকা।...এইভাবে এক কিশোর সপ্তম/অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রের উদ্যোগে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে এমন এক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, যার ফলে আমরা অনেকেই ভবিষ্যতে কেউ কবি, কেউ প্রাবন্ধিক, কেউ গল্পকার, কেউ বা চিত্রকর হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি।..."[১] স্বল্পভাষী, আত্মপ্রচার বিমুখ শঙ্খ নিজের প্রতিভাদীপ্ত স্বতঃস্ফূর্ততায় সেই কিশোর বয়সেই সতীর্থদের সঙ্গে নিয়ে বের করেছিলেন এক স্বপ্নের তালিকা। লেখা-পড়া ছাড়াও সব রকমের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানে ছিল কবির আগ্রহ, কৈশোরেই নাটকাভিনয়ে তাঁর দক্ষতারও পরিচয় পাওয়া গেছে বেশ কিছু নাটকে। তাঁর 'সকাল বেলার আলো' বইটিতে এই কৈশোরকালের স্কুল জীবনের আভাস সেই সময়ের সুখানুভূতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মেধা এবং কবিত্ব শক্তি মেলানো এক অভিনব জীবন শঙ্খ ঘোষের। তিনি তাঁর পারিবারিক পরিবেশ থেকে সর্বতোভাবেই মানসিক পুষ্টির উপাদান পেয়েছেন—যা তাঁকে প্রখর মেধাচর্চায় প্রণোদিত করেছে, আর কবিতা তো এসেছিল তাঁর সহজাত অনুভূতির ভিতর থেকে। এ প্রসঙ্গে কবি তাঁর 'কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থের 'পা তোলা পা ফেলা' শীর্ষক রচনায় লিখেছেন—"সকলেই একদিন খেলাচ্ছলে শুরু করে কৈশোরে, তার মধ্যে থেকে কখন জেগে ওঠে শরীর, তার নিজেরও অগোচরে। না-শহর না-গ্রাম আমাদের সেই পদ্মাপারের ছোট্ট জনভূমি, একদিকে নদী, একদিকে বন, তাঁর মাঝখানে বারো বছর বয়সে আমারও একদিন শুরু হয়েছিল ছন্দ মেলানোর খেলা, একেবারে দায়হীন, প্রগল্‌ভ। বিষয়ের কোন ভাবনা ছিল না তখন। যে কোন উপলক্ষই ছিল

রচনার উপলক্ষ।....খাতার পর খাতা ভরে উঠেছিল কেবল তুচ্ছ আনন্দে। আর তারপর, প্রায় একসঙ্গেই পৌঁছল আমাদের যৌবন আর স্বাধীনতা। আর সেই আমার কলকাতায় সত্যিকারের পা দেওয়া।"

শঙ্খর জীবনে তাঁর পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রভাবই ছিল বিস্তৃত। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, পাঠনিষ্ঠা, তাঁর শিক্ষকতার আদর্শ, পারিবারিক আদর্শ, এমনকি তাঁর জীবনবোধেও অনেকখানি জুড়ে আছে তাঁর বাবা। এই প্রসঙ্গে মা অমলাবালা দেবীর সর্বব্যাপী ভূমিকার কথাও স্মরণযোগ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর বিশ্ববিক্ষা, নিজস্ব জীবনশৈলী। আকৈশোর তিনি আগ্রহ বোধ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সৃষ্টির অপরিমেয় উচ্চতায়। পিতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে একদিন কলকাতা দেখিয়েছিলেন বাবা, মনে পড়ে। এই হলো রামমোহনের বাড়ি, এইখানে ছিলেন বিদ্যাসাগর, এই জোড়াসাঁকোর। ছোটবেলায় অন্ধকার ইজিচেয়ারে শুয়ে যে রাত্রিবেলার আকাশ দেখাতেন বাবা, তার চেয়ে কত ভিন্ন এটা।....কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমার এক ভাইয়ের মৃত্যু অনিবার্য, ডাক্তারদের কাছে সেই কথা জেনে বাবা একদিন ক্লাসে এসে শুনিয়েছিলেন একটির পর একটি নৈবেদ্য-র কবিতা। সেই রহস্যময় পড়ন্ত দুপুরের চেয়ে কত ভিন্ন ধরণের রহস্য নিয়ে পৌঁছল কলকাতার জটিল উপদ্রবময় দিনগুলি গরিব, অসংবৃত্ত, যুধ্যমান। তবু, এই দুই-ই ছিল সত্যি। এই শূন্য আর প্রত্যক্ষ, পদ্মা আর কলকাতা, কৈশোর আর যৌবন এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়; আর এই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন। অথবা কবিতা।"[১]

শঙ্খ ঘোষের কবিতা রচনা আরম্ভের গভীরতম উপকরণ রয়েছে তাঁর আত্মসৃজন-সূচনার কথায়। তাঁর 'সকাল বেলার আলো' (১৯৬৮) এবং 'সুপুরিবনের সারি' কিশোর উপন্যাস দুটির মধ্যে রয়ে গেছে অপূর্ব সৃষ্টি সম্ভাবনার যথার্থ বীজ। মূলত পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি-মানুষ-খোলা আকাশ এবং শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর পদ্মাপারের এক জনপদের গল্প। এই দুটি বইয়ে ছড়িয়ে আছে যে নদী-প্রান্তর-অরণ্য-জনপদ এবং বিস্তীর্ণ জীবনের ছবি তা প্রধানত পাক্‌শি (পাবনা জেলা) এবং বানারিপাড়ার (বরিশাল)। এছাড়া আছে স্টিমারে এবং নৌকায় দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে প্রতিবছর পুজোর ছুটিতে বানারিপাড়ায় উপন্যাস দুটির চরিত্র নীলমাধবের পৈত্রিক বাড়ি এবং মামাবাড়ি বেড়াতে যাওয়ার বিবরণ। এ সম্পর্কে কবি সুহৃদ অজিত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আমার বন্ধু শঙ্খ' প্রবন্ধে স্পষ্টই বলেছেন, 'এ সবই শঙ্খ ঘোষের জীবনের গভীর সত্যেরই প্রতিফলন। এর মধ্যে নীলমাধবের বালক বয়েসের যে সজীব সাক্ষর ছড়িয়ে আছে এবং তার সপ্রতিভা ও প্রকৃতি মুগ্ধতার যে উদ্ভাস-সবকিছু মিলিয়ে যেন এক জেগে ওঠা—যেন এক কবির আরম্ভের ছন্দ। "কেমন একটা ধুইয়ে দেওয়া আলো।....চুপ, সবদিকে চুপ, কেবল অল্প হাওয়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।...."প্রকৃতপক্ষেই নীলমাধবের ন-দশ বছরের বয়সের

সঙ্গে প্রকৃতির যেটুকু পরিচয়, তার একটা নানারঙা অবয়ব আছে যেন। পদ্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। নদী এবং খোলামেলা প্রকৃতি, সূর্যাস্তের আলো অথবা জ্যোৎস্না ধোয়া পথঘাট—এইসবই তার কাছে বড় আকর্ষণের। এই বইগুলি সবই তিনি লিখেছেন বড়ো বয়সে, কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যেই ছড়িয়ে আছে আশ্চর্য সব উপাদান, যার সাহায্যে আমরা নিরন্তর আসা-যাওয়া করতে পারি অনেক দূর বিগত সময়ের মধ্যে। নীলমাধবের অন্তরালে কিশোর বয়সের কবির এই আশ্চর্য সুন্দর মননের অনুভূতি—প্রবণতা, সংবেদনশীলতা, মনের প্রসার পরিণত পর্বের কবির অমোঘ সৃষ্টিশীলতার প্রকাশকে আভাসিত করে তোলে।

কিশোর উপন্যাস 'সকাল বেলার আলো" শেষ হয় নীলমাধবের বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যে। শঙ্খ ঘোষের আটান্ন বছর বয়সে লেখা কিশোর উপন্যাস 'সুপুরিবনের সারি'-তে নীলমাধবের বয়স পনেরো। পুজোর ছুটিতে দেশের (বাংলাদেশের) বাড়িতে যাওয়ার নদীপথের বর্ণনা দিয়েই এই লেখার সূচনা। উপন্যাসের প্রেক্ষিতে তখন সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতা আর দেশভাগের মর্মছেঁড়া যন্ত্রণা। তবুও তো শঙ্খ এঁকেছেন বাংলার রূপসী প্রকৃতির ছবি-প্রকৃতি, নদী আর ঝাপসা অন্ধকারে আর আলোয় দেখা ঘন গাছের সারি। এভাবেই যেন কবির আত্মসৃজনের পরিসর বেড়ে ওঠে, যেন বিস্তারে বিস্তারে তা উন্মুক্ত হতে চায় সর্বব্যাপী মুক্তির অভিমুখে। এই উপন্যাসের অন্তিম পর্বে নীলমাধবের আবেগের কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত বর্ণনা যেন শব্দ দিয়ে ছবি এঁকে যায়। 'খালের মুখে নদীর জলের ঢেউয়ের', 'তুলসীতলা'-র, 'ঠাকুরদার মঠ', 'সুপুরিবনের সারি, আর 'ফুলমামি'-র। পরবর্তীকালে শঙ্খ ঘোষের অনেক সংকলনেই এইসব প্রসঙ্গকেই কবিতার অবয়বে গড়ে তোলা হয়েছে। বাল্য ও কৈশোরের যে মমত্বঘন পৃথিবীর মধ্যে লালিত হয়েছিলেন কবি সেই পৃথিবী, সেই পারিবারিক মূল্যবোধ, সেই ঐতিহ্য—এই সবই তাঁর কবিতার বিষয়-অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাগুলির আত্মীকরণের ফলেই জেগে উঠেছে অসাধারণ পংক্তিমালা—

> "এইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি ডোবা পেরিয়ে ঝুমকো ফুলের মাঝখানে ঠাকুরদার মঠ
> চতুর্দশীর অন্ধকারে বুকের পাশে বাতি জ্বালিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি একা" (ঠাকুরদার মঠ : আদিম লতাগুল্মময়)

প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তিনি যখন আবার ফিরে গিয়েছিলেন কিশোর স্মৃতি বিজড়িত সেই গ্রামে, তখন সেই চৌষট্টি বছর বয়সেও নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন ছেলেবেলার সেই হারিয়ে যাওয়া পারিপার্শ্বিকতাকে।"

এরপর দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে ও স্বাধীনতা সূত্রে কলকাতায় আসেন সপরিবার কবি। এই শহরের বিচিত্রতায় বিস্ময় বিমূঢ় এক কিশোরের সম্মুখে কলকাতা খুলে

দিয়েছিল সাম্প্রতিকের দরজা। কবির কথায় বলা যায়—"...সেখানেও ছিল বহিরাগতের ভিরুতা, জানা ছিল না কোন দিকে আছে পথ,...." (কবিতার মুহূর্ত, পৃষ্ঠা ১৪) এতদিন কবি শুধু জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর কবিতা, গান, নাটককে, এবার তাঁর সামনে এল নতুন এক আধুনিক জীবন আর কবিতার জগৎ, কলকাতা শহরের জাঁকজমক, তার যান্ত্রিক ব্যস্ততা, সভ্যতার অভিঘাত সংবেদনশীল কবি মনে নিখুঁত ভাবেই ধরা পড়েছিল।

এমন সময়ে প্রকাশিত হল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা (১৯৫৩)। যদিও পূর্বেই 'কবিতা', 'অগ্রণী' (১৯৫২), 'শতভিষা' ১৯৫১) এবং 'দেশ' পত্রিকাতেও শঙ্খ ঘোষের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তবুও তরুণতম কবিদের মুখপত্র হিসেবে জন্মলগ্ন থেকেই চিহ্নিত হল 'কৃত্তিবাস'। এখানে তরুণতমদের পথিকৃৎ রূপেই আহ্বান জানানো হল শঙ্খ ঘোষকে। এছাড়াও 'ক্রান্তি', 'পরিচয়', 'যাত্রী', 'পাণ্ডুলিপি', 'কবিপত্র' কিংবা 'জলার্ক'-এর মতো পত্রিকার পরিমণ্ডলেও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়েছিল। এই সমস্ত পত্রিকায় সমবেত তরুণ কবিরা যে সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে এলেন, সেগুলিতে আত্মমগ্নতাই ছিল মূল সুর। সেই সময়ের সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যথেষ্ট বিপন্ন ছিল, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ছিল, জনসংখ্যার বিস্ফোরণের সঙ্গে ছিল বেকারের নৈরাশ্য। এই তরুণেরা সকলেই জীবন সংগ্রামে যথেষ্ট বিপর্যস্ত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁদের লেখায় সমাজ প্রসঙ্গ প্রধান না হয়ে প্রধান হয়ে উঠল আত্মমগ্নতা। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে এই প্রজন্মের কবিরা প্রথম স্বাধীন দেশের নাগরিক। ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে জর্জরিত পরাধীন দেশের হতাশা, গ্লানি, মালিন্য থেকে মানসিকভাবে তারা ছিলেন মুক্ত। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে পঞ্চাশের কালপর্বে বাঙলার জনজীবন ছিল যথেষ্ট পর্যুদস্ত। মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগের মধ্য দিয়ে বহমান সময়ের স্রোতে পঞ্চাশের অনেক কবির মধ্যেই বোহিমিয়ানিজমের রূপ ধরে প্রবেশ করেছিল আত্মানুসন্ধানের স্পৃহা। কিন্তু নানা সংশয়, যন্ত্রণা ও ক্লান্তির ফলে সেই ক্ষেত্রটি রূপান্তরিত হয়ে গেল আত্মলীনতার শূন্যতাবোধে। তার মধ্যে সমাজ ও সমকালের কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের কবিতা ছিল এর ব্যতিক্রম।

এই অভিসন্দর্ভের অভিপ্রায় হল শঙ্খ ঘোষের কবিতায় গ্রাম জীবনের স্মৃতির এবং প্রত্যক্ষতার বিন্যাসের অনুসন্ধান। তিনি যথার্থ গ্রাম মনস্ক কবি নন। মানবমনস্কতাই তাঁর উপজীব্য। তার এই মানবতাবোধের সূত্রেই তাঁর কবিতায় গ্রাম এসেছে, প্রধানত দুটি পথ ধরে—প্রথমত পরিণত পর্বে পূর্ববঙ্গের স্মৃতির অনুসঙ্গে এসেছে গ্রামচেতনা। আর দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষতার আবহে মূল্যবোধ হারাতে থাকা অবক্ষয়ের যুগে গ্রামজীবনের বাস্তবতার কথা বলেছেন কবি তাঁর রচনায়।

শঙ্খ ঘোষের প্রথম কবিতার সংকলন 'দিনগুলি-রাতগুলি'-র রচনাকাল ১৯৪৯-৫৪, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬। কবির সতেরো থেকে বাইশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা এই

কবিতা সংকলনের কবিতাগুলিতেও রয়েছে বাস্তব ঘটনা, সমকালীন সমাজ- ইতিহাস - রাজনীতি। প্রথম কবিতা সংকলনটিতে যদিও প্রেমই প্রধানতম বিষয়, তবুও শহরে সদ্য আগত এই কবির পথ তখন এগিয়ে চলেছিল পদ্মাতীর থেকে কলকাতায়, গ্রাম থেকে শহরে। এতো শুধু পরিচিত নিসর্গ ছেড়ে আসা নয়, এ যে নিজের শিকড় ছেড়ে আসা, 'পলাতকা' কবিতায় সেই মর্মছেড়া যন্ত্রণারই প্রকাশ—

"প্রাণ ধারণের দিন যাপনের গ্লানি? নাকি-তারা হর্ষ?
একটি ধানের শিষের উপর
গোটা জীবনের ভরসা।
কবন্ধ মাঠ, ধান খেয়ে গেছে বুলবুলি আর বর্গি
.....
.....
ডাক দেবে যেই প্রিয়রে
সে প্রিয় তখন ধূ ধূ মাঠ জুড়ে খাজনার ধান খুঁজছে।"

এভাবেই তাঁর গ্রাম ছেড়ে আসার যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে।

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বিষয়ে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন শঙ্খ—"হঠাৎ কখনো মনে একটা তার বেজে ওঠে। তার আঘাতে আমাদের সমস্ত স্মৃতি একেবারে আলোড়িত হয়ে যেন মনে করিয়ে দেয়—আর নয়, উৎসের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছ। 'পথের পাঁচালী' সেই উৎসের ডাক, স্মৃতির কাব্য"[৫] প্রাথমিক ভাবে নগরবাসী কবির স্মৃতিতেই গেরাম বাংলা প্রতিভাত হয়েছে। বাংলার গ্রাম, রূপময় পূর্ববঙ্গের নদী-প্রান্তর-আকাশ এবং তার ঋতুরঙ্গ-এ সবই যেন রূপে-অরূপে, বাস্তবে কল্পনায় কবিকে পূর্ণ করে রেখেছে। বহুতর সম্পর্কে বন্ধনে তাঁকে বেঁধেছে অসংখ্য মানুষও। এই স্মৃতির টানেই তিনি লেখেন—

"ধানে ধানে ঢেউ যেন ধান নয় ধান নয় তারা।
উপরে আকাশ ঢাকে প্রকাণ্ড ডালায় বসুধারা-
নীচে খুলে খুলে যার সব তুচ্ছ সবুজের মুঠি,
প্রত্যেক পাতার বিন্দু দেখার আনন্দে দিশেহারা
ধানে গানে বসুধায় মিলায় অপার ভালোবাসা"
(ধানে গানে বসুধায় ঃ দিনগুলি রাতগুলি)

শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংকলন 'নিহিত পাতালছায়া' (১৯৬৭) প্রকাশিত হয়েছিল 'দিনগুলি রাত গুলি'-র এগোরো বছর পর। দুটি কবিতা সংকলনের মধ্যে এই দুরত্ব শুধু সময়ের নয়, দূরত্ব বিষয়ের, ভাবের, দৃষ্টিভঙ্গির এবং সৃষ্টি বৈচিত্রেরও। আমাদের সন্ধানে দৃষ্টির আলো পড়ে তাঁর বেদনা রক্তিম স্মৃতি কথায়, দেশ ছেড়ে আসার বেদনার

গভীরতা লক্ষ্য করা যায় 'অলস জল' কবিতায়—

"কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম; মাঝি, আমার বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে সেই
শব্দ কুহক, নৌকা কাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই
স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা,
তোমায় আমি বুকের ভিতর নিইনি কেন রাত্রিবেলা?"

এখানে কবির ফেলে আসা দেশ যেন এক মানবী সত্ত্বায় রূপান্তরিত। সংকটকালে তাকে বুকে আগলে রাখতে না পারার আক্ষেপ পাঠক মনেও সঞ্চারিত করে দেয় সব হারানোর শূন্যতা। আবার 'মিলন' কবিতায় প্রেমিক মনের রোমান্টিকতার আভাস, সেখানে প্রেমিকাকে কবির—"কখনো মনে হয় তুমি ধান খেতে ঢেউ, তারই সুগন্ধে গভীর তোমার উদাত্ত-অনুদাত্তে বাঁধা দেহ, প্রসারিত, হিল্লোলিত"। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় গ্রাম প্রকৃতির বাস্তব সৌন্দর্যের চিত্র বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্তু তাঁর অন্তর্গহনের সৌন্দর্য ভাবনা যখনই প্রকাশ্যের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, তখন কবি তাঁর অলংকারবিহীন শব্দ চয়নে, অথচ গভীর অর্থময়তায় গ্রাম-বাংলার রূপকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। অতীতের উদ্দাম উধাও বাল্যসহচর পদ্মাতীরবর্তী স্বদেশ মানচিত্র খণ্ডে রেখায় রেখায় লুপ্ত, কিন্তু স্মৃতিতে জেগে থাকে 'খাল যমুনা', 'ভাঙ্গাবৈঠা ছইহীন নৌকা', 'ফুলফুলন্ত নির্জনতা' (ফুলবাজার), 'ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা', 'সুপুরিবনের সারি' (আলাপচারি); সূর্যাস্তের মায়াবী আলোয় 'নির্জনতা খোলা মন্দির', আর 'গ্রামান্তের মন্থর দিনে নদীর কিনারে নতজানু বটতলা' (আমাদের ভালোবাস ঃ নিহিত পাতালছায়া)।

এই কবিতা সংকলনেরই 'ইট' কবিতায় মানুষের বিবেক, মানবিকতা, মূল্যবোধ, অস্তিত্ব, প্রেম, সৃষ্টি, বিশ্বাস প্রীতি দায়বদ্ধতা—সবকিছু নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য কবির আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে। আর যা কিছু সম্বল, যা কিছু সাধনার সেই ধ্যান—ধানকে কবি অবিচ্ছিন্ন করে তুলেছেন, দুঃসময়ের বিনষ্টিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বাংলা ও বাঙালির প্রিয় অভিজ্ঞানেরই ব্যঞ্জনা এনেছেন। এই সংকলনেরই 'রাঙামামির গৃহত্যাগ' কবিতায় জীবনকে নিঃশব্দ প্রত্যাখানের মধ্যেও জড়িয়ে আছে গ্রামীণ পরিবেশ—

"ঘর বাড়ি, আঙ্গিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে..."

(রাঙামামিমার গৃহত্যাগ ঃ নিহিত পাতালছায়া)

'নিহিত পাতালছায়া' সংকলনেরই 'যাবার মতো নেই' কবিতায় শহরের রুক্ষ তপ্ত প্রেক্ষিতে ফুটে উঠেছে গ্রাম জীবনের জন্য কবির গভীর স্মৃতি মেদুরতা। 'সুন্দর' কবিতায়

তাই অনায়াস স্বাছন্দ্যে তিনি লিখেছেন—

"...তাই দেখি, ফসলের সীমা,
বুকের গেরুয়া জল, ছাদশীতে সব গ্রাম মিলেমিশে যায়
জেগে ওঠা রাত।"

শঙ্খ ঘোষের পরবর্তী কবিতা সংকলন 'তুমি তো তেমন গৌরী নও'-এর প্রকাশকাল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ। এই সংকলন রচনাকালে কবির অনেকটা সময়ই কেটেছে বিদেশে, আমেরিকার আয়ওয়া শহরে যৌবনের যে উদ্দামতা দেখেছিলেন, যে লোভ- মোহ- তৃষ্ণা- ক্ষুধা তারই সম্মিলিত ছবি ফুটে উঠেছে 'তিনি তো তেমন গৌরী নও' কবিতায়। আর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় বিদেশ ছেড়ে আসার স্মৃতিও যেন কবির নিজের দেশ; তার গ্রামকে ছেড়ে আসার স্মৃতির বেদনার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে—তাই 'বুক আড়ালে একশো গ্রাম'—এর স্মৃতি নিয়ে, (দুই হাতে দুই প্রান্ত) 'বৃষ্টিহীন খরা বুকে' ধারণ করে, 'ফসলহীন মাটির ভিতরে জমে থাকা শূন্যতার অন্ধকার নিয়ে' (খরা)- দু' দেশের বিচ্ছেদের বেদনাকে একসুরে-র বাঁধনে বেঁধে রাখে। আর সেই কারণেই 'দশমী' কবিতায় আবেগ ও স্মৃতি মথিত মানব মহিমার সাযুজ্য ভিন্ন মাত্রা পায়—

"তবে যাই
যাই মণ্ডপের পাশে ফুলতোলা ভোরবেলা যাই
খাল ছেড়ে পায়ে পায়ে উঠে আসা আলো
.....
.....
ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল
যাই পাকা সুপুরির রঙে ধরা গোধুলির দেশ
আমি যাই।"

(দশমী ঃ তুমি তো তেমন গৌরী নও)

কবির 'আদিম লতাগুল্মময়' সংকলনের কবিতাবলী রচিত হয়েছিল ১৯৭০-৭১ -এ, পশ্চিমবঙ্গ তখন নকশাল আন্দোলনে উত্তাল, এই সময়ে জন্ম হল বাংলাদেশ-এর, আর শঙ্খ ঘোষের লেখনি তখন দেশ বিভাগের, দেশ হারানোর ব্যথায় উদ্বেল হয়ে ওঠে—

"আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো আরো পালানোর দেশ জোড়া স্মৃতি"

(দেশহীন/ আদিম লতাগুল্মময়)

প্রকৃতপক্ষেই শঙ্খ ঘোষের কবিতায় 'গ্রাম' প্রসঙ্গটি বাস্তবের গ্রামের প্রতিরূপ হিসেবে নয়, কখনো এসেছে স্মৃতি সুরভিত উপলব্ধির সৌন্দর্য নিয়ে, আবার কখনো এসেছে সর্বহারা রিক্ততার নৈঃশব্দকে অবলম্বন করেও। এখানেই তাঁর কবিতায় গ্রামের কথাচিত্রণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; যা অন্য কবিদের লেখায় পাওয়া যাবে না। গ্রামের স্মৃতির সঙ্গে মনের

ভালোবাসা মিশিয়ে যে কবিতাগুলিতে গ্রামের ছবি তুলে আনেন কবি, সেখানে আন্তরিকতার আবেগ থাকলেও প্রত্যক্ষতার বা বৈচিত্র্যের দৃশ্য বিরল। যেমন—'বাবরের প্রার্থনা' সংকলনের 'বেজে উঠল ঢাক' কবিতায় দেখা যায়—

" চোখের পাতায় বইতে থাকে খাল, খালের পাশে শ্যাওলা জমা মাঠ
নেমে আসার জমি
যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা তাল সুপুরি
.....
ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে রাখে কেবল দূরের
মাটি, আমার বিলীয়মান মাটি....."

এ বর্ণনার কোথাও নান্দনিকতার বিলাস নেই, কিন্তু সত্যের আলম্বন নিশ্চয়ই আছে। গ্রাম বাংলার নদী প্রান্তর, তাল-সুপুরির শ্রেণি, সাধারণ মানুষজন এ সবই ফিরে ফিরে এসেছে তাঁর সব বয়সের লেখায়। 'দুই মুহূর্ত' কবিতায়ও আছে এ ধরণের স্মৃতি—

"লতায় লতায় জড়িয়েছে
অবাধ সবুজ স্মৃতি
শিরার ভিতরে নৌকা নদীর
সংঘাত আজও ঠিকই।" (বাবরের প্রার্থনা)

কবির পরবর্তী কয়েকটি সংকলনের সমভাবনার কবিতাগুলি অতিক্রম করে আমরা যদি চলে আসি ১৯৯৪-৯৬ সালে—প্রায় তিন বছর সময় সীমা জুড়ে লেখা হয়েছে 'শবের উপরে শামিয়ানা' সংকলনটি (প্রকাশকাল ১৯৯৬)। প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে কবি কিছু দিনের জন্য সপরিবারে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে, বিশেষ করে বরিশালের বানারিপাড়ায়। কবির পৈতৃক বাড়ি, সেই নদী, সেই খাল, সেই সুপুরিবনের সারি, সেই পুকুর বাগান, নদীতে মাঝিদের নৌকা চালানো, লগি ঠেলা, দাঁড় টানা, নদীস্রোতে ভেসে যাওয়া বদর বদর ডাক, সেই ঠাকুর দাদার মঠ—

"আর ঘাসে ঘাসে লেগে থাকা অঘ্রাণের হিম"
(ঘুম ঃ শবের উপরে শামিয়ানা)

পুরোনো এইসব স্মৃতির সঙ্গে মিশে গেছে নতুন করে আনন্দ বেদনা। 'জলেভাসা খড়কুটো' কবিতার পঞ্চম গুচ্ছে 'জলের ভিতর জেগে ওঠা জারুল গাছের মাথা দেখে নিজের' ভিটে খুঁজে পাওয়ার (৩৬) নান্দনিক বিচ্ছুরণ ঘটে ষষ্ঠ গুচ্ছে—

"তোমার লাবণ্যে আজ লেগে আছে লোনা জল
তোমার সু-বর্ণে ক্ষতলেশ
ফুল বাগিচার মতো ভোরবেলা তবু-
তুমিই আমার বাংলাদেশ।" (৩৮)

নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, স্বচ্ছলতা আর জৌলুসের আলো থেকে ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য নিজেকে সরিয়ে রেখে নস্টালজিক কবির মনে হয় এই যে আমাদের দেশ, আমাদের গ্রাম-এর কোনো পরিবর্তন নেই—তার রূপের এবং তার গ্রামীণ জীবনের কোথাও কোনো রূপান্তরের আভাস মাত্র নেই, 'থাকা' কবিতায় সেই স্বচ্ছ, সহজ বর্ণনার নিখুঁত চিত্রণ—

"এর কোনো শেষ নেই, এ আবাদ, এ জলাজমি
এই রাত দু পহরে ঢল, এই বানভাসি ভোর
.....
.....
এর কোনো শেষ নেই পানের বরজে ঢেকে থাকা
গ্রামগুলি দুই পাশে পড়ে থাকা এই ভাঙা ডানা
.....
.....
এর কোনো শেষ নেই মাথায় কুয়াশা মাখা ভোরে
দেশের ভিতরে বন্দী দেশও ঘুমায় অকাতরে।"[৬]

এতক্ষণ যে দৃষ্টান্তগুলি চয়ন করা হয়েছে পরবর্তী কয়েকটি সংকলনেও একইভাবে গ্রাম বাংলার ছবি আঁকা হয়েছে কবির নিজস্ব ভাষায়। সেগুলির আর পুনরুল্লেখ করা হল না। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ শঙ্খ ঘোষের গ্রাম সম্পর্কিত ভাবনার দ্বিতীয় পর্বে আমরা গ্রাম বাংলা যে চিত্র তাঁর কবিতায় পাই, তা পূর্ববর্তী ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। স্বাধীনতার পর প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন শেষে যুবক কবি যখন কর্মজীবনে অবতীর্ণ, এই সময় তিনি শুধু কলকাতার কলেজেই নয়, জঙ্গীপুর বা বহরমপুর কলেজেও অধ্যাপনা করেছেন, সেই সময়ে বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতি বাহিত হয়ে নয়, গ্রামকে বা গ্রাম সন্নিকট আধা শহরকে তিনি দেখেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টিতে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' (১৯৮০) সংকলনটি। এই একই সময়ে লেখা হয়েছিল 'বন্ধুরা মাতি তরজায়' (১৯৮৪) এবং 'প্রহর জোড়া ত্রিতাল' (১৯৮২)। কিন্তু তবুও 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' তার বিষয় ভাবনা ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। মোট ৬৪টি চার পংক্তি সমন্বিত কবিতায় চলেছে কবির মনোজগতের এক অন্তরঙ্গ স্রোত। প্রথম কবিতাতেই কবি লিখেছেন—

"পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, রক্তে জল ছলছল করে
নৌকোর গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ
জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর
আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে।"
(পাঁ. দাঁ. শঃ ১)

প্রশ্ন জাগে অতীত—ভবিষ্যৎহীন কৃষ্ণা প্রতিপদের অন্ধকারময় বর্তমান কি কোন পরাজয়-ব্যর্থতা-বিফলতা অথবা মৃত্যুচেতনার ইঙ্গিত বহন করে। কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে আসলে আপন মগ্ন-সত্তা তথা চৈতন্য আর অস্তিত্বকেই দেখা হয়েছে দার্শনিক প্রজ্ঞা আর আত্ম-প্রতিসরণের মধ্য দিয়ে। দাঁড় যেভাবে নৌকাকে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রবহমানতার দিকে এগিয়ে যাবার শক্তি দেয়। এখানেও কবির অন্তর্লীন সত্য ও বিশ্রামহীন তপস্যা সমকালীন সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক পৃথিবী ও মানুষের (গ্রাম ও শহরের মানুষ নির্বিশেষে) সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রেরণা দেয়, বিষণ্ণ শবের মিছিল সত্ত্বেও এক আলোকবৃত্ত তৈরি করে দেয়—আর এই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় গ্রাম এবং শহরের জটিল আন্তর্বয়ন, যেখানে—

"ফিরে যাওয়া যাওয়া নয়, সেই আরও কাছাকাছি আসা।" (পাঁ. দাঁ. শ-৪৪)

এই সংকলনের অনেক কবিতাতেই বারবার উচ্চারিত হয়েছে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের কথা, ধানের উষ্ণতা, কবি জয়দেব, অজয় অথবা সাঁকোর প্রসঙ্গ—

"ঘরবাড়ি ভিজে যায় অশান্ত ধানের মাঝখানে।
রবিউল ব'সে দেখে।" (৮ সংখ্যক)

গরুর গাড়িতে খড় নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার কথা যেমন আছে, তেমনই আছে—

"...শূন্যের থেকে আচম্বিতে গ্রামের উত্থান" (২৩ সংখ্যক)

যেখানে প্রেম ও প্লাবনের সঙ্গে মেশে ধানের শিষের নির্যাস। আর ৬১ সংখ্যক কবিতায় কবির ব্যঞ্জনাধর্মীতা গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তিনি লেখেন—

"প্রতি মুহূর্তের ধান আসক্ত মুঠোয় রাখি ধরে
তার পরে যায় যদি অবাধ সন্ন্যাসে ঝরে যায়
এই মাঠে আসে যারা সকলেই বোঝে একদিন
এক মুহূর্তের মুখ আরেক মুহূর্তে সত্য নয়।"

আপন মনের মাধুরী মেশানো কবির সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবার পর আর সঙ্গে কবির বিচ্ছিন্নতা, কারণ তখন তা শুধু কবির নয় আর, তা সর্বজনের। সেখানে সন্ন্যাসের বৈরাগ্য নিয়ে সমস্ত আসক্তি থেকে কবির মুক্তি; মুক্তি আরেকটি নতুন সৃষ্টিকে জন্ম দেবার। এই ক্রমপরিবর্তনের নামই তো জীবন, পূর্ণতা অন্বেষণই যার শেষ কথা, সেই 'শেষ হাতেও কবি মাটির কাছাকাছি, পাকা ধানের আদরের স্পর্শে', (৪ সংখ্যক) অথবা 'শস্যের নিভৃত আশ্বাসে'। আরো কিছুকাল পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং শান্তিনিকেতনে কর্মলগ্নেও বাংলার গ্রামের ধর্মীয়- সামাজিক- রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নাগরিক সচেতনতা দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। তিনি দেখেছিলেন স্বাধীন ভারত তথা বাংলার গ্রামের দারিদ্র, কুসংস্কার, শোষিত, অবহেলিত অবস্থাকে। পরিণত এই পর্বে শঙ্খ

ঘোষ সহজ-সরল গ্রাম জীবনের অনুভূতি-অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়া গ্রাম বাংলাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুঁজে পাননি, ফলে জীবনানন্দ বা জসীমউদ্দীনের মতো বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর চিত্র যেমন তাঁর এই সময়কার কবিতায় পাওয়া যায় না, তেমনই গ্রামের মানুষও তাঁর কবিতায় এসেছে বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে। যাদের কাছে শিক্ষা, সংস্কৃতি বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনকিছুই পৌঁছয় না। তারই প্রকাশ 'সহজ' (প্রহরজোড়া ত্রিতাল) কবিতায়—

"আকাশ ভেঙে পড়লে মাথায়
ঢাকার মাথা শুকনো কাঁথায়।
.....
.....
আগুন হলে সবার মাথা
রাখব হাতে তুলসী পাতা।"

অথবা বেদনার্ত কবি যখন বলেন—

"আছে বীজ, সার, কলাকৌশলও আছে, তবু মানবজমিন পড়ে আছে, নেই চাষ-আবাদ।" (আশাবাদ ঃ ধুম লেগেছে হৃৎকমলে)

এছাড়াও স্বাধীন ভারতের পরিবর্তমান পরিবেশে গ্রাম ও শহরের মধ্যে অর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম অথচ অসমতার দ্বান্দ্বিক বেদনার ছবি থেকেও দেশ তথা গ্রাম সম্পর্কিত ভাবনার এক স্বচ্ছ কিন্তু অস্থির রূপরেখা লক্ষিত হয় তাঁর কবিতায়। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' সংকলনের 'নাম' কবিতায় তাই তিনি লেখেন—

"হা রে আমার বাড়িয়ে বলা
হা রে আমার জন্মভূমি!
বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা কিছু আজ ব্যক্তিগত।"

নগর ও গ্রামের বিভাজন কবিকে আর্ত করে তুলেছিল, অপেক্ষাকৃতভাবে নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও চেতনায় সম্পৃক্ত উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির এই কলকাতা শহর বিরূপতা-বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছিল নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের মনে। বন্যার সর্বনাশে যখন ধ্বস্ত মফস্বল, জীবনানন্দের ভাষায় সেই 'নরকের মতন শহর' তখনও নির্বিকার। শঙ্খ ঘোষের 'আদিম লতাগুল্মময়' সংকলনের 'কলকাতা' কবিতায় শহুরে সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর মূর্ত হয় তাই গ্রামীণ ভাষায়, তাঁর নিজস্ব শ্লেষের অস্ত্রে—

"কইলকাত্তার লাশে
যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যিকালের মজা পুকুর
শ্যাওলা পচা ভাসে
অ সোনা বৌ আমিনা
আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমি তো আর
কইলকাত্তায় যামু না।"

এখানে যে মানুষটি কলকাতায় আসতে চায় না, তাকে গ্রামের মানুষ বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। নাগরিক সম্পদ এবং সাংস্কৃতিকতার গর্বে স্ফীত সবজান্তা কলকাতা যেন গ্রামের মানুষের কাছে এক বন্ধ দরজা। সেখানে মানুষের সহজ সারল্যের স্থান নেই।

শঙ্খ ঘোষের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাঁর কবিতায় দেশ বিভাগ, উত্তর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বাস্তবতার ছবি স্বতন্ত্রভাবে খুব বেশি আসে নি। যেভাবে জীবনানন্দ বাংলার রিক্ত গ্রামকে তুলে ধরেছেন, যেভাবে চল্লিশের কবিরা মন্বন্তর শোষিত অসহায় গ্রাম জীবনকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন, সেই দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায় না তাঁর কবিতায়। তবে তাঁর কবিতায় গ্রাম ও শহর বিভাজিতভাবে উপস্থিত হলেও সেখানে সার্বিকভাবে আছে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার স্বর; কিন্তু সেই মানুষ আলাদাভাবে গ্রামের বা শহরের মানুষ নয়। লুণ্ঠনে শোষণে ভ্রষ্টাচারে আত্মপরিচয়হীন এই দেশে সমাজ-সভ্যতার যে অন্যায় রূপ মানুষকে পীড়া দেয়, যেখানে মানুষের 'চোরের মতো ছেড়ে আসা জন্মভূমিকে খুঁজতে খুঁজতে জীবন চলে যায়, সেখানেও তো কবির মর্ম বেদনায় উঠে আসে—

"মাঝে মাঝে আমারও খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে...."
(মন্ত্রীমশাই ঃ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)

এখানে বঞ্চিত মানুষের পরিস্থিতি তুলে ধরাই কবির লক্ষ্য, তা গ্রামের বা শহরের, সে ভাবনা গৌণ। আবার বিপ্রতীপে কবি 'জন্মদিন' (মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে) কবিতায় যখন লেখেন—

"দেখা হবে তুলসী তলায় দেখা হবে বাঁশের সাঁকোয়
দেখা হবে সুপুরিবনের কিনারে
আমরা ঘুরে বেড়াব শহরের ভাঙা অ্যামফল্টে
গনগন দুপুরে কিংবা অবিশ্বাসের রাতে"

তখন কবির চেতনায় গ্রাম-শহর, অতীত স্মৃতি-ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যেন এক বিন্দুতে মিশে যায়। জীবনানন্দের মতো তিনিও 'কবিতায় প্রতি মুহূর্তে একই সঙ্গে ধরে রাখেন দুঃখ আর শুশ্রূষা, আশা আর ক্ষয়, ক্ষণিক আর চিরন্তন।' 'বহুস্বর স্তব্ধ হয়ে আছে' সংকলনের 'ধান' কবিতায় তাই একদিকে কবির আশাবাদ ধ্বনিত—

"আমার মাটির ওপর তুমি তো হয়ে উঠেছ চিরকালীন ধান।"

'চিরকালীন ধান' শব্দবন্ধটি এখানে যেন শঙ্খ ঘোষের গ্রাম বাংলার প্রতি অনিঃশেষ আসক্তিরই পরিচয়বাহী। এই অনুভব এই চেতনা এবং এই ভাষাভঙ্গি বিশ শতকের আট-নয় দশকের কবির কলমে বারবার রূপায়িত হয়েছে। কয়েকটি সংকলনের কবিতার দৃষ্টান্ত কিছুটা অতিক্রম করে চলে আশা যায় একুশ শতকের প্রথম দশকের কবিতায়। অন্যদিকে দেশ সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা হয়ে উঠুক তার জন্য কবির মঙ্গলময় প্রার্থনা—

"যেন আর খরা নয়, যেন ধানে ধানে ভরে থাকা"
(মুক্তবেণী; শুনি শুধু কবির চীৎকার)

গ্রাম বাংলার চিত্রকল্প, কুপান আর পাইপগানের বীভৎসতাকে অতিক্রম করেই কবির কলমে আঁকা হয়—

"...সবুজ পাপড়ি, ভিতরের থেকে ভিতরে,
খুলছে, খুলে দিচ্ছে আর তার মাঝখান থেকে জেগে উঠেছে ধান জমি
যখন লক্ষ্মী আসবে
লক্ষ্মী যখন আসবে"
(স্বপ্ন ঃ ধূম লেগেছে হৃদকমলে)

আর তারই সাথে কবি শোনেন—

"...ও পাড়ায় উঠেছে আজান
এ-দাওয়ায় বসে ভাবি দুনিয়া সেহমান
এখনও পরীক্ষা চায় আগুন সমাজ
এ মাটি আমারও মাটি সেকথা সবার সামনে কীভাবে প্রমাণ করব আজ!"
(মাটি ঃ জলই পাষাণ হয়ে গেছে, ২০০৩)

গ্রামীণ প্রতিবেশে এই সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের ছবি শঙ্খ ঘোষের অনেক কবিতাতেই পাওয়া যায়।

আমরা জানি ১৯৪৭-এ কলকাতায় চলে আসার পর তিনি কোনোদিনই আর গ্রামে বাস করেননি, কিন্তু গ্রাম ছিল তাঁর চেতনায়, তাঁর প্রতি মুহূর্তের যাপনে। তাই 'সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি' (২০০৬) কবিতা সংকলনেও অনিবার্য ভাবে গ্রামের সৌন্দর্য নয়, তাঁর মানবিক দায়বদ্ধতা লক্ষিত হয় নদীর পাড় ভেঙে যাওয়া নিরাশ্রয়, অসহায় মানুষদের সর্বনাশের বিধ্বংসী অভিঘাতে (পাড়িভাঙা)। 'বিভূতি' কবিতাতে (সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি) রয়েছে 'বিক্ষত দেশ গাঁয়ের নষ্ট ফসলের জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আস্থাহীনতার কথা, যার সঙ্গে অনেকাংশেই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম পর্বের কবিতায় প্রকাশিত ঈশ্বর বিরোধিতার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রামের 'রূপহারা রূপ' দেখে বুকের কাছে জমে থাকা কান্না নিয়ে কবির মনে হয়—

"তারই মাঝখানে শুয়ে মাটির আঘ্রান নিতে নিতে
হয়ে উঠি মাটি"— (মাটিজল ঃ সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি)

অথবা—

"বাংলায় এক কলকাতা আছে বটে
সে-কলকাতায় বাংলা কোথাও নেই।"

(বাংলা ঃ মাটিখোড়া পুরোনো করোটি ২০০৮)

নাগরিক সপ্রতিভে কবির এই অনাড়ম্বর অথচ ধারালো পংক্তিগুলি গ্রাম বাংলার সঙ্গে কবির আত্মবিস্তারের এবং আক্ষেপের এক গভীর দ্যোতনা নিয়ে আসে। পাঠসরণী অনুসরণ করে কবির সাম্প্রতিকতম কবিতাগুলিতে চলে আসা যায় তাহলে এই চেতনারই বিস্তার লক্ষ্য করব আমরা। গ্রামকে অতীতের স্মৃতি-সজল স্নিগ্ধ আশ্রয় রূপে অন্তরে ধারণ করে তিনি শুরু করেছিলেন কবিতা লেখা; সৃষ্টি পথের প্রায় শেষ পর্বে এসে সেই গ্রাম আর তার মনের মধ্যে কোনো অবলম্বন, কোনো স্নিগ্ধতার নীড় হয়ে থাকেনি। তিনি চিরকালের সাম্প্রতিক কবি। বর্তমান ভারতে গ্রাম ও শহরের মানুষ একই সুখ-দুঃখে বাঁধা। তিনি চিরকালই মানুষের কবি ছিলেন; সেই মানুষের কবিই তিনি আছেন।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় অবশ্য কিছু পুরাণ কথা এবং মিথ বা আদিকথা; কিছু লোকপুরাণ অর্থাৎ মধ্যযুগের গীতি বা মঙ্গলকাব্য ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে। এগুলি অবশ্য সুনির্দিষ্টভাবে গ্রামীণ উদাহরণ নয়, কিন্তু একথা বলা যেতে পারে যে নগরবাসী আধুনিক প্রজন্মের মানুষ এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সেদিক থেকে তাঁর কবিতায় লোকায়ত সংস্কৃতি সমৃদ্ধ অংশগুলিকে কিছুটা গ্রামীণ উপাদান বলা যেতে পারে। সেগুলি গ্রামীণ হয়েও ছাড়িয়ে যেতে পারে দেশ-কালের সীমানা। প্রথমে 'যমুনাবতী' (দিনগুলি রাতগুলি) কবিতাটির কথাই ধরা যাক। কোচবিহারের খাদ্য আন্দোলনে ১৯৫১ সালে গুলি চালনায় নিহত কিশোরীর নির্ধারিত দেশকালের ঘটনা কালোত্তীর্ণ মহিমা পেয়ে যায় আবহমান ছড়ার ছোঁয়ায়। নানা ঘটনার স্মৃতি একত্র জড়িয়ে গিয়ে অদেখা সেই মেয়েটির নাম হয়ে উঠল যমুনাবতী, সনাতন বাংলাদেশের কোনো যমুনাবতী সরস্বতী। বর্তমানের মধ্যে এইভাবে চলে আসে আবহমান সনাতন; হয়ে ওঠে আধুনিক মানবিক প্রতিবাদী কবিতার প্রতীক। 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতা সংকলনের 'মণিকর্ণিকা' শঙ্খ ঘোষের অন্যতম একটি বিশিষ্ট কবিতা। এই অভিসন্দর্ভের সূচিমুখে যে গ্রাম বাংলার কথা আছে, তা এই কবিতায় নেই, পরিবর্তে আছে বারাণসীর ঐতিহ্যমণ্ডিত মণিকর্ণিকা আর হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে, কালুডোমের ঘর; এক শ্মশান থেকে আরেক শ্মশান' আর চতুর্দশীর অন্ধকারে বয়ে যাওয়া গঙ্গার কথা। কিন্তু এরই সঙ্গে এই কবিতার বর্ণনায় যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ, জলের তিলক, নৌকোর মাঝি আর শ্মশানের চণ্ডাল, তা কি শুধুই বারাণসীর? বারাণসীকে অতিক্রম করে এই সবকিছুই কি বাংলাদেশেরও নয়? হরিশ্চন্দ্র

আর মণিকর্ণিকার উল্লেখে কবি বিশ্বাসেও তো বাঙালী তথা ভারতীয়ত্বের চিরকালীন সংস্কারের আশ্রয়। আর এরই সমান্তরালে বয়ে চলে গঙ্গা নদী। শুধু বারাণসীতেই নয়, বাংলাদেশেও এবং কবি মনেও, মৃত্যু চেতনাকে অবলম্বন করেও এ কবিতা কবির জীবনের প্রতি নিবিড় ভালবাসারই এক রূপ, যেখানে গ্রাম শহরের বিভাজন নয়, এক বিশ্বজনীনতাই প্রাধান্য পেয়ে যায়। গোটা দেশ জুড়ে সংঘর্ষ-অশান্তি-লাঞ্ছনা-আত্মক্ষয়ের বিবর্ণ দিনে পূর্ববর্তী প্রজন্মের দায়বদ্ধতা ও ব্যর্থতার সঙ্গে ইতিহাসের কিংবদন্তী মিশিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'বাবরের প্রার্থনা'। পিতৃহৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির কবি যখন 'শহরের প্রান্তে প্রান্তরে ধূসর শূন্য'-তার অতল গহ্বরে বসে লেখেন—

"আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"—

তখন এর সাদৃশ্যে কোথাও যেন ভেসে আসে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর সেই চিরায়ত প্রার্থনা—

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

এই পংক্তি এঁকে দেয় আবহমান বাংলাদেশ আর গ্রামীণ মানুষের অন্তরের আকুলতাকে। 'বন্ধুরা মাটি তরজায়' সংকলেনও কবি ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন 'অগস্থ্যযাত্রা' এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' কবিতা দুটিতে।

দেশনিহিত সময়কে দেশোত্তর সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার প্রয়োজনে শঙ্খ ঘোষ আশ্রয় করেন পুরাণের। প্রত্যক্ষকাল থেকে ধারণাকালে যেতে গেলে পুরাণ হয়ে ওঠে এক নিশ্চিত অবলম্বন, যার মধ্যে সংহত থাকে সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি আর সংস্কার। তাই 'হেতালের লাঠি' (মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে) কবিতায় দেখা যায় দেশজোড়া নৈরাজ্যের অদ্ভুত আঁধারের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ রচনা করে, তারা যেন মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের মতো হেতালের লাঠি হাতে বেহুলা-লখিন্দরের বাসরকে পাহারা দেয়। মনসামঙ্গলের অতীত স্মৃতি বর্তমানকে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে—

"...আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি
দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর ক'রে"

পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলার স্বপ্নে কবির চোখে ভিড় করে আসে শহরের নয়, গ্রাম বাংলার কথা—

"ন... দিনানুদিনের আলপথে
আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর।"

(হেতালের লাঠি ঃ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)

স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্য জীবন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে অনেক দূরে বাস করে কিন্তু সেদিন-"মুহূর্তের তুড়ি লেগে উড়ে যায় সমূহ সংস্কার"—সেদিন কবি সেই মুষ্টিমেয় প্রতিরোধকারীর কথা ভাবেন যারা আরুণি উদ্দালকের মতো নিজের

শরীর দিয়ে আল রচনা করে, বিনাশকে বাধা দেয়—

"আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও
স্পষ্ট হও, বাঁচো—"
(আরুণি উদ্দালক ঃ তুমি তো তেমন গৌরী নও)

'অন্ধবিলাপ' (ধুম লেগেছে হৃদকমলে) কবিতাটির প্রেক্ষিতে এবং সমকালীন ঘটনার অভিঘাতের মধ্যেও চলে আসে পুরাণ প্রসঙ্গ, আসে ধান জমি, ভূমিসেনা আর ভূস্বামীদের কথা, অতীত-বর্তমান একা কোর হয়ে চলে ভবিষ্যতের অভিমুখে। উৎপীড়িত মানস সংঘবদ্ধ হতে থাকে—

"ধানজমিতে খাসজমিতে সমবেত লোকজনেরা
ধেয়ে আসছে সামন্তদের...."

শঙ্খ ঘোষের বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রজ্ঞায় পুরাণ যেন নবরূপ লাভ করেছে এইসব সৃষ্টিতে।

'কবিতার মুহূর্ত'—এ শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন—"প্রায় কুড়ি বছর হতে চলল (১৯৬৬) নতুন দেশের, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে ভরসা হয় না যে তৈরি হয়ে উঠবে কোনো নতুন সমাজ। ভাঙনে ভাঙনে কি ভরে এল সব? কোনো কি লক্ষ্য আছে আমাদের এই দিশেহারা সংস্কৃতির?" 'সেই-বাংলা' থেকে 'এই- বাংলায়' হেঁটে চলা কবির বুকে জমা অসম্পূর্ণতার কষ্ট তাঁকে চকিত মনে করায় আত্মপরিচয়হীন এক সত্যকামের কথা, ছান্দোগ্য উপনিষদের 'জাবাল সত্যকামের' (তুমি তো তেমন গৌরী নও) কথা। শঙ্খ ঘোষের এই কবিতায় সত্যকাম স্মরণ করে তার দেশ পরিচয়ের নিশানা। এই কবিতায় কবি মূর্ত করে তুলেছেন দেশ-বিভাগোত্তর মানুষের খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়ার ছবি, গঙ্গা-পদ্মার এপার-ওপারে টানাপোড়েনের যন্ত্রণা আর আত্মপরিচয়ের সমস্যা—

"কী আমার পরিচয় মা?"—

বহ্নিমান এই প্রশ্নের শিখায় জ্বলে উঠতে থাকে দেশ-কাল, গ্রাম-শহর, স্মৃতি ও সত্তায় মোড়া জীবন ও জগৎ। আবার একই সঙ্গে এরই ভিতর থেকে একেবারে লৌকিক প্রত্যক্ষতায় যেন উঠে আসতে চায় গ্রাম-শহরের সম্পর্কের ইঙ্গিত। 'জাবাল সত্যবান'-এর মধ্য দিয়ে স্পর্শ করা যায় দেশ-সমাজ ও ব্যক্তি মানসের বিভিন্ন সংঘর্ষে জ্বলতে থাকা আধুনিকতার সংকটকেও। গ্রাম জীবন থেকে শহরে সদ্য আগত এক গ্রামীণ কিশোরের বিপন্ন-বিস্ময় ও বিপন্নতায় নিহিত আর্তনাদ আর পৌরাণিক সত্যকামের হাহাকারের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে গ্রাম-শহরের প্রত্যাখ্যান ও আগ্রাসনের ইতিহাস, গ্রহণ- বর্জন- বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ধারাবাহিক সত্যের প্রকৃত রূপ। যদিও গ্রাম জীবন আর নগর জীবনের কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাত এ কবিতায় প্রাধান্য পায়নি, তবুও কবির অন্তরের বেদনাবিধুর অনুভব নিহিত রয়েছে 'শস্যময় ভালোবাসা প্রান্তরে', আর তারই অভিনব প্রতিফলন নিম্নোক্ত

পংক্তির ভাষারূপে—

"এখন আজানু এই উদাসীন মাঠে মাঠে আমার সকাল
তুমি দিয়েছিলে ভার আমি তাই নির্জন রাখাল।"
(জাবাল সত্যকাম ঃ তুমি তো তেমন গৌরী নও)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'আত্মঘাত' (প্রহরজোড়া ত্রিতাল) কবিতাটির কথাও। যদি এই কবিতাটি পূরাণ বা লোকায়ত চেতনায় সম্পৃক্ত নয়, তথাপি, ভাবসাদৃশ্যের কারণেই রচনাটি সম্পর্কে দু-চার কথা বলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এই ভাবসাদৃশ্য তপোবনের পরিশীলিত পরিবেশের বাইরে থেকে আশা এক পিতৃপরিচয়হীন বালকের নৈঃসঙ্গ বোধের সঙ্গে তুলনীয়। 'কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থে কবি লিখেছেন—"যাদবপুরে যারা পড়তে আসে তাদের মধ্যে কিছু কিছু থাকে গ্রাম থেকে সদ্য উঠে আশা যুবক, এই প্রথম তারা কোনো জাঁকজমকের শহর কেন্দ্রে এসে পৌঁছল।" আবরণে, আচরণে, উচ্চারণে এই গ্রামের মানুষগুলির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের পরিশীলিত পরিবেশেরও যে দূরত্বের বিচ্ছেদ, শহরে সহপাঠীদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের যে তির্যক বহির্প্রকাশ, তার চূড়ান্ত প্রতিবাদের ধরণে শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা গ্রামের একটি ছেলে বেছে নিয়েছিল আত্মঘাতের পথ, ২৫শে বৈশাখের ভোর বেলায়। গ্রামীণ বিশ্বাস, সজলতা, বা গ্রামের অশ্বত্থের বৈপরীত্যে ছাতিম—শিরীষের চোখ ঝলসানো জগতের অসারতা প্রতিপন্ন হয়েছে এখনো ক্ষোভে অভিমানে ধিক্কারে প্রশ্ন ওঠে—

"কী ভাষায় আমাদের একান্ত বাঁচাও হলো পাপ!"
(আত্মঘাত ঃ প্রহরজোড়া ত্রিতাল)

কবি লিখেছেন—

"নিজের মুখ থেকে শুরু করে আমার দেখা সবকটি ওই গ্রামীণ মুখ তখন একসঙ্গে লাফ দিয়ে ওঠে আমার চোখের সামনে।" ("কবিতার মুহূর্ত")

আর এই কারণেই হয়তো গ্রাম শহরের জটিল সম্পর্ক বিন্যাসের মাঝখানে কোথাও যেন এক যন্ত্রণাকাতর হাতের দিকে স্নিগ্ধ হাত বাড়িয়ে দেয় শঙ্খ ঘোষের কবিতা। নাগরিকতার উদ্ধত্য থেকে যেন কোনো সহজ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে তাঁর কবিতা।

পুরাণ, মঙ্গলকাব্য বা ইতিহাস ছাড়াও গ্রামীণ বাংলার লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কার এবং সংস্কৃতিকেও কবি অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় বারবারই এসেছে দেবী অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠার বাসনা (দেশকে ছুঁয়েছি পাথরে ঃ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে) মঙ্গল ও কল্যাণের দেবী লক্ষ্মীর আগমনের কথা (স্বপ্ন ঃ ধুম লেগেছে হৃদকমলে) 'লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ' আর 'কলার ভেলা'—র প্রসঙ্গে মনে আসে "টোপ"

(গোটা দেশজোড়া জউঘর) কবিতাটি—

"আমার একারই ঘরে লক্ষ্মী পেতেছেন তাঁর পিড়ি
আমারই দু হাত দিয়ে নিকিয়ে নিয়েছি সব দাওয়া।
.....
পথের ভড়ং ছেড়ে আমার এ ঘরে চলে আয়
ধনধান্য পুষ্প দিয়ে ভরে দেব কানায় কানায়।"

'শারদ বেলায় শস্যভূমির দু-পাশে ভরে ওঠা কাশফুলের বন' (সহজ ঃ নিহিত পাতালছায়া), 'দূর্বাদল আর আম্রপল্লবের সহযোগে অঞ্জলির' (যাবার মতো নই ঃ নিহিত পাতালছায়া) চিত্রকল্পে স্পষ্টতই অনুভূত হয় বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য, এই সংস্কার ছিল কবির অন্তর্গহনের নিবিড় সান্নিধ্যে। গ্রাম বাংলার গাজন উৎসবের কথাও ব্যক্ত হয়েছে একাধিক কবিতায়। 'ভাটিয়ালি থেকে সারিগানের সুরে' 'খাল নদী পেরিয়ে পেরিয়ে' 'হাজার বছর ধরে বয়ে' চলা 'ধানের পসরা'-র মধ্য দিয়ে স্পর্শ করা যায় বাংলার লোকজীবনের ছন্দ, তার সারল্য, তার সংস্কৃতির প্রত্যয়ী সংবেদনকে। (গাজন ঃ মাটি খোঁড়া পুরোনো করোটি)। 'পিতৃপুরুষের জন্য আকাশ প্রদীপ জ্বালা' (ত্রাতা ঃ হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ) অথবা "গঙ্গার পিঙ্গল জলে অজানু দাঁড়িয়ে আজ ছেলের তর্পণ করেছে বাবা" (ছেলের তর্পণ করেছে বাবা ঃ প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে)—শীর্ষক পংক্তিগুলিতেও কবির বক্তব্যের অন্তর্বয়ন ছুঁয়ে যায় গ্রাম বাংলার দীর্ঘ লালিত লোকাচারকে। শঙ্খ ঘোষের সর্বশেষ প্রকাশিত সকলন 'শুনি শুধু নীরব চীৎকার' (২০১৫)-এর শেষ কবিতা 'পানপাতা'। যেখানে কবি লিখেছেন-

"বিদায় দেবার আগে
দু-গালে দুটো পানের পাতা বুলিয়ে দিতে দিতে
ঠাকুমা বলেছিলেন; এসো আবার।
বিদায় নেবার আগে
কলস ভরাজলে নিজেরই মুখচ্ছবি দেখতে দেখতে
বলেছিলাম ঃ আবার আসব।"

জীবনানন্দের সেই অনাহত পংক্তি—

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে
এই বাংলায়।"

তারও আগে রবীন্দ্রনাথের—

"আবার যদি ইচ্ছে কর আবার আসি ফিরে।"

বাস্তবে যদি নাও হয়, আকাঙ্ক্ষায় অমলিন এই গ্রামে ফিরে যাওয়ার প্রার্থনা কিন্তু থেকেই যায়। এইভাবে কবির কবিতায় হৃদস্পন্দনে জেগে থাকে গ্রামময় বাংলাদেশ।

আর দেশ-মাটি-মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা কবির জীবনব্যাপী অনুভবের প্রকাশ ঘটে 'বাস্তু' (হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ) কবিতার শেষ পংক্তিতে—

"স্মৃতিতে চেয়ে কোনো বাস্তবিক বাস্তুভূমি নেই।"

কিন্তু এইসব কবিতা লেখার পরও কেটে গেছে বেশ কিছু সময়। এই মুহূর্তে বাংলার গ্রাম আর শহরের তুলনায় কোনো সরলতর দিনযাপনের প্রশান্ত প্রশ্রয় নয়, আজকের পৃথিবীর সর্বগ্রাসী সম্প্রসারণ—মোবাইল থেকে ইন্টারনেট; সেই সঙ্গে বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনীতি—সমস্তই গ্রামকে বেঁধে দিয়েছে শহরের সঙ্গে। এই সত্যের স্বরূপ চেনা যায় না জসীমউদ্দীনের কবিতায়, যা চেনা যায় শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ঃ

"গাঁয়ে কোণে কোণে গাঁয়ের মানুষ খেতে বা খামারে বহিরাগত।
মরা মানুষের মুখাচ্ছাদন সরিয়ো না, ও তো বহিরাগত।
মাঠে মাঠে ধরে যেটুকু ফসল সেসবও এখন বহিরাগত।
চালার উপরে ঝুঁকে পড়ে চাঁদ বহুদূর থেকে বহিরাগত।
বর্শা ফলকে বিষ মেখে নিয়ে কালো মুখোশের আড়ালে যত
বহিরাগতেরা এসে ঠিক—ঠিকই বুঝে যায় কারা বহিরাগত।"

(বহিরাগত ঃ মাটি খোঁড়া পুরোনো করোটি)

শঙ্খ ঘোষের সাম্প্রতিক কবিতায় তাই মানুষ যে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত তারা গ্রামবাসী ও নগরবাসী নয়, তারা একদিকে স্বার্থপর সুযোগ সন্ধানী, সচ্ছল; অন্যদিকে দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসনের অদ্ভূত জটিলতায় আক্রান্ত অসহায় বিত্তহীন শ্রেণী। দলে-উপদলে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ছিন্নভিন্ন ছত্রখান আমরা, তাই—

"আমাদের এই তীর্থে আজ ভেঙে পড়ার উৎসব..."

(আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব ঃ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)[১৪]

সর্বনাশা এই বিধ্বংসী দিনগুলিতে কবি অনুভব করেন—

"আজ দেশ জোড়া বারণাবতের
প্রস্তুত সব জতুগৃহ" (জতুগৃহ ঃ প্রহরজোড়া ত্রিতাল)

'গোটা দেশ জোড়া জউঘর'—এর এই প্রেক্ষাপটে শঙ্খ ঘোষের আত্মানুসন্ধান, সমাজবীক্ষা, জীবনবোধ, সময়চেতনা, দার্শনিকোচিত সত্যান্বেষণ ও সমকালমনস্কতার অভিনব সমন্বয়ে গ্রাম বাংলা এবং শহর বাংলা জীবন্ত হয়ে থাকে তাঁর কবিতায়। তারই নিদর্শন 'শুনি শুধু নীরব চীৎকার' সংকলনের 'জলস্পর্শ' কবিতায়—

"গ্রাম চিনতাম পুকুর দিয়ে, দেশ চিনতাম গ্রামে
লাফিয়ে উঠল সমস্ত মন
ধারা জলের নামে।

.....

.....

তৃষাকাতর শরীরে কেবল পুকুর খুঁজে বেড়ায়
সর্বসত্তা খুঁজেছে অবগাহন—
সবাই বলে 'পুকুর? সে তো উধাও কবের থেকে
রাত্তিরে কাল যে হর্ম্যতে স্বর্গ পেলে প্রায়
ভিতের তলায় পুকুর তো তার বাহনা!'
ত্রিকাল মেলে দিচ্ছে তিন নয়ন,
জুড়ে দিচ্ছে আকাশ পাতাল, শুষে নিচ্ছে প্রাণ
উদার উন্নয়ন।"
আর কবির মনে চিরজাগরুক হয়ে থাকে সেই 'সর্বংসহা মহাদেশ'—
"উদাসীন যাকে খুব সহজেই ভুলে যেতে পারি
তবু তুমি ধরে রাখো আমার পায়ের কাছে মাটি
ঘাটে ঘাটে জ্বেলে রাখো আকাশ প্রদীপ সারি সারি

.....

তোমাকেই জানি আজ আমার বিষাদ জন্মভূমি।"
(বিষাদজন্মভূমি ঃ গোটা দেশ জোড়া জউঘর, ১৯২০)

তথ্যসূত্র ঃ

১। মুখোপাধ্যায় অজিত ঃ আমার বন্ধু শঙ্খ, নিঃশব্দের শিখা-শঙ্খ ঘোষ, শঙ্খ ভাবনার অনুষ্টুপ সংকলন, সম্পাদনা সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬৮।

২। ঘোষ শঙ্খ, কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৮৭, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা - ১৩-১৪।

৩। আচার্য তারাপদ, শঙ্খ ঘোষের কবি জীবন, দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৯, দে'জ প্রথম সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা-২৩।

৪। আচার্য তারাপদ, আমি কি নিত্য আমারও সমান?' শঙ্খ ঘোষের কবিতা, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম 'কবিতাযাপন' পত্রিকায় প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০০, প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩০।

৫। আচার্য তারাপদ আরম্ভের পটভূমি, মুখোপাধ্যায় অজিত ঃ আমার বন্ধু শঙ্খ, নিঃশব্দের শিখা-শঙ্খ ঘোষ, শঙ্খ ভাবনার অনুষ্টুপ সংকলন, সম্পাদনা, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৩ পৃষ্ঠা-৪২৫।

৬। আচার্য তারাপদ, 'আমি কি নিত্য আমারও সমান?' শঙ্খ ঘোষের কবিতা, প্যাপিরাস, কলিকাতা, প্রথম 'কবিতাযাপন' পত্রিকায় প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০০, প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা ১০১-১০৩

৭। ভৌমিক রথীন, পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ পবাহিত জীবনের ধ্বনি, মুখোপাধ্যায় অজিত ঃ আমার বন্ধু শঙ্খ, নিঃশব্দের হিখা-শঙ্খ ঘোষ, শঙ্খ ভাবনার অনুষ্টুপ সংকলন, সম্পাদনা, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৩৪৮ক্ষ্ম৩৪৯।

৮। নন্দী শাওন, পঞ্চাশ ঃ কবিতার নয়াচর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ২০১২, পৃষ্ঠা-৯১।

৯। অশ্রুকুমার শিকদার ঃ কালের মাত্রা ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা, মুখোপাধ্যায় অজিত ঃ আমার বন্ধু শঙ্খ, নিঃশব্দে শিখা-শঙ্খ ঘোষ, শঙ্খ ভাবনার অনুষ্টুপ সংকলন, সম্পাদনা, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১১০

১০। তদেব, পৃষ্ঠা-১১০

১১। তদেব, পৃষ্ঠা -১১১।

১২। দত্ত দুর্গা ঃ নির্বাক মুখ, সবাক চোখ, মুখোপাধ্যায় অজিত ঃ আমার বন্ধু শঙ্খ, নিঃশব্দের শিখা-শঙ্খ ঘোষ, শঙ্খ ভাবনার অনুষ্টুপ সংকলন, সম্পাদনা, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, কলকাতা প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৩।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬৫।

১৪। অশ্রুকুমার শিকদার ঃ কালের মাত্রা ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা, মুখোপাধ্যায় অজিত ঃ আমার বন্ধু শঙ্খ, নিঃশব্দের শিখা-শঙ্খ ঘোষ, শঙ্খ ভাবনার অনুষ্টুপ সংকলন, সম্পাদনা, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১১২।

■ শম্পা বসু—অধ্যাপিকা ও প্রাবন্ধিক

জয়গোপাল মণ্ডল

কবিতার রাজপথে 'অভিশাপ'

কবিতা ব্যক্তির বুকে ফোটা ফুল, কিংবা ধারালো অস্ত্র যা দিয়ে মনের ওপর জমা হওয়া অন্যায় অত্যাচার পীড়নের অবসান ঘটায়, নবজন্মের পথ দেখায়। সূর্যালোক যেমনভাবে আলোকিত করে অন্ধকার পৃথিবী কবিতা তেমনি, কবিতা মরুভূমে সৃষ্টি ধারার জল। এখানে কবি অন্তরের অস্ফুট কথাকে ছন্দে-অলংকারে সাজিয়ে তোলে—যা স্বথঃস্ফূর্ত আবেগে প্রসারিত হয় অন্তর থেকে অন্তরে, হয়ে ওঠে চিরকালীন-সর্বজনীন। যেখানে কবি নিরপেক্ষ ব্রহ্মা—মানুষ তার ধর্ম, মানুষের ভালবাসা তার পথ, মানবতা প্রতিষ্ঠাই তাঁর স্বপ্ন।

যুগ যুগ ধরে কবিতারই চলছে লালন, কবিতা জীবনবোধের প্রকাশ—'প্রকাশই সাহিত্য' (রবীন্দ্রনাথ), সত্যম-শিবম্-সুন্দরম তার মূরতি; তা সৃষ্টিকারক ধ্বংসের লীলায়, পথ ভোলা পথিককে পথ দেখায়। মানবসভ্যতার আদি কাল থেকে সুখ-দুঃখ প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম এই শরীর—যেখানে মানুষ নিজেকে উজাড় করে দেয় গোপন ভাবনার যা কিছু, অলক্ষ্যে জন্ম নেওয়া চেতনার আলো। সে কখনো সূর্যের মতো প্রখর দিনের মত স্পষ্ট, কখনোবা চাঁদের মতো মধুর রূপসী, যার গর্ভে জন্ম নেয় আঁধারের স্বপ্ন। এখানে একসাথে থাকে লেনিন থেকে বাপু মহাত্মা, লেডি ম্যাকবেথ থেকে অশরীরী আত্মা, যুদ্ধে রক্তাক্ত মুখের কান্না, শান্তির ললিত বাণী। যেখানে 'কাব্য রাসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়। সহৃদয় কাব্য পাঠকের মন।" (অতুলচন্দ্র গুপ্ত)

বাংলা কবিতা নিয়ে তো কত শত বছর ধরে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ—যেখানে কবি মীমাংসা চায়—'চুলচেরা অন্ধকারে কেন জমা হয় লাশ?' কবিতার শরীর, বিষয় ভাষা-শব্দচয়ন, তার ভাঙাগড়া—কতবার আন্দোলিত করেছে পাঠককে। বিশেষ করে জীবনে যখন বিজ্ঞান রাজত্ব বিস্তার শুরু করল, সকলের জন্য হল শিক্ষা—বিশ্বকবিতা ধারার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতায় বিহারীলালেরে হাত ধরে শুরু হল নতুন আঙ্গিক গড়ার কাজ, তারপর রবীন্দ্রনাথ একাই একটু যুগ তৈরি করল, সৃষ্টি করল নতুন ঘরানা। এল কল্লোল তার উত্তাল ঢেউ নিয়ে—যুক্ত হল বামপন্থী লড়াই—হাতিয়ার হয়ে উঠল —শ্রেণীর বাঁচার কবিতা পথ, অবশেষে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা—এ তো রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পূর্বপুরুষ যত তাদের সংমিশ্রণে পথ চলা—তবে ক্রমাগত ভেঙেছে ছন্দের আদল, কবিতার শরীর নির্মাণে নতুন নতুন রূপ। এখন 'সবুজ কাগজে সবুজেরা লেখে কবিতা/ পৃথিবী এখন তাদের হাতের মুঠোয়।' (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) এখন কবিতা 'কালো বস্তির পাঁচালি'। কবিতা এখনও আত্মাকে শুদ্ধ করে; 'করুণায় করে

নমনীয়—প্রেমে অপরূপ-স্বাধীন স্বচ্ছ মুক্ত ধারা।' মানবিক প্রত্যয় সেখানে রক্তে স্পন্দন জাগায়। এখানে কবি প্রতিটি যুগে সৎ পথদ্রষ্টা, পক্ষপাতিত্ব তাঁকে একঘরে করে।

কোন কোন কবি পথ চলতে চলতে লোভী হয়ে পড়েন, রাজসভাকবি হয়ে উঠতে চান। ফলে রাজরোষ উপেক্ষা করে নিতে চান রাজার পুরস্কার। এ তো মধ্যযুগীয় বর্বরতা—যখন রাজার আদেশে রাজসভাকবি কাব্য রচনা করতেন। অথচ 'রাজা কবিতা পড়ে না' (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সাম্প্রতিক কালে খ্যাত নামা তরুণ কবি শ্রীজাত-র বিরুদ্ধে এক মৌলবাদী শক্তি এফ. আই. আর. করে—কারণ খুঁজতে নেমে পড়লাম কবিতার রাজপথে। দেশ ও দশের জীবন এখন চিতার পাশ দিয়ে চলে। বিশ্ব জুড়ে চিতার সজ্জা—অন্ধকার সময়। এই রাত্রির সূচনা সেই বিশ শতকের শুরু থেকে—যে সময় রবীন্দ্রনাথও নেমেছিলেন পথে। অসময়ে রাখী বন্ধন উৎসব করে—সম্প্রীতির মিছিল করে বাংলা হৃদয় জয় করেছিলেন, প্রার্থনা করেছিলেন—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান।"

সেদিনের পর কিছুটা স্তিমিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক আগুন, কিন্তু যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল ব্রিটিশ শাসক—সেই বিষবৃক্ষের ছড়ানো আগুনে আজও আমরা পুড়ছি,পুড়ছে স্বদেশ—এখন বিস্তৃত হয়ে সারা বিশ্ব পুড়ছে। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ২ এপ্রিল কলকাতার মসজিদের সামনে আর্যসমাজীদের ধর্মীয় উৎসব মিছিলে বাজনা বাজানোর ফলে শুরু হয় দুই সম্প্রদায়ের লাঠালাঠি-কাটাকাটি—কবি রবীন্দ্রনাথ (চিঠিপত্র ৫/পৃঃ৯৭) লিখলেন, "হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিসের সমাধান হয় না। যে রীতিমত জ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ধর্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই। য়ুরোপেও এককালে এই বিপদ ছিল, তারা কেবল শিক্ষা দ্বারা মনের বিকার ঘুচিয়ে তবে উদ্ধার পেয়েছে।"—প্রায় এক শত বছর অতিক্রান্ত ইতিমধ্যে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। তথাপি যে দাঙ্গার মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছিল দুটি দেশ, সেই দাঙ্গার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলেই চলেছে তূসের আগুনের মতো। কবি সাহিত্যিকরা বারে বারে এই তিমির অবসানে কলম ধরেছেন—মানবতার মূর্তি রচনা করেছেন—মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠায় মগ্ন থেকেছেন।

এই স্পর্শকাতর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে বিশেষ ভাবে সচেতন উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর সাহিত্যে হিন্দু-সুসলমান জৈন-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সব ধর্মই মানব ধর্মে রূপ পেয়েছে। বারে বারে দীর্ণ হয়েছে তাঁর হৃদয়—যখনই মানুষের

রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার মাটি, জীবনের এই বৃহৎ যুদ্ধক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন একক ও আদর্শনিষ্ঠ সৈনিক, সেখানে কখনোই তিনি নিজের ধর্মকেও প্রশ্রয় দেননি, এখানে তিনি অপরাজেয়। এই ঘন তিমিরে তিনিই ছিলেন অগ্রসেনানী তিমির যুদ্ধে।

জাতপাতের নামে যে অন্ধ কুসংস্কার মানবজীবনকে বিপন্ন করে। সমাজকে টুকরো টুকরো করে তার মূলে তিনি কুঠারঘাত করেছেন—'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছো জুয়া/ছুঁলেই তবে জাত যাবে? জাত কি ছেলের হাতের মোয়া।" (জাতের বজ্জাতি/ বিষের বাঁশি-১৯২৪)। সাম্প্রদায়িক বিরোধী কবিতা লিখলেন ব্যথিত চিত্তে—

'কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার।
উদিবে অরুণ ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার!
ভারত ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার।"

(হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ/মণিমালা/১৯২৭)

কবি আশাবাদী, সেই সূর্যালোকে স্বপ্ন দেখেছেন হিন্দু মুসলমান এই দুই ভাই-এর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে অবসান ঘটবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-দ্বন্দ্বের। তাই তো তিনি 'কোরান', বেদ, বাইবেল কাঁধে নিয়ে যারা ধর্মবিলাসিতায় মানব ধর্মকে কলুষিত করছে, কবি তাদের চোখ থেকে ঠুলি খুলতে বলেছেন,

"পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল। মুর্খেরা সব শোনো
মানুষ এনেছে গ্রন্থ;—গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।" (মানুষ/সাম্যবাদী)

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ১৫ ডিসেম্বর বর্তমান কলেজস্ট্রীট কফি হাইসে তাঁকে যখন সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, "কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুইনয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করবার চেষ্টা করছি; গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করছি।" (পশ্চিমবঙ্গ/মে-জুন ১৯৯৯/পৃঃ ৩৩)। এইজন্য তিনি নিজ ধর্মের মানুষকেও প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন—

"আল্লাতে যাঁর পূর্ণ ইমান কোথা সে মুসলমান!
————————————————
স্ত্রীপুত্রে আল্লারে সঁপি জেহাদে যে নির্ভীক
হেসে কোরবাণী দিত প্রাণ হায় আজ তারা মাগে ভিখ।"

তিনি পথ দেখান মানুষকে—"কোথায় খুঁজিস ভগবান, সে যে তোরই মাঝে রয়/চেয়ে

দেখ সে তোরই মাঝে রয়।" ১৯২৬ এর এপ্রিলে কলকাতায় যখন দাঙ্গা হয় তিনি 'মন্দির-মসজিদ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সহজ গদ্যে শাণিত ব্যঙ্গে চৈতন্য জাগরণের প্রয়াস গ্রহণ করেন—

"মারো শালা যবনদের। মারো শালা কাফেরদের। আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কাটাকাটি, তারপরে মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা-কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল—তখন আর আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছেনা। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, 'বাবাগো, মাগো'—মাতৃপরিত্যক্ত দুটি ভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে।

দেখিলাম হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরে পাষাণ দেবতা সাড়া দিলনা। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।"

কবি নজরুল ইসলাম বাংলা মায়ের সন্তানদের অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আজও সমগ্র পৃথিবীতে সেই ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবীদের রাজত্ব চলছে। আর তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেই বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছে চরাচরে রাজনীতির নগ্ন বেসাতিরা। তাই এর পরেও ১৯৪৬ এর বেদনাদায়ক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ তৈরি হয়। সেদিন ভারতবাসী স্বপ্ন দেখেছিল হয়তো এবার শান্তি ফিরবে এ দেশেও। কিন্তু না—দেশের কোণে কোণে রয়ে গেছে সেই ধর্মের নায়কেরা। কবি নীরেন চক্রবর্তী ১৯৪৮-এ লিখলেন—

"রাজপথে ছিন্ন শব, ভগ্নদ্বার প্রাসাদে কুটিরে
নির্জন বীভৎস শান্তি। দলভ্রষ্ট আহত অশ্বের
চকিত খুরের শব্দ, মুমূর্ষুর আর্তকণ্ঠ, ফের
ভৌতিক স্তব্ধতা। শূন্য মসজিদের গম্বুজে খিলানে
রাত্রির নিঃসঙ্গ ছায়া নামে। প্রাণ-যমুনার তীরে।
মৃত্যুর উৎসব সাঙ্গ, বিহঙ্গ-হৃদয় ছিন্ন পাখা।
নগরে গ্রামে ও গঞ্জে মসজিদে মন্দিরে সর্বখানে,
দুরন্ত তাতার দস্যু তৈমুরের পদচিহ্ন আঁকা।"

(শ্রেষ্ঠ কবিতা/নবম সস্করণ ১৯৯২/পৃঃ১৮)

কবি সচেতনভাবে দাঙ্গাকারীকে দস্যু লুঠেরা মধ্য-এশিয়ার তাতার এর তৈমর লঙের ঐতিহাসিক চালচিত্রে রূপ দিয়েছেন। তৈমুর লঙের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ লুঠ করা, সেখানে কোনো মানবপ্রেমের জায়গাই নেই। সত্যিতো যেসব মৌলবাদী মানবজাতিকে ধর্মের অস্ত্রে রক্তাক্ত করে তারা তো নিংসন্দেহে 'দুরন্ত তাতার-দস্যু

তৈমুর'। এখানে কবি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মব্যবসায়ীকে চিহ্নিত করেননি—কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তো উভয়েই সমান দোষী—তারা তো 'তৈমুর-দস্যু।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও দুই সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করে চিহ্নিত করেছেন কারা ফ্যাসিস্ট, সন্ত্রাসবাদী বা দুষ্কৃতকারী—

এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার
বসন্তের দিনে করে বসবাস নেপথ্য ও স্টেজ
হিন্দু ও অহিন্দু করে কোলাকুলি, হত্যা, মুষ্ঠাঘাত।"

(শ্রেষ্ঠ কবিতা/একাদশ সংস্করণ ২০০৯/ পৃঃ৯৬)

কবি আশিস সান্যাল মানবতাবাদী কবি, সমাজ সচেতন। মানুষের প্রেম তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। তিনিও বেদনায় জর্জরিত হয়েছিলেন সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ের রক্তপাতে। মানবধর্ম তথা মানবজাতির প্রতিষ্ঠা তাঁর স্বপ্ন। তাই বাংলার মানুষের রক্ত ঝরাতে তিনি মানুষের কাছে প্রার্থনা করেন—

"পৃথিবীতে বেঁচে থাক
পরিশুদ্ধ মানব সন্তান।"

যারা ধর্ম ব্যবসায়ী—তাদের তিনি চান না, চান না রক্তপাত। 'রক্ত ঝরে' কবিতাটিতে তাই সাম্প্রদায়িক দুস্কৃতিকে 'অশুভবর্বর' বলেছেন,

" বিপন্ন বাতাসে শুনি
বেদনার্ত স্বর
পৃথিবীর সবখানে অশুভবর্বর
অভুক্ত সিংহের মতো
অজস্র দানব
খোঁজে আজো অতর্কিতে
রক্তের লবণ-স্বাদ
পড়ে আছে চারদিকে
মুণ্ডহীন শব।"

(শ্রেষ্ঠ কবিতা/দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩/পৃঃ ১৫)

বোঝা যায় কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কলঙ্কিত করে দুস্কৃতকারীকে—তা সে যে ধর্মেরই হোক। এই রক্তপাত যেন শুরু হয়েছিল প্রস্তরযুগ থেকে—কবির চেতনায় কেবল স্বদেশ নয়—সমগ্র পৃথিবীর রক্তপাত আলোকিত—তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের মতো যেন স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছেন—'অমৃতের মন্ত্র দাও/ হে পিতা/.....শোনাও ধূসর শেষে/প্রত্যাশার গান/পৃথিবীতে বেঁচে থাক/পরিশুদ্ধ মানব সন্তান।" (ঐ/১৫৯)।

সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে' কাব্যগ্রন্থে কবি শঙ্খ ঘোষের

লেখা 'আগুনের ফলা' কবিতায় দেখি কী অপূর্ব কৌশলে কবি ধর্মান্ধতার চিত্র এঁকেছেন—

'পুরুত ঠাকুর সামনে এসে শান্তিজল ছিটিয়ে দিতে গেলে
তোমার গায়ে লেগে তার সবটাই হয়ে ওঠে
আগুনের ফলা।'
কে তোমাকে বাঁচাবে বল তো?" (সিগনেট প্রেস/২০১২/পৃঃ৩১)

—এমনভাবেই তো সচেতন করা কবির কাজ। তা না করে কেউ যদি ধর্মান্ধ মানুষকে ঘৃণা করে তাহলে তো সে আরও দূরে সরে যাবে। ভালোবাসা দিয়ে। শিক্ষা দিয়ে, জ্ঞানের আলো দিয়ে ধর্মান্ধকে মানব সভ্যতার উপযোগী করে তুলতে হয়। তাই তো কবি শঙ্খ ঘোষ এত প্রিয় কবি, মানুষের পথ প্রদর্শক, শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর আলোতে আজও আলোকিত হয় বাংলাদেশ, তাঁর শঙ্খনাদে মঙ্গলারতি চলে আজও।

কবি সুবোধ সরকারের কবিতায়ও দেখি ধর্মরূপী সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিতকরণ। তাঁরা দর্শনে মানুষ দেখতে পায় কে বা কারা বাবরি মসজিদ' ধ্বংস করার কথা বলেছে, কিংবা ভেঙেছে বুদ্ধমূর্তি। এখানে কবির বক্তব্যও সুস্পষ্ট—মানুষ চিনে নিতে পারে ঘাতককে—যে 'তিন হাজার' বছর ধরে মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত, যাকে ইউনেস্কো' 'একটা চুলও ছিঁড়তে পারেনি।'—

"সেই লোকটা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে অযোধ্যা হয়ে
হাঁটতে হাঁটতে আফগানিস্তান পৌঁছল একদিন
একশো পঁচাত্তর ফুট বুদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা
ডিনামাইটের তার ঠিক করছে.....
.....
পৃথিবীর যেখানে যেখানে করেছে
সেখানে সেখানে জ্বলে উঠেছে শস্য সবজি সংসার।"

(শ্রেষ্ঠ কবিতা/ চতুর্থ সংস্করণ ২০০৯/ পৃঃ ১৮১)

আট দশকের কবি আলোক বিশ্বাস মাত্র পাঁচটি পংক্তিতে অণু কবিতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপূর্ব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

"ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে ছিলাম
আমার রক্ত চলে গেল বৌদ্ধ জাতকের জীবনে। বৌদ্ধজাতকের রক্ত চলে গেল জাহানারা বা আলাউদ্দীনের প্রবাহে। আলাউদ্দিন রক্ত দিল। আলাউদ্দিনের রক্ত দেওয়া হল ক্রিশ্চিয়ান বালিকাকে
হে বৃক্ষ প্রয়োজনে আমাকে রক্ত দিও।"

(কবিতা ক্যাম্পাস/৮৭ সংখ্যা ২০১৬/পৃঃ ২৮৫)

সত্যিই তো মানুষ যখন বিপন্ন, বাঁচাতে রক্ত দিতে হয়—তখন হাসপাতাল থেকে

যে রক্ত দেওয়া হয় তাতে কোন ধর্ম নির্দিষ্ট থাকে না। অথচ আমরা ধর্ম নামক অবাঞ্ছিত বিষয়কে নিয়ে মৌলবাদীদের কথায় হানাহানিতে লিপ্ত হই। জীবনের প্রয়োজনে রক্ত হয়ে যায় রক্ত—মানুষ। সম্প্রীতির অনন্য কাব্যসুষমা।

নয়ের দশকের কবি মারুত কাশ্যপ অত্যন্ত বেদনাহত; এ দুর্ভাগা দেশের সাম্প্রদায়িক হিংসার পাশবিক পীড়নে। সারা দেশ গুজরাট থেকে কাশ্মীর, অযোধ্যা থেকে এই সংস্কৃতির বঙ্গ—সাম্প্রদায়িকতার আগুনে পুড়ছে। কবির প্রশ্ন ভগবান কিংবা মেহেরবানের কাছে—এই যে পশুদের জন্ম দিলেন, কিন্তু কেন মানবপ্রেম দেননি?—

"জন্ম ওদের কে দিল? কে? কে হুলোরাজ ভগবান?
দিলটা দিল, প্রেম দিল না, কিপটে মেহেরবান!"

(এক বাংলার গান/ নাটমন্দির, কথা কও, ডাক্তারডাঙ্গা, পুরুলিয়া/২০০৫/পৃঃ ৩০)

বাংলা কবিতার এই দীর্ঘ রাজপথে, বারবার কবিরা চেয়েছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রচনা করতে, কখনোই কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে অন্য সম্প্রদায়কে প্রশ্রয় দেননি। কেননা কবি প্রজাপতি ব্রহ্মা। সকল সৃষ্টির আলো রাত্রির অবসান ঘটায়—রাতের আঁধারে অসিচালনা করেন না। কবি পথ-প্রদর্শক—মানুষের জয়গান তাঁর লক্ষ কোনো ধর্মের নিশানকে কলঙ্কিত করেননা।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে একালের আর এক তরুণ কবি যিনি 'আনন্দ', 'কৃত্তিবাস' পুরস্কারে সম্মানিত—শ্রীজাত সেই ফেসবুকে 'অভিশাপ' শিরোনামে যে কবিতা প্রকাশ করলেন—তা সকল শান্তিপ্রিয় ধর্মীয় মানুষকেও আহত করেছে, এমন কি পুরাণে যে ত্রিশূল প্রতীকী ব্যঞ্জনয় অন্যায়কে বিদ্ধ করে, অশুভকে বিনাস করে—সেই 'ত্রিশূলে' কণ্ডোম পরিয়ে এক শ্রেণীর মনে উল্লাসের রসদ দিলেন এবং অন্য শ্রেণীর মানুষকে আহত করলেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে এফ. আই. আর. হয়। কবি তো দেখলেন না—কাশ্মীরে প্রতি পলে পলে রক্তাক্ত হয় মানুষ—কখনো নিরাপত্তাকর্মীর গুলিতে, কখনো বা জঙ্গি হানায়, মুম্বইতে বিস্ফোরণে এক নির্দিষ্ট জঙ্গি দলের তাণ্ডব চলল, পাঞ্জাবের দীনানগরেও একই ঘটনা ঘটে, হায়দ্রাবাদের মসজিদ হল রক্তাক্ত, ছত্তিসগড়ের সুকনা, ওড়িস্যার মালকনগিরিতে নিহত হয়েছে কত ভারতীয় নাগরিক কর্মচারী—অথচ কবি নীরব থেকেছেন।

'অভিশাপ' কবিতায় শ্রীজাত—

সময়ে ওষুধ, নইলে বেড়ে যায় সবরকম রোগই
ভিখ পেতে পেতে তুমি রাজা হয়ে ওঠো, গেঁয়োযোগী।
উঠেই নির্দেশ দাও, ধর্মের তলব দিকে দিকে
মৃগয়ায় খুঁজে ফেরো অন্য কোনও ধর্মের নারীকে।
যে হরিণ মৃত, তারও মাংসে তুমি চাও অধিকার

এমন রাজত্বে মৃত্যু সহজে তো হবে না তোমার।
বাতাসে হাপর নামে, দেশ জুড়ে অধর্মের ছাই.....
প্রতি নির্বাচনে আমরা শতাব্দী পিছনে ফিরে যাই।
যেখানে পুরুষধর্ম ধর্ম-পুরুষের অন্য নাম
আর আমি নারীর মৃত্যু পার করেও শিকার হলাম।
আমাকে ধর্ষণ করবে যদ্দিন কবর থেকে তুলে—
কণ্ডোম পরানো থাকবে, তোমার ওই ধর্মের ত্রিশূলে!" (সৌজন্য/ফেসবুক)

এখানে শ্রীজাত 'নারী', যাকে মৃত্যুর পরও কবর থেকে তুলে ধর্মের ধ্বজাধারী 'গেঁয়ো যোগী' ধর্ষণ করছে, অথচ তার মতে এই যোগী 'ভিখ পেতে পেতে' রাজা হয়ে' উঠেছে। অর্থাৎ তথাকথিত যোগীকে যারা রাজা করেছেন গণতান্ত্রিক নিয়মে তারা 'শতাব্দীপিছনে' চলে গেছেন— নির্বাচনে এমন একজনকে বিপুল জনতা নির্বাচিত করেছেন যিনি 'মৃগয়ায় খুঁজে' ফেরে অন্য ধর্মের নারীকে। কবি হয়ে ওঠার স্বপ্নে বুঁদ শ্রীজাত কি বিপুল ভারতবাসীকে অপমান করেননি? তিনি কি সত্যি জানেন ঐ যোগী অন্য ধর্মের নারীকে ধর্ষণ করেছেন? তাহলে বর্তমান ভারতবর্ষে যারা ধর্ষণ করছে পুরুষ ধর্মে উত্তপ্ত হয়ে তারা সবাই দেশের যোগী? তার 'অভিশাপ' কি কখনো ঐ যোগীকে সত্যি অভিশপ্ত করতে পারবে? ত্রিশূলে কণ্ডোম পরিয়ে পুরাণ প্রতীককে কলঙ্কিত করে আসলে এক ধর্মকে কশাঘাত করে অন্য ধর্মান্ধকে উল্লসিত করলেন না কি? আসলে বাস্তব ঘটনা তখনই কাব্য হয়ে ওঠে, যখন এই কবিতা পাঠ করে পাঠক মনে অপূর্ব আনন্দ বোধকরে, রস আস্বাদন করে। তাই তো অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, "যে বাস্তব ঘটনা মনে সোজাসুজি **Sad thought** আনে, তা **Sweet** ও নয়, **song** ও নয়। কবি যখন কাব্যে **saddest thought**-এর কথা বলেন, তখনই তা **Sweetest Song** হয়।" (কাব্য জিজ্ঞাসা/পৃঃ ২৮)। 'অভিশাপ' পাঠ করলে 'অভিশাপ' বর্ষণ করে।

এবার দেখা যাক সম্প্রতি সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত 'অন্ধকার লেখাগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থের কিছু অংশ। (সেপ্টেম্বর, ২০১৫)। এই কাব্যগ্রন্থের ৫০টি কবিতার মূল সুর "পৃথিবীতে এ কেমন সময় এল যে,/ সকলে শরীর বলতে মৃতদেহ বোঝে"। সুতরাং এই অশুভ সময়ের জোয়ারে বিপরীত স্রোত তিনি খুঁজে চলেছেন এবং দৃঢ় প্রত্যয়ে আশ্বস্ত হচ্ছেন এই বলে—

'ফলন চিরকালীন। খরা মরসুমি।
আমার শান্তির চেয়ে বড় নও তুমি"

তিনি স্বপ্ন দ্যাখেন 'ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে ভাত'। এবং 'এই' অন্ধকার মুছে যাবে দ্রুত।'—এই অন্ধকারের কারণ খুঁজতে গিয়ে শ্রীজাত বলছে—

'হত্যাই হিংসার ধর্ম। একথা জেনেও
যে মৃতের ধর্ম খুজঁছে, মৌলবাদী সেও।'

—একথা যিনি লেখেন তিনিই কীভাবে বলেন, 'কণ্ডোম' পরানো থাকবে, তোমার ওই ধর্মের ত্রিশূলে!' অবাক হয়ে যাই কীভাবে তিনি বিভ্রান্ত হলেন চিত্রকল্প রচনা করতে গিয়ে। হয়তোবা চমক ছিল সরকারের দাক্ষিণ্য পাওয়ার জন্য। বর্তমান শাসক তো সত্যিই যেন 'ত্রিশূলে' অন্য কিছু পরাতে চান—মৌলবাদী একটি শক্তিকে দিনের পর দিন প্রশ্রয় দিচ্ছেন—শাসক যদি ধর্ম পালন করতে মাঠে নেমে পড়েন; রাজনীতির রঙে ধর্মের নিশান জুড়ে দেয়—ভয়ঙ্কর দিন অপেক্ষা করছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল উত্তর কিংবা উত্তর মধ্য ভারতে ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো—তাকে বাংলার মাটিতে এনে পোঁতা হচ্ছে—যে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুত্ব ছিল না—তাকে জাগ্রত করছে বর্তমান শাসক। কবি যদি সেই বিষবৃক্ষের মাটিতে সারযুক্ত জল ঢালেন সেই বিষবৃক্ষ তো সহজেই মহীরূহ ধারণ করবে। হে কবি তুমি যদি কবি হয়ে উঠতে চাও মারণ অস্ত্র হাতে নিও না, যে সত্যিটা তসলিমা নাসরিন বলতে গিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়েছে মৌলবাদী শাসকের চোখ রাঙানিতে। এতে তোমারও বিপদ ডেকে আনবে। তুমি লিখেছ—

"আজও কারা গোধরায় মৃতদেহ খোঁজে
অযোধ্যায় আজও কারা আগলায় মুষল
একদিন সূর্যাস্ত এত ধারালো ছিল যে
লাল হয়ে গেছিল স্বর্ণমন্দিরের জল।"

—এই পংক্তি কয়টির মধ্যে এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত অনেকটা স্পষ্ট হয়। কবির দৃষ্টিতে পক্ষপাতিত্ব বড় হয়ে ওঠে। যদিও এ কবিতারও মূল সুর সেই অশুভ সময়—একটু ব্যপ্তি এনে সমগ্র পৃথিবীর হিংসা ঠাঁই পেলে ভালো হত —মুম্বাই বিস্ফোরণে আজও কাঁদে স্বদেশ, পাঞ্জাবের দীনানগরের ঘটনায় আহত হয়েছিলেন হয়তো এ. পি. জে. আব্দুল কালাম—চলে গেলেন সেদিনই।' হায়দ্রাবাদের মসজিদের বিস্ফোরণে কত প্রাণ রক্তাক্ত, সংসদ কলঙ্কিত—প্রতিদিন কাশ্মীরের স্বর্গোদ্যান রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে—একটা সর্বজনীন চেতনা—যাতে হিংসা স্তিমিত হয়—তাকে রোধকরা কবির কাজ, হিংসাকে উল্লসিত করা নয়। এই একই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তো কেমন সুন্দর লিখেছ—

'দরগার জমিতে ফোটে মা কালীর জবা
মা মেরির উড়নি বাঁধা গাঁয়ের মসজিদে
এত দূর পৌঁছয়না মিছিল আর সভা
এখানে শাসন করে সোজাসাপটা খিদে।"

অথবা,

যে দেশে পেটেই জ্বলে অধিকাংশ চিতা,
সে-দেশে বিশ্রাম পণ্য। ধর্ম বিলাসিতা।'

অথবা,

আমাদের ধর্ম বাঁচা। কৃষক বা কবি
ফলনে চেনায় জাত। লাগে না পদবি।'

—এমনভাবে একটা কাব্যগ্রন্থে ৫০টি কবিতায় কবি অশুভ সময়ের মৃত্যুর মিছিলকে দেখেছেন, প্রতিটি কবিতা ১৪ লাইনে; কিন্তু সনেট নয়। তাতে কিছু যায় আসে না। কবির কাছে কোন মৌলবাদী ধর্মের ঠাঁই নেই। এখানে শ্রীজাত অনেকটা সফল। কিন্তু বাংলার কবিতার রাজপথে ফেসবুকে প্রকাশিত 'অভিশাপ' কবিতাটি যেন 'হিংসা আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে। ধর্মকে আহত করো না, ধর্মান্ধকে আঘাত করো, ধর্মবিলাসীকে জাগাও, ধর্ম ব্যবসায়ীকে হত্যা করো। ধর্ম তো অনুশীলন-শৃঙ্খলা-শান্তির আশ্রয়-রামকৃষ্ণের কথায় তার 'যত মত তত পথ'—সে পথ জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু ধর্মকে হাতিয়ার করে যারা অধর্ম করে—তাদের ধর্ম হল হিংসা, যার হনন প্রতি যুগের স্রষ্টারা কলমের অস্ত্রে করে থাকেন। কবির সৃষ্টির ফুল থেকে এই বিষাক্ত কীটের আশ্রয় করা ফুলকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। এ প্রজন্মের এই কবির কাছে অনেকের প্রত্যাশা আছে। সে প্রত্যাশা যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। বাংলা কবিতার রাজপথ, অপূর্ব সুন্দর—তার মর্যাদা-গরিমা অক্ষুণ্ণ থাক। এই কাব্যের ১৫ নং কবিতার মতো কবিতা যেন জন্ম না নেয়, 'অভিশাপ' যেন সেই সব মৌলবাদীকে দংশন করে। তুমি তো জান—'কোনওভাবে যদি তুমি সত্যি কথা বলো,/হিংসা ঠিকই বুঝে নেয় নিজের এলাকা।' তুমি তো শাসকের রূপ জানো—শাসক ধর্মপালনে উৎসাহ দেয়, তোষামোদ করে সিংহাসন রক্ষা করতে; কী সুন্দর শাসকের রূপ এঁকেছো—

"দুটি রুটি বেশি পাবে। পৈতে খোলো আগে।
মুকুব হয়ে যাবে সুদ। তসবি ছেড়ে এসো।
মিলবে না সুবিধে, যদি গীর্জা ভালো লাগে।
যেখানে যেমন পারে, শর্ত দেয় দেশও।"

ঠিক এমন ভাবেই চলছে সারা বিশ্বের শাসকের শাসন। এ পথ কবির নয়, কবি সবুজ স্বপ্নের দেশ রচনা করে। কবিকে 'হতাশাবিলাসী' হলে চলে না। তাহলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে—আদিমতা গ্রাস করবে। তুমি নিজেই লিখেছ—

"পুষেছি হৃদয়ে ওকে, হতাশাবিলাসী,
ওরই হাতে মরব জানি, তবু ভালবাসি।"

—কবির তো মৃত্যু হয় না। কবি জৈবিক কারণে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু প্রত্যেক

কবি তো ব্রহ্মা। তাই তো রবীন্দ্রনাথ 'সার্থক জনম' লিখেছেন, জীবনানন্দ লিখেছেন, 'তোমার বুকের থেকে একদিন বলে যাবে তোমার সন্তান, বাংলর বুক ছেড়ে বলে যাবে?.....তারই নীচে শুয়ে থাকি যেন অর্ধনারীশ্বর।' তুমি এই অল্প সময়ে বহু কবিতা লিখেছ, তবুও মনে হয় কবি হয়ে উঠতে পারনি। কবিতার আঙ্গিকে ছন্দে-অলংকারে চিত্রকল্পে কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় না—তাঁকে দার্শনিক হয়ে উঠতে হয়। হয়ত বাংলা কবিতার রাজপথে 'অভিশাপ' সেদিক থেকে 'অভিশাপ' হয়ে উঠছে। জীবনের স্বপ্নকে লালন কর, হতাশাকে বিসর্জন দাও। মৃত্যু ছিল, থাকবে—সে তো জীবনের ধর্ম, ইতিহাস তো কত মৃত্যুর মিছিল দেখেছে— ঔরংজেব তো তার রাজত্বকালে কত খুন করেছে তার হিসাব মেলানো ভার। প্রতিযুগে এই হত্যালীলা চলছে। প্রতি যুগে কবি-শিল্পীরা তাঁদের চেতনার রঙে লালকে করেন সবুজ। ইতিহাস এভাবে মানবতাকে রক্তাক্ত করে, আর মহাপুরুষের আবির্ভাবে মানবতার জয় হয়।

অবাক লাগে এই বাংলার প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকা সম্পাদকীয়র পাশে এমন সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধ ছাপেন—'সবরমতীর চরকায় দেশজোড়া মুসমান নিধন ঢাকা পড়বে না। আমার নামে হত্যা নয়?'—অমিতাভ গুপ্ত (আনন্দবাজার পত্রিকা/০২/০৭/২০১৭/পৃঃ ৪)

লেখক এবং পত্রিকা সম্পাদককে আমার প্রশ্ন আমাদের দেশে কি কেবল 'মুসলমান-নিধন' হয়? জৈন, খ্রীষ্টান, হিন্দু—ধর্মের মানুষের নিধন হচ্ছে না?—এ ধরনের লেখার শীর্ষনাম কি সাম্প্রদায়িক নয়?

লেখক কিংবা সম্পাদকের কাছে অগণিত মানুষের হত্যালীলার পরিসংখ্যান নেই?—কত বিস্ফোরণ যে আই এস আই, কিংবা বহু মুসলিম জঙ্গিসংগঠন, মাওবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় কত বলবো—সকলেই তো হন্তারক। এমন প্রবন্ধ কিংবা 'অভিশাপ'-র মতো কবিতা হিংস্র জঙ্গি সংগঠনকে প্রশ্রয় দেয়। শাসক তার প্রয়োজনে রাজনৈতিক পতাকার রঙে সংঘবদ্ধ ধর্মকে তোষণ করে। কিন্তু ব্যক্তি প্রতিভাধরদের কোন স্বার্থ কাজ করছে—চমক নাকি অন্য কিছু—দয়া করে প্রকাশের রীতিটা বদলান, আমরা মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে পারি, নইলে হিংসা-ধর্মে ধ্বংস হতে পারি। উপকার করতে না পারি অপকার করব না।

কবি নীরেন চক্রবর্তীর কথায় "কবিতা মানে কি এই কুয়াশার ভিতরে একবার/বাঘ সিংহ হায়েনা ইত্যাদি পশুর দাঁতের শক্তি বুঝে নেওয়া নয়?/স্পষ্ট কথাটাকে অন্তত একবার স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ভাল।"—যেন কোনও পশু বাদ না যায়; সব সম্প্রদায়ের পশুদের চিহ্নিত করে অনন্ত কুয়াশাকে ছিন্ন করে নতুন যুগ রচনা করুক কবি-শিল্পী। বর্তমানে তো রাজনৈতিক হত্যাই সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। হে কবি তোমারই অপেক্ষায়—

চারিদিকে হৈ হট্টগোল, গেল গেল রব, কোথা থেকে কান্নার রোল মৃদু হতে হতে

স্পষ্ট হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে আচমকা মেঘ ভাঙার শব্দ, হড়কা বান, বিস্ফোরণের ঘন ঘন আওয়াজ-শোল-মর্টার হুড়মুড় করে শুয়ে পড়ে বহুতল, ভেসে যায় মানব উল্লসিত জানোয়ার—রক্তাক্ত সবুজ বাগান। কী চায় খোকাবাবু, কবি হতে? দু' একটা বাহবা শিরোপা তো পেয়েছে, তবু পাড় ভাঙার শব্দ বুঝতে পারেনি। খোকাবাবুকে আর পাওয়া যাবে? অদ্ভুত এক পরিবেশ, পৃথিবীর সাথে চাঁদের এতো কী তীব্র সংঘাত! পৃথিবীর আলো তো নিবু নিবু, কী করবে চাঁদ? আলালের ঘরের দুলালেরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে। কবিও দর্শনের মাথা খেয়ে ফেলেছে। থুড়ি যে খোকাবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে নাকি নেতার ক্যাঁতায় আগুন দিতে গিয়ে নিজে ঘরে আগুন দিয়েছে। না একথা কি সত্যি, হতে পারে? বিশ্বাস করি না, কবি হারিয়ে যান না, হেরে যান না। কবি অমর প্রজাপতি। হে দুর্জন কান খুলে শুনে রাখ, 'অভিশাপ' যে লেখে তিনি আর যাই হোন কবি হতে পারেননি, তাঁর চোখ ক্ষণিকের জন্য হয়েছিল ঝাপসা। নজরুলের উত্তরসূরী হতে গেলে বিপ্লবী হতে হবে। আসলে পাড় ভাঙার জলে ভেসে গিয়েছে। ফিরে আসবে আবার ততক্ষণ আপনারা অপেক্ষা করুণ।

—বাংলা কবিতার রাজপথ ঐশ্বর্যে ভরা, একের পর এক কবি এসেছেন আর নির্মাণ করেছেন কবিতার শরীর। বিষয়-শৈলী নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই দীর্ঘ সাম্রাজ্যে রাজসভাকবিদের ঠাঁই কম, চিরকালের স্বর্ণ সিংহাসনে কবিই হয়েছেন রাজা। যিনি মানুষের হৃদয়ে নিজস্ব চেতনায় মানুষের চৈতন্যকে জাগরিত করেছেন। একালেও পাঠকের হৃদয়ে সেই সব কবি রাজার ভূষণে পূজিত হন। এই রাজপথে আরও উজ্জ্বল প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটবে, বিপথগামী আলোকিত হবে। যখন কাব্য পাঠকের মনে হবে, "কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোনো ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছদে পরিছিন্ন থাকে না।" (অতুল গুপ্ত)

■ ড. জয়গোপাল মণ্ডল—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

স্বরাজ কুমার দাশ

‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা

রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেই আধুনিক বাংলা কবিতার যাত্রা-সূচনা। বাংলা কবিতার আধুনিকতার একটা প্রধান লক্ষণই ছিল রবীন্দ্র-বিরোধিতা। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তি প্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।”[১] রবীন্দ্রনাথ নিজে আধুনিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, নদীতে যেমন বাঁক পরিবর্তন আসে, তেমনি সাহিত্যের ধারাতেও বাঁক বদল ঘটে—“সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ণ। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে।”[২] রবীন্দ্র-সমকালে সেই রবীন্দ্র-বিরোধিতাই সেই নতুন বাঁক বদলের মর্জ্জির চেহারা নিল, যার হাত ধরে বাংলা কবিতায় এল আধুনিকতা। রবীন্দ্র-সমকালে বিশেষত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের বেশ কিছু কবি রবীন্দ্র-ভাবাদর্শের বৃত্তে ঘুরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মানকুমারী বসু, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। এঁরা নতুন মর্জ্জির কবিতা না লেখায় বাংলা কবিতায় আধুনিকতা এঁদের হাত ধরে আসেনি। কিন্তু এঁদেরই সমকালে চার-পাঁচজন কবির কলমে প্রতিভাত হল নতুন মর্জ্জির কবিতা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম, প্রমথ চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের কথা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাবগভীরতা, চিত্ররূপময়তা, গীতিধর্মিতা, রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, অধ্যাত্মচেতনা, আস্তিক্যবোধের জায়গায় এঁরা বাংলা কবিতায় আমদানি করলেন নতুন ভাবাদর্শকে। যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় আনলেন এক নতুন ঘরানার দুঃখবাদকে। মোহিতলাল আনলেন দেহবাদ। নজরুল আনলেন বিদ্রোহের দাবানল। কৃত্রিম ভাবালুতা, গতানুগতিক প্রকৃতি বর্ণনার বদলে প্রমথ চৌধুরী বাংলা কবিতায় আনলেন শব্দ চয়নে নিপুণতা, ভাষা ও ভঙ্গির কঠিন দীপ্তি, মিতবাক পদবিন্যাস ও বুদ্ধিদীপ্ত তীব্রতা। দু’য়ের দশকে ‘কল্লোল’, ‘কালি কলম’, ‘প্রগতি’ পত্রিকার লেখকগণ রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর ‘কল্লোল যুগ’ গ্রন্থে বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল ‘কল্লোল’। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লা কুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।” ‘কল্লোল’-এর তরুণ কবিরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে অভিযোগ করেন যে রবীন্দ্রনাথ বড় বেশি রোমান্টিক, তিনি বিগত দিনের শিল্পী।

তিনের দশকেও রবীন্দ্র-বিরোধিতা জারি রইল। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্রেরা রবীন্দ্র-ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে স্বরকে ব্যক্ত করলেন বাংলা কবিতায়। খণ্ডের সাথে অখণ্ডের, সীমার সাথে অসীমের যে আধ্যাত্মিক মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তা থেকে সরে এলেন এঁরা। দেহাতীত ভাবনার বদলে দেহের রক্ত-মাংসীয় অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিলেন এঁরা। যদিও বুদ্ধদেব বসুর ‘মর্ম্মবাণী’ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভববেদ্য। কিন্তু এরপরেই বুদ্ধদবে বুঝলেন, “গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মক রূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।”(রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক।’) তাই প্রেমের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়, অমূর্তভাবনার বদলে আনলেন প্রবৃত্তির প্রকট রূপ ঃ

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমনী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নীতি;
— (‘বন্দীর বন্দনা’/‘বন্দীর বন্দনা”)

রবীন্দ্রনাথের মত রোমান্টিক কবির সৌন্দর্য-পিয়াসী মনকে বিকশিত করলেন না জীবনানন্দ দাশও। বাস্তব জীবনের অসম্পূর্ণতা ও কুশ্রীতার প্রতিফলন ঘটল তাঁর কবিতায়ঃ

‘নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
সে সব হৃদয় ফলিয়াছে
সেই সব’ (বোধ’/“ধূসর পাণ্ডুলিপি”)

‘হেমন্ত’ জীবনানন্দের রিক্ত, নিঃস্ব, অনুর্বর ও ক্ষয়িষ্ণু যুগের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ প্রেমে বিচ্ছেদের মধ্যে ভাব-সম্মিলন দেখেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ মনে করেন বিচ্ছেদ মানুষের দেহ-মন-আত্মাকে বিধ্বস্ত করে তোলে। বাস্তব জীবনের রণ রক্তে এই কবি বড় বেশি ক্লান্ত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ক্ষণবাদ, নেতিবাদও রবীন্দ্র-দর্শনের বিপরীত আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় তাই বারংবার মেলে ‘মরুভূমি’, ‘নরক’, ‘শব’, ‘পিশাচ’ ইত্যাদি শব্দগুলি। প্রেমের স্থায়িত্বে তাঁরও বিশ্বাস নেই। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতার দর্শনের বদলে সুধীন্দ্রনাথ কেবলই নেতি-কে লালন করলেন তাঁর কাব্য-জীবনে। বিষ্ণু দে আবার সুধীন্দ্রনাথের মতো কেবলই নেতিবাদকে লালন করলেন না। বরং তিনি চারপাশের ক্লান্তি জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের মধ্য থেকে বিশ্বাসের জগতটিকে খুঁজে নিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের অস্তিবাদ থেকে বিষ্ণু দে-র অস্তিবাদের পার্থক্য আছে। চমৎকার অভিমত জ্ঞাপন করেছেন সমালোচক ঃ

“হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও চেয়েছিলেন ‘আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দ নিষ্যন্দন

আকাশ', কিন্তু পারিপার্শ্বিক তার বিরোধী ব'লে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শে, তাঁকে ছেদ টানতে হ'ল। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর 'ছেদ' কবিতায় তিনি বললেন ঃ

'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।'

("ছেদ', 'উর্বশী ও আর্টেমিস')

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার সিদ্ধবস্তুকে টুকরো ক'রে ভেঙেও তিনি রবীন্দ্রনাথের' আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করলেন।"[৩]

বিষ্ণু দে-র কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির বহু ব্যবহার দেখা যায় "কখনো রোম্যান্টিক ঐতিহ্যকে ভাঙবার জন্য, আবার কখনোবা নতুন এক ঐতিহ্যকে গ'ড়ে তোলবার জন্য।"[৪] তিনের দশকে রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক চেতনার উত্তরাধিকারী কবি অমিয় চক্রবর্তী। তবে দু'জনের অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি দর্শন খুঁজে নেওয়ার পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবজগতে, ঔপনিষদিক চিন্তনে অখণ্ড, ভগ্ন ও ক্ষণিকতার মধ্যে ঐক্য ও পূর্ণতাকে খুঁজে নিয়েছেন। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী আস্তিক্যবোধের ভিত্তিমূলে আছে বিজ্ঞান চেতনা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ। দৃষ্টির দর্শনে অমিয় চক্রবর্তী অখণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে খুঁজে নিয়েছেন। বিজ্ঞানে, কল্যাণে ও আন্তর্জাতিক মননের সংযোগে অমিয় চক্রবর্তী এক নতুন সঙ্গতিবোধের সেতু নির্মাণ করলেন। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল রবীন্দ্র-বিরোধিতার যে সূচনা দু'য়ের দশকে ঘটেছিল, তা তিনের দশকেও জারি রইল।

চারের দশকে এসে রবীন্দ্র-বিরোধিতার আর তেমন প্রয়োজন থাকল না। বিংশ শতাব্দীর দুই ও তিন দশক জুড়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার নতুন পথ নির্মিত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার দুঃসাহসিকতা এই নতুন পথের স্রষ্টা। চারের দশকের পর থেকে তাই প্রয়োজন হয়ে উঠল এই নতুন পথে পদচারণা রবীন্দ্র-দর্শনকে সঙ্গে করে নিয়ে। —তবে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার বা অন্ধ অনুকরণ করে নয়। ববীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা যায় নি এই কারণে যে, রবীন্দ্র-ভাবাদর্শ মজ্জায় মিশে গেছে। তাকে অস্বীকার করার উপায় কী? নতুন পথের স্বনির্ভর দর্শনের চারের বা তার পরবর্তী দশকের কবিরা যখনই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছেন তখনই তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্র-দর্শনের বৃহৎ বটবৃক্ষের তলে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রিক কবিতাগুলির দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোচ্য এই প্রবন্ধে তিন কবির 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'—এই একই নামের তিনটি কবিতার নির্বাচন করেছি। কবিতা তিনটি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রতি কী মনোভাব জ্ঞাপন করছে। শুধু রবীন্দ্রোত্তর কবিরাই নন, রবীন্দ্র-সমকালে রবীন্দ্র-ভাবনার বিরোধী সুর যাঁরা তুলেছিলেন তাঁরাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করলেন। 'কল্লোল'-এর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় লিখলেন ঃ

'তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত'
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে;
'তুমি ছাড়া আর কা'র
এ উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।'

প্রমথ চৌধুরী বললেন ঃ

"আমার মহা সৌভাগ্য এই যে, আমার যৌবনের প্রারম্ভে আমি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাভ করি এবং তাঁর মানসিক আবহাওয়াতেই মানুষ হই। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই আমার প্রতি অনুকূল হন, আর এই দীর্ঘ জীবনে আমি তাঁর অনুগ্রহে কোনদিন বঞ্চিত হইনি। আমার অন্তরে একটি প্রচ্ছন্ন অহং ছিল এবং আছে, যা সহজে কারও বাগ মানে না। তিনি যে একজন লোকোত্তর পুরুষ, আজ তা সকলে স্বীকার করবেন।"[৫]

রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারে যে দ্বিধা থাকতে পারে না, তা অতুলচন্দ্র গুপ্তও বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, "তাঁর কাব্যে আমরা সেই রস পেলাম মন যাকে গ্রহণ করলো দ্বিধাহীন আনন্দে।"[৬] কবি অমিয় চক্রবর্তীও স্বীকার করেছেন, "বাস্তব কাকে বলে জানি না, সত্যকে দেখবার তেজ রবীন্দ্রনাথের রচনায় বহুধাশক্তির যোগে আজীবন প্রকাশিত হয়েছে।"[৭]

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। কবিতাটির প্রেক্ষাপটে রয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। কবি স্বীকার করেছেন তাঁর আপন প্রতিভার ঋণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই নেওয়া। আমরা সকলেই জানি সুকান্ত দুর্ভিক্ষের কবি। তাঁর কবিতায় ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না, অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, সাইরেন ধ্বনি, পরাধীনতা, রক্তপাত ইত্যাদি অনুভূতিগুলি ভিড় করে আসে। কিন্তু কবি এ-সবের মধ্যেও রবীন্দ্র-চেতনার বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ করেন, বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেন। এখানেই আছে সুকান্তের রবীন্দ্র-দর্শনে ঋদ্ধ হওয়ার স্বীকারোক্তি। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি সেই স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা। স্বীকারোক্তি ব্যক্ত হয়েছে কবিতাটির একেবারে প্রথম চরণ থেকেই ঃ

'এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,'

'এখনো' অব্যয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। **The age of Rabindranath is over**– এই দর্শনে বিশ্বাসী আধুনিক কবিদের পথে পা মেলালেও সুকান্ত রবীন্দ্রদর্শনেই বিশ্বাসী। 'এখনো' অব্যয়ে এই কথাটিই ব্যক্ত করেছেন সুকান্ত। তাছাড়া সুকান্ত যখন কবিতাটি লিখছেন তখন রবীন্দ্রনাথ আর সশরীরে ইহজগতে নেই। কিন্তু না থাকলেও তিনি রেখে

গেছেন বিশ্বসংসারে 'সোনার ধান'—গভীর মানবতাবাদী জীবনবোধ। তাকে অস্বীকার করবার কোনো উপায় আছে কি? তাঁর দেহাবসান হলেও তাঁর আদর্শের মৃত্যু হয়নি —হওয়ারও নয়। সেই আদর্শ কবির 'প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা' ছড়িয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের গান সুকান্তের সত্তাকে আলোকিত করে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে মগ্ন হয়ে কবি ক্ষুধার যন্ত্রণাকেও ভুলে যান। রবীন্দ্রনাথের মতো সুকান্তও যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিরবেশে উপলব্ধি করেন "নাগিনিরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস"। কিন্তু তার পরেও সুকান্তের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের "শান্তির ললিত বাণী" ব্যর্থ হওয়ার জন্য নয়। বরং তা দুরাবস্থার এই সময়-দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার উদ্বোধনী মন্ত্র। দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর ও পরাধীনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুকান্ত তাই ঘোষণা করলেন ঃ

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'।
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার এত নিবিড় স্বীকারোক্তি খুব কম কবিতাতেই মেলে।

বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটির রচনাকাল ৮ মে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে (২৫বৈশাখ ১৩৪৯)। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রথম জন্মদিনে লেখা কবিতা এটি। কবিতাটির মধ্যে বুদ্ধদেব বসু অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরূপ শ্রদ্ধার্ঘ্য ব্যক্ত করেছেন। কবিতা ভবন থেকে বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করেছিলেন 'এক পয়সায় একটি' কবিতার সিরিজ। সেই সিরিজ-এর বাইশে শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চারটি কবিতা রচিত হয়েছিল। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি তারই একটি অন্যতম কবিতা। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঐশী জগৎকে অতিক্রম করে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার প্রয়াসে 'কল্লোল'-গোষ্ঠী পরবর্তী তিনের দশকে যিনি নেতৃত্বের অগ্রভাগে ছিলেন তিনি হলেন বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বসু অন্ধ-রবীন্দ্রভক্তিতে গদগদ হয়ে স্তাবকতা করেননি। বুদ্ধদেব বসু মনে করলেন, যে যুগ রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছে, তা বহুদিন আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। আসলে বুদ্ধদেব বসুর এমন মতামত পোষণের কারণ নতুন পথ খনন। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার জন্য নয়। বুদ্ধদেবের চেতনা জুড়ে ছিল রবীন্দ্রনাথই। বিরোধিতার মধ্য দিয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন বুদ্ধদেব বসু। বারবার পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। আশ্বিন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশিত হল। 'কবিতা' পত্রিকা ও বুদ্ধদেব বসুর প্রয়াসকে শুভেচ্ছা জানালেন রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে। চিঠিটি প্রকাশ পায় 'কবিতা'-র ২য় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। ঃ

" তোমাদের 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক

রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারির দল-বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকের সঙ্গে এরা নতুন পরিচয় স্থাপন করেছে।"[৮]

অগ্রজ কবির কাছ থেকে পাওয়া এত বড় compliment বুদ্ধদেব বসু ও 'কবিতা' পত্রিকার কাছে ছিল সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বুদ্ধদেব বসু বলেছেনঃ

"রবীন্দ্রনাথ যে সেই বিরল মানবদের একজন, মহাকবি আখ্যা যাঁদের সম্বন্ধে সত্যই প্রযোজ্য, আজ আর এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই। বস্তুত গত কুড়ি বছর ধরেই এ সত্যটি বাঙালি সমাজে প্রতিভাত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মহিমার কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি মহৎ তাঁর সমগ্রতায়।"[৯]

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাব পোষণ করলেও সঠিকই বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথই চরম দুর্দিনের পরম আশ্রয়। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তাই লিখলেন ঃ

'তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রমিত মহামারি মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা।'

প্রসঙ্গত অবশ্যই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন"। আজ ১৯৪২-এর প্রেক্ষাপটে এসে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা চলছে তখন রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি ফলপ্রসু হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ও ক্ষমতার লোভে সভ্যতা ক্রমশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রাণলক্ষ্মী আজ নির্বাসিতা। এমত অবস্থায় বুদ্ধদেব বসু আশ্রয় নিয়েছেন সত্য, শিব, সুন্দর ও মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়াবহতার কালে 'প্রাণরুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ' হয়ে গেছে। চারিদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের 'লুব্ধতার লালা' ঝরছে। এমত অবস্থায় বুদ্ধদেব বসু স্বীকার করছেন ঃ

'এত দুঃখ, এ দুঃসহ ঘৃণা—
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না
লিপ্ত হ'ত রক্তে মোর, বিদ্ধ হ'ত গূঢ় মর্মমূলে
তোমার অক্ষয়মন্ত্র। অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই ভয় হবে জানি।'

রবীন্দ্রনাথের অক্ষয়মন্ত্রই বুদ্ধদেব বসুকে দিয়েছে পরম অশ্রয়, নিশ্চয়তা ও দুঃসময় অতিক্রম করার এক প্রবল দুঃসাহস।

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' শিরোনামাঙ্কিত আরেকখানি কবিতাতেও কবির রবীন্দ্র-আশ্রয় ও স্বীকারোক্তি বর্ণময় হয়ে উঠেছে। কবিতাটি শামসুর রাহমানের। শামসুরের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি 'রৌদ্র করোটিতে' (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। কবিতাটির

বিশেষত্ব এই যে কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার গতিমুখ। কবি বলেছেন ঃ

লোকে বলে বাংলাদেশে কবিতার আকাল এখন,
বিশেষতঃ তোমার মৃত্যুর পরে কাব্যের প্রতিমা
ললিতলাবণ্যচ্ছটা হারিয়ে ফেলেছে—পরিবর্তে রুক্ষতার
কাঠিন্য লেগেছে শুধু, আর চারদিকে পোড়োজমি,
করোটিতে জ্যোৎস্না দেখে ক্ষুধার্ত ইঁদুর কী আশ্বাসে
চম্‌কে ওঠে কিছুতে বোঝে না ফণিমনসার ফুল।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার সত্যিই আকাল; বিশেষত শামসুর যে সময়কালে এই কবিতাটি লিখছেন সেই সময়কালটি। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে—ভাষার ঐক্য ভেঙে গেছে। এপার বাংলায় 'কৃত্তিবাস'-এর কবিতা-লিখনে স্বেচ্ছাচারিতা, হাংরি-র বিকৃত জীবনের ভাষাকে রূপ দেওয়া, ওপার বাংলায় উর্দুর ভাষার আগ্রাসন থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য শহীদ হওয়ার এক ভয়ানক কাল তখন। এই সঙ্কটকালে শামসুর আশ্রয় নিতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথেই। কবির শাশ্বত আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ। অন্য একটি কবিতায় বলছেন, "বাংলার ঘরে ঘরে নিত্যদিন তাঁর আসা-যাওয়া, তিনি সর্বদা আছেন/আমাদের চেতনা প্রবাহে মিশে রঙে-রঙে আর/গানে-গানে, কবিতায়।"[১০] আর 'রবীন্দ্রের প্রতি' কবিতায় বলছেন ঃ

'আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা
রাত্রিকে রেখেছো ভ'রে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী
কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন
পেয়েছি তোমার কাছে।'

শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ শামসুরের অন্তরে জুগিয়েছেন বেঁচে থাকবার সাহসিকতা ঃ

'প্রতীকের মুক্ত পথে হেঁটে চলে গেছি আনন্দের
মাঠে আর ছড়িয়ে পড়েছি বিশ্বে তোমারই সাহসে।'

রবীন্দ্রনাথের গানে এমনই সুধারস রয়েছে যে, প্রবল নাস্তিকের হৃদয়ের আস্তিক্যবোধ জাগিয়ে তোলে। শামসুর সেই রবীন্দ্র-সুধা পানে অমর হতে চান, হতে চান বিশাল সমুদ্রের মতো। সেই হতে চাওয়ার প্রচেষ্টায় সামিল হয়ে শামসুরের হৃদয় ডানা মেলে উড়তে চায়। কবির বিশ্বাস এই কর্দমাক্ত পঙ্কিল জীবনে রবীন্দ্র-গীত সুধারস পানে "....কোকিলের/ভূমিকায় সফলতা এলে কিছু সার্থক জনম"। রবীন্দ্রালোকে কবি এইভাবে সালোকসংশ্লেষে সজীব জীবন অতিবাহিত করতে চান। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ওপার বাংলার প্রধান কবি শামসুরের জীবনে ও মননে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি একান্ত আপন ও আশ্রয়, তা তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যায়।

কেবল বিশ শতক নয়; সুকান্ত ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, শামসুর রাহমানের মতো আজও সমগ্র বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি রবীন্দ্র-দর্পণের ছায়ায় মূরতি গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই যেন রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কবিতার পালাবদলের স্বীকৃতি এবং পরম্পরা।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। আবু সয়ীদ অইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩১
৩। দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২১৮
৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৭
৫। মীনাক্ষী দত্ত (সংকলক), বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা সংকলন ১, প্রতিভাস, সংস্করণ ঃ এপ্রিল ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৫৬
৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬২
৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭২
৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩
৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৫
১০। শামসুর রাহমান, অথচ রবীন্দ্রনাথ, কবিতা সমগ্র (২য় খণ্ড), অনন্য, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৪৯

■ ড. স্বরাজ কুমার দাশ—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

মলয় মণ্ডল

সবুজ আলো জেগে থাকে, কবিতার পাশে

কবিদের নিয়ে জোকস করলে বোধ হয় যারা কবিতালেখার সঙ্গে যুক্ত তারা সত্যিই আহত হন। একটি জোকস তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। একবার রাস্তা দিয়ে দু'জন মানুষ ছুটে যাচ্ছে। তাদের একজন আর একজনকে ধরার চেষ্টা করছে। দু'জনেরই হাতে একটি ক'রে খাতা। রাস্তার সাধারণ পথচারীরা ভেবেছে চোর বা ছিনতাইবাজ হবে হয়তো। ফলে সবাই মিলে সামনের লোকটিকে পাকড়িয়ে আচ্ছা করে দিয়েছে উত্তমমধ্যম। দ্বিতীয় লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে অকুস্থলে পৌঁছতে সবাই গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'কি চুরি করেছে দাদা?' দ্বিতীয় লোকটি লজ্জায় জিভ কেটে বলে—'চুরি কেন করবে? ও আসলে ওর কবিতা শুনিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল আমারটা শুনতে চাইছিল না, তাই।'

জোক্সটার মধ্যে রসার্থ যাই থাক নিহিতার্থ হল এই যে কবিরা সব সময় কবিতা শোনাতেই ভালোবাসে। শ্রোতারা শুনুক কিংবা না শুনুক। ভালো লাগুক বা না লাগুক, কবিতা শুনতেই হবে। সত্যি কী কবিতা এত হ্যাংলা? সিনেমা, নাটক, যাত্রা টি. ভি. সিরিয়াল এসবের মধ্যে কখনো সখনো কবি চরিত্রকে আঁকা হয় মোটা দাগে ক্যারিকেচার করে। তাদের চলন বলন সাজ পোশাক সবটাই যেন ভাঁড়ামো, কিংবা সাধারণের থেকে আলাদা। তবে উপন্যাসের আখ্যানে কবিদের অতখানি ভাঁড় হিসাবে দেখানো হয় নি। বরং কবিরা সেখানে অনেক বেশি রোমান্টিক; কখনো সে নায়ক চরিত্রও বটে।

কবিদের নিয়ে এই যে হাসি ঠাট্টা বিভিন্ন গণমাধ্যমে-এর ফলে কী কবিতার মান কিছুটা নিম্নগামী? মানে বিষয়টা এরকম—'কবিতা? ও আর এমন কী! যে কেউ ছন্দ মিলিয়ে লিখতে পারে।' ফলে স্বয়ং কবিই যখন ঘোষণা করে 'কবিতা আসলে শব্দের ব্যায়াম' তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আর এক কবির ঘোষণা —'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি'—এর গোড়ার মাটি ঝুরঝুরে হয়ে যায়। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে সন্দেহ জাগে। কারো কারো হয়তো মনে পড়ে যাবে আশাপূর্ণদেবীর উপন্যাস 'সেই দিন এই রাত্রি'র কথা। যেখানে বৌদি যখন দেবরকে বলে যে পুরুষরা কী করে বুঝবে সন্তান জন্ম দেওয়ার কষ্ট কী? দেবর উত্তর দেয়—'বুঝি বৌদি, আমি কবিতা লিখি যে।'

অরুণ মিত্রকে কোনো এক ফরাসী কবি একবার বলেছিলেন যে, 'দেখে শুনে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে কবিদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।' উত্তরে অরুণ মিত্র বলেছিলেন—'হতে পারে, তবে সংখ্যাটা ফ্রান্সের চেয়ে কম।' মানুষের আবেগ আছে এক মানুষ লিখতে পারে, সুতরাং কবিতার জন্ম হয়। ফ্রয়েড দেখে শুনে তাই হয়তো বলতে বাধ্য হয়েছেন—'পৃথিবীতে যতদিন একটি মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন কবিতাও বেঁচে থাকবে।'

কিন্তু কবিতা তো শুধু লিখলেই হল না তো প্রকাশ করাটাও জরুরি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলে গেছেন—'প্রকাশই সাহিত্য'। কিন্তু প্রকাশ করবে কোথায়? বিগত কয়েক দশক ধরে বাঙালি তরুণ তুর্কীদের কলম পেশার প্রথম জায়গা ছিল স্কুল ম্যাগাজিন। কিন্তু স্কুল শেষ হওয়ার পর প্রায় আশি শতাংশ কবির অপমৃত্যু হয়ে যায়। বাকি কুড়ি শতাংশ তরুণ কবির জন্য থাকে নিজস্ব এলাকার কিছু লিটল ম্যাগাজিন অথবা পোষ্টে কবিতা পাঠিয়ে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা নিয়ে থাকার কিছু বড় বা মাঝারি মাপের বেপাড়ার পত্রিকা। কেউ আবার কলেজ ম্যাগাজিনে হাত মকশো করে। অবশ্যই এদের মধ্যে অধিকাংশ কবিই জীবন জীবিকার তাগিদে লেখালেখি ছেড়ে দেন। অনেকের 'রাইটার্স ব্লক' নামক এক অদ্ভুত রোগে ধরে ফেলে তিনি আর লিখতেই পারেন না। অনেকের কল্পনা শক্তি কমে যায়। অনেকের অভিজ্ঞতায় কুলোয় না আর। অনেকেই ভালো পাঠক হয়ে ওঠেন, কেউ হয়ে ওঠেন সমালোচক। মোটামুটি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এটাই ছিল বাংলা কবিদের নির্মাণ ও পতনের ইতিহাস। তবুও এই ইতিহাস সামনে থাকা সত্ত্বেও শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৭ সালে ২রা আগস্ট আন্দবাজার পত্রিকায় প্রশ্ন তুলেছিলেন—'এত কবি কেন?' সে বিষয়ে পরে আসছি।

একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সামাজিক গণমাধ্যম কী? সবাই বলবেন 'ফেসবুক'। হুতোম থাকলে নিশ্চয় বলতেন—'শহর কলকেতার এই অ্যাক নোতুন' শুধু কোলকাতা নয়, গোটা পৃথিবীতে এই এক নতুন হুজুগ। এর গোড়াপত্তন হয়েছিল অনেকেই জানেন হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মার্ক জুকেরবার্গের হাতে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪ সালে। কিন্তু গোটা পৃথিবী তথা ভারতবর্ষে এর আত্মপ্রকাশ হয় ১৯০৬ এর সেপ্টেম্বর। একটি বৈধ ই-মেল থাকলেই যে কেউ ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারতেন। আত্মপ্রকাশের সে এক অন্য বিস্ফোরণ। মানুষ এমনিতেই এমন এক জীব যে আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রকাশ করতে ভালোবাসে। আর্জেন্টিনার 'হাতের গুহা'য় (cave of land) যে হাতের ছাপের ছবিগুলো পাওয়া যায় তাদের বয়স প্রায় ৭৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পুরানো। মানুষের আত্মপ্রকাশের সেই ছিল প্রাচীনতম নিদর্শন। হাতের ছাপের গুহা থেকে 'ফেসবুক'—যাত্রাপথটা দীর্ঘতর হলেও এসবের উদ্দেশ্যে এক; চিহ্ন রেখে যাওয়া। নিজেকে জানাও, ক্রমাগত জানাতে থাকো। একজন মানুষ কতটুকু প্রকাশিত হয়-তার ব্যক্তিগতপরিসরে? 'প্রতিভাবান মাত্রেই একা!' এই অনুভূতিগুলো একটা সময় পর আর ভালো লাগে না। কবিতা তো আত্মপ্রকাশের অন্যতম একটা মাধ্যম। 'প্রকাশই সাহিত্য'—রবীন্দ্র কথিত এই বয়ান অন্যভাবে সত্য হয়ে ওঠে একবিংশ শতাব্দীতে। একটা সময় ছিল যখন বাঙালি তরুণ তরুণীরা কবিতা লিখিত, গল্প লিখিত আর খাতার পাতায় বাক্সবন্দী হয়ে থেকে উইপোকায় সাবড়ে দিত। প্রকাশের ধরণ বদলে গেছে। অনুভূতির ধারণা পাল্টে গেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষ আর অনুভভ করে না, হাতের

মোবাইল ক্যামেরার মেগা পিক্সেলে বন্দী হয়ে তা পৌঁছে যাচ্ছে কয়েকহাজার মানুষের কাছে। ছোটবেলায় জলের উপর আমরা অনেকেই যেমন চ্যাপ্টা ঢ্যালা ছুঁড়ে ব্যাঙ লাফানি খেলতাম। অন্তর্জাল এখন যেন সেই বিরাট একটা নিস্তরঙ্গ জলাশয়। আমরা সেই জলে ক্রমাগত তরঙ্গ তুলতে চাইছি।

কবিদের কী জনপ্রিয়তার নিরিখে বিভক্ত করা সম্ভব? যেমন ধরা যাক উপরের শ্রেণিতে থাকবেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি, তারপর থাকবেন প্রতিষ্ঠমান কবি, তারপর প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষী কবি এবং সবশেষে প্রতিষ্ঠা নিরপেক্ষ কবি।

শঙ্খ-শক্তি-সুনীল-জয়-সুবোধ এঁরা সবাই লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। প্রতিষ্ঠমান কবিদের মধ্যে বিনায়ক, শ্রীজাত, বিভাস রায়চৌধুরী, মন্দাক্রান্তা, রাহুল পুরকায়স্থ প্রমুখেরা। বাকিরা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ও প্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ কবি। এই বিভাগটার উদ্দেশ্য এই নয় যে কবিদের মধ্যে জল অচল ভাগ করে দেওয়া। বিশেষত শেষের ভাগটি সম্পর্কে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। কবি মাত্রেই প্রতিষ্ঠা চায় এটা কী সারসত্য? সমস্যা হল 'প্রচার', 'প্রকাশ', 'প্রতিষ্ঠা' এগুলির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য সকলেই জানেন। কবিতা মাত্রেই প্রকাশ, আকাঙ্ক্ষী। একেবারে দু একজন লাজুক কবিকে বাদ দিয়েই একথা বলা যায়। এমন কী জীবনানন্দের মতো কবিও কবিতা বা উপন্যাসের খাতা লুকিয়ে রাখতেন। সে কথা আজ কিংবদন্তী। কিন্তু যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা যে সবাই প্রতিষ্ঠা চান একথাটা সত্য নয়। অনেকে নিজের বৃত্তের মধ্যে নিজের লেখালেখি নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। অনেকেই আত্মপ্রতিভার স্বমূল্যায়ণে সেই গণ্ডীটা নিজে নিজেই নিজের চারিদিকে এঁকে দেন। অনেকেই আছেন, যাঁরা প্রতিষ্ঠান বিরোধী। প্রতিষ্ঠিত কোনো কাগজে লেখনে না। এঁদের অনেকেই এক একটি প্রতিষ্ঠান। মলয় রায়চৌধুরী, জহর সেন মজুমদার সহ অনেকেই সেই ঘরানাকে লালন পালন করেন। ফলত প্রতিষ্ঠা নিরপেক্ষ শব্দটি ব্যবহার আমি প্রাসঙ্গিক মনে করি।

আবার এমনও অনেক কবি রয়েছেন যাঁরা সোশাল মিডিয়ায় কবিতা লিখেই তৃপ্ত। প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সব কিছুরই ফেসবুক। এঁদের বইপ্রকাশ হয় না, এঁরা পত্রপত্রিকায়ও লেখেন না। কবিতার মান নিয়ে এঁরা চিন্তিত নন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যতসম্ভব এদের নিয়েই 'ফেবু-কবি' এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। (২ জুলাই, ২০১৬) ঐ নিবন্ধের লেখক ঋষিগোপাল মণ্ডল লিখেছেন—'ফেবু খুললেই ষাঁড়াষাঁড়ি বানের মতো কবিতা আছড়ে পড়ছে। মূর্খরা বলছে, বাংলা কাব্যসাহিত্যের খরা কাটাতে কবিতা দেবী ফেবুতে বাণ মেরেছেন। সোনামুখীরা বলছে বাংলা কবিতায় সুনামি এসেছে, কী আছাড়ি পিছাড়ি কাব্যযন্ত্রণা। না প্রসবিলে, না প্রকাশিলে কী প্রবল গর্বযন্ত্রণা! ফেবুতে সকলেই কবি।'

কবিদের নিয়ে তারল্য বা রসিকতার ধারাটি এইভাবে শক্ত জমি খুঁজে পায় বাজারি পত্রিকার হাতে। কেউ আবার একথা লেখে—'হালকা ঝড়ো হাওয়া/ দু এক পশলা

বৃষ্টি'/ আকাশে মেঘের গুরু গুরু/ লে ফেবু কবিদের, কবিতা লেখা শুরু।' প্রতাপ রায়, প্রসঙ্গত তাঁর ফেসবুক পেজে একটি রম্যরচনা লেখেন 'ফেবু কবি' নিয়ে। সেই রচনার কিছু অংশ বলতে ইচ্ছে করছে—"কী মামা? কেমন দিলো? বলি ফেসবুকে কোবতে লিখে কি কোবি হওয়া যায়? অত্ত সহজ? আরে বাবা কোবি হওয়ার এট্টা সিষ্টেম আছে না? মাথায় পাখি এল আর তুমি হুড়মুড়িয়ে কোবতে ছেড়ে দিলে?.....বলি কুনো বাজারি কাগজ ছেপিছে তুমার কোবতে? কোবতেরও মোড়ল হয়। সংবিধানে লিখা আছে, বাজারি মোড়ল যতক্ষণ না তুমার কোবতে ছাপবে ততক্ষুণ তুমি কোবি না।" 'ফেবু কবি' নিয়ে প্রতিবাদের সেই সূত্রপাত।

প্রশ্ন হল কে এই ঋষিগোপাল মণ্ডল? তিনি মূলত গদ্যকার। কবিতাও লেখেন। এঁর 'ল্যাজে পা' নামক একটি রম্যগদ্য থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিই যার থেকে তাঁর সাহিত্যদর্শন অনেক স্বচ্ছভাবে জানা যাবে। তিনি লিখছেন—"এত কাঁড়ি কাঁড়ি ছাপিয়ে বাংলা সাহিত্যের কী ঘন্টাটা হচ্ছে? আজিকার এই লেখায় শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে, শব্দের চাতুরি আর ভাষার জাগলারি দিয়ে আমি যে ট্যাঁশ রচিলাম তাতে বাংলা সাহিত্যের লেখ্যাগারের শব্দভাণ্ডারের কী এসে গেল? এই লেখার এবং এই লেখার বক্তব্যের আয়ূ কতদিন? আগামীকাল না কি আগামী রবিবার পর্যন্ত? কী হয় এই সব আটভাট লিখে? ছাপিয়ে? বড়জোর বৈধ বউ আর অবৈধ প্রেমিকা 'মারহাব্বা মারহাব্বা বলেশোর মচায়, ' ফেসবুকে গোটা পঁচিশেক 'লাইক' পড়ে। সেই বা কম কী।' (২৩ জুন ২০১৩, ফজলুলবারি পোষ্ট, ফেসবুক) এই লেখাটার মধ্যে লেখকের বক্তব্যের রয়েছে দ্বিচারিতা। একবার বলেছেন 'এইসব লিখে হয় কী?' পুনরায় বলছেন 'সেইবা কম কী!' তিনি নিজেই দ্বিধাগ্রস্থ। ঋষি গোপালের বিরুদ্ধে লেখালেখিও কম হয়নি। সবচেয়ে চমৎকার প্রতিবাদ করেছে কবিও কথাসাহিত্যিক মলয় রায়চৌধুরী, লিখেছেন—

'ঋষিগোপাল মণ্ডল আমাকে কেন ফ্রেণ্ড রিকোয়েষ্ট পাঠিয়ে বন্ধু হয়েছেন জানি না।.....একটা ব্যাপার স্পষ্ট, উনি ইংরেজী ও ফরাসি ভাষার কবিরা ফেসবুক কী করছেন জানেন না, তাই বাঙালি হয়ে বাঙালির খিল্লি উড়িয়েছেন। আসলে বাঙালিত্ব সব বাঙালির রক্তে থাকে না।' (৩০ জুন, ২০১৬)

সবচেয়ে মজার কথাটি লিখেছেন অতনু দেব। অতনু দেব **'Bong Route'** নামে একটি ব্লগ চালান। সেখানে একটি দীর্ঘ গদ্য লেখন "অর্বাচীন ফেবুকবি" এবং বিদগ্ধ প্রতিবেদক : একটি তুলমূল্য আলোচনা" শীর্ষক। অতনুবাবু নিজেকে একজন 'ফেবুপাঠক' হিসেবে লিখেছেন—

"পরন্তু বাবুমশাই, যানে সে পহলে.....ইস 'ফেবুপাঠক' কি কিয়া হুয়া ইনভেস্টিগেশন সে পতা চলতা হ্যাঁ'—যে 'ঋদ্ধিমন' নামে আপনার একটা ফেসবুক পেজ আছে। সেখানে ডিপি সহ মোট ৩৮ টি পোস্ট আপনি প্রসব করেছেন। আর সর্বমোট লাইকের

সংখ্যা ৪৪০। অর্থাৎ পোস্ট পিছু আপনি লাইক কুড়িয়েছেন ১১৫৭ তাই আপনি 'জীবনলাল পাখিরা' বা কবি কস্তুরি খাসনবিশ' এর উপর রেগে যেতেই পারেন।"

শ্রীজাত পাশাপাশি জীবনলাল পাখিরা-রাও কবিতা লিখছে। এতে সাহিত্যের লাভ-ক্ষতি জানিনা, এই যে কবিতার পসরা সাজিয়ে অপেক্ষা করা, পড়ুক বা না পড়ুক সেটা কবিতা। কবিতা শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে নয় গোষ্ঠী চেতনারও জন্ম দিয়েছে। 'কবিতা' লিখে ক্লিক করে বেরিয়ে আসছে কয়েকশো 'কবিতা—গোষ্ঠীর' কথা। কয়েকটি এমন গোষ্ঠী 'আমার কবিতা'-এর প্রতিষ্ঠাতা সুজিত দাস, যিনি একজন কাষ্টমস অফিসার। প্রায় আড়াই হাজার সদস্য আছে এই গোষ্টীতে। বাংলা শ্রেষ্ঠ কবিতা' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সৌমেন ঘোষ, ইনসিওরেন্স ম্যানেজার। এই কবিতা গোষ্ঠীর হাত ধরে পরিচিতি পাচ্ছে নিতাই মাল, স্বপন গায়েন, দীপক মুখোপাধ্যায়ের মত অসংখ্যা অনামা কবি।

কেমন লিখছে এই ফেবু কবিরা? এটাই মূল প্রশ্ন! নাকি জীবনযাপনের সঙ্গে কবিতা মিশে যাচ্ছে এটাই বড় কথা; এক একটি কবিতা গ্রুপে হাজার হাজার সদস্য। সবাই যে কবিতা লেখেন তা নয়। কিন্তু কেউ কেউ আছেন পারুক বা না পারুক ধারাবাহিক ভাবে লিখে চলেছেন। সুসময় বিশ্বাস, ২০১৬ সালে একটি কবিতা গোষ্ঠী তৈরি করেন—'কবিতা সাহিত্য আর শুধু তুমি ও আমি।' যার সদস্য সংখ্যা এগারো হাজার। সুসময় নিজেই কবিতা লেখে। 'বরষা এসো' কবিতায় লিখছে—'আকাশ থেকে আওনঝরে বর্ষা রাণী কই/ জ্বলে গেল পুড়ে গেল সাধের অঙ্গ সই।' এই সুসময় একটি পোস্টে লিখেছে—'অনেক মহাপণ্ডিত লেখকগণ রেগে গিয়ে গ্রুপ ছেড়েছেন। অনেকে আবার উনাদের পোস্টে লাইক কম হওয়ার জন্য গ্রুপ পরিত্যাগ করেছেন। এই গ্রুপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে সৃজনী শক্তির উন্মেষ ঘটানো।' উদ্দেশ্যটা ক্রমশ প্রাঞ্জল হবে আমাদের কাছে।

সুকল্যাণ গায়েন, 'কবিতা ক্যাম্পাস' নামে একটি গোষ্ঠী চালান। এই গোষ্ঠীর কবি উজান শুভ্র, একটি পোস্টে লিখেছেন—'কাল থেকে প্রতিদিন একটা কবিতা লিখবই কারণ কবিতাই তো শেষ আশ্রয়, বন্ধুরা পাশে থেকো।' সুতরাং, কবিতা নিয়ে ভাবছে মানুষ বোঝা যায়। কবিতাগোষ্ঠীর পাশাপাশি 'কবিতার পেজ' রয়েছে অনেকগুলো। প্রতিষ্ঠিত প্রায় সব কবির নামে এক একটি কবিতার পেজ খোলা আছে। পেজগুলো চালানোর দায়িত্ব কবির ভক্তদের। কিছু কিছু পেজ কবি স্বয়ং চালান। যেমন শ্রীজাত শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক এই পেজে প্রায়ই কবিতা পোস্ট করেন কবি স্বয়ং। এখানেই তো প্রকাশিত হয় 'অভিশাপ' নামক সেই বহু বিতর্কিত কবিতাটি। যেটা সোশাল মিডিয়ায় তোলপাড় ফেলে দেয়। শুধু সোশাল মিডিয়ার নয়, কবিতা বোধ্য অবোধ্যা, ধর্মপ্রাণ বা মহাগেঁড়ে, রাজনৈতিক সুবিধাবাদী বা দলদাস—সবার মধ্যে এই একটি কবিতা যেন

আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফেসবুকের কবিতা চর্চা কোথাও একটা শক্ত জমি খুঁজে পায় যেন। ফেসবুক না থাকলে কে জানত সে কথা?

তুহীনশুভ্র মণ্ডল 'কবিতা কলরব' নামক যে কবিতার পাতাটি সঞ্চালনা করেন, তার ক্যাপসান হল—'লক্ষ লেখা/লক্ষ্য লেখা'। তুহীনশুভ্র তার পেজে লিখেছে—'এই সময়ের বড় ক্রাইসিস হলো আমরা লেখা শুরু করি, আমার লেখা কেমন হওয়া উচিত সেখানে থেকে নয়। আমার লেখা কেমন হওয়া উচিৎ নয়, সেখান থেকে।' এই মতামতগুলি সহজে পৌঁছে যাচ্ছে পাঠকের কাছে ফেসবুকের মাধ্যমে।

জীবিত প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে যাঁদের কবিতা নিয়ে পেজ তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটি পেজ হল—'জয় গোস্বামীর কবিতা', 'শঙ্খ ঘোষের কবিতার পাতা', 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী'র কবিতা।' এই সব পেজে নিয়মিত এঁদের প্রকাশিত কবিতার পোস্ট করা হয়। মতামত শেয়ার হয়। এইভাবে কবিতা জেগে থাকে, বেঁচে থাকে।

যে কবিরা সরাসরি ফেসবুকে মতামত বা কবিতা শেয়ার করেন তাতে তাঁদের কবিতার দর্শন ও সমকালীন চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যেমন মন্দাক্রান্ত সেন, সুবোধ সরকার, অংশুমান কর, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল পুরকায়স্থ প্রমুখেরা প্রায় মতামত আদান প্রদান করেন, লেখেন। মন্দাক্রান্তা তার কর্মজীবন, সাহিত্যজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সব খবরই ফেসবুকে আপডেট করেন। 'ধর্মীয় সন্ত্রাস' নিয়ে ১০ এপ্রিল, ২০১৭ একটি পোস্টে তিনি লেখেন—

'হ্যাঁ আমি লিখব বজরঙ আর আমিই লিখব আইসিস লিখব তাদের ধিক্কার যারা শোণিতে নৌকা বাইছিস, ইসলাম নাকি হিন্দুধর্ম, ছেড়ে কথা বলব না
সারাটা পৃথিবী তোদের ঘৃণ্য হিংসা দিয়েই বোনা।'

ফেসবুকে ক্রমাগত যে হুমকি গান মন্দাক্রান্তা, তার প্রতিবাদে লেখেন—

'আমাকে ধর্ষণ করবে? ভয় পাইনা এই হুমকিকে
ভয় পাই এ সমাজ এগিয়ে চলেছে কোন দিকে।'

ফেসবুকের কবিতা নিয়ে সুবোধ সরকারের চিন্তাভাবনা খুব প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল 'সংবাদ প্রতিদিন' প্রত্রিকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 'ছুটি'র ক্রোড়পত্রে। সেখানে তিনি 'প্রতিভা ব'সে ফেসবুকের পাঁচিলে পাঁচিলে' শিরোনামে একটি গদ্য লেখেন। যেখানে বলছেন—'কিছু ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি ঘন ঘন মেঘ সঘনঘন গহনে। যাঁরা দুলাখ তিনলাখ ফলোয়ার্স জোগাড় করেছেন ফেসবুকে। তাদের হুমকি শুনতে পাচ্ছি—'আপনার কোনও প্রতিভা নেই/পড়ুন, আপনার দুলাখ ফলোয়ার্স নেই। আপনি ধান্দাবাজ।'

তিনি লিখেছেন—'এখন আর প্রতিভা জন্মায় না, ফেসবুকে জন্মলাভ করেই সে 'ফ্যান ক্লাব' বানায় এবং দুতিন লাখ ফলোয়ার্স বানিয়ে ফেলে।' আমরা জানি হাজার

হাজার ফলোয়ার্স সহ কবি সুবোধ সরকার নিয়মিত ফেসবুকে লেখেন, তাঁর নামে দুটি ফেসবুক পেজও আছে. ফলত তাঁর ক্ষোভের কারণ ফেসবুকের কবিতা নিয়ে নয়, মূলত কিছু প্রতিষ্ঠিত কবির উপর। নইলে কবিতা নিয়ে তাঁর ফেসবুক পেজে এত মতামত থাকত না। 'ফলোয়ার্স' ও 'লাইক' ও 'বন্ধু'—এ বড় জটিল খেলা। মেয়েরা যখন যৌন ইঙ্গিতমূলক ছবি পোস্ট করে তাতে দু'হাজার 'লাইক' পড়ে অথচ ভালো কোনো লেখায় কেন যে কার্পণ্য থাকে তা বোঝা মুশকিল না হলেও বড় রহস্যময়। ফেসবুক কী তাহলে ভালো পাঠক তৈরি করতে পারে না? আবার এমনও দেখা গেছে কিছু খাজা কবিতায়, সুবোধ সরকার যাকে বলেন—'মিল মালিকের কবিতা'— লাইক ও কমেন্টসের ছড়াছড়ি। তাহলে কী ফেসবুক পাঠক তৈরি করতে ব্যর্থ। নাকি, কবিতার বাস্তবচিত্র এটাই? ফেসবুক শুধু কবিতা লেখার জায়গা নয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবর, বইয়ের বিজ্ঞাপন, ভালোবাই সম্পর্কে মতামত প্রদান, কবিতা নিয়ে সব প্রজন্মের ভাবনা চিন্তা শেয়ার করা, কবিতা নিয়ে তর্ক বিতর্ক-এসব কিছুর খোলা মঞ্চ হয়ে উঠেছে ফেসবুক। একই সময়ে একটি বিষয় অনেকেই দেখছে মতামত দিচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া—এটা কেবলমাত্র ফেসবুকেই সম্ভব। কবিতা নিয়ে এক ধরনের শব্দ জাগলিং ও হয়। 'শব্দ সাঁকো' পত্রিকার সম্পাদক দুই লাইনের কবিতা প্রকাশ করেন কখনো সখনো। খেলাটা হল সম্পাদক একটি লাইন লিখে দেন, পরের লাইনটা লিখতে হয় কবি। তেমনই একটি কবিতার লাইন, সেটা ফেসবুকে পোস্ট করা হয় ১৫ মার্চ, লাইনটা হল—'এই তোমার আমার এক মলাটের রাত'। এই বিষয়টি নিয়ে প্রায় ১০৬ জন কবিতা লেখে তার দু একটি নিম্নরূপ—

বিকাশ চন্দ্র—'এই তোমার আমার এক মলাটের রাত
সবার জন্য রেখে যাওয়া আঁধার ছেঁড়া প্রভাত।
সুকুমার মিস্ত্রী—'এই তোমার আমার একমলাটের রাত
ভালোবাসা ঘুচিয়ে দিল দূরত্ব সংঘাত।
সীমা ব্যানার্জি রায়— 'যখন ফুলবনেতে চাঁদের আলো নাচে ছলাৎ ছলাৎ
তখন বন্দী শুধু। এই তোমার আমার এক মলাটের রাত।
দেবজ্যোতি দাশগুপ্ত—'তোমার ছোঁয়ায় মোড়া আমার প্রেমের ধারাপাত
শাশ্বত এই তোমার আমার এক মলাটের রাত।'

চলতেই থাকে এই খেলা। জানি না যারা এইভাবে কবিতা লেখে তারা আদৌ কবিতা চর্চা করে কিনা। কবিতা যেহেতু চর্চার বিষয়—কিংবা শঙ্খ ঘোষের ভাষা ধার করে বলতে হয় 'হয়ে ওঠার বিষয়'—সস্তা লাইকের প্রাবল্যে—সেই হয়ে ওঠায় কোথাও ফাঁক থেকে যাচ্ছে না তো। 'লাইক' পাওয়া, কমেন্টস পাওয়া একটা মায়াবী হরিণের খেলা। এমনও হয়েছে এক কবি অসংখ্য লাইক পেয়েছেন তাঁর পোস্টে। কিন্তু কবিতার

বই বিক্রীর সময় তিনি কতখানি আশা করেছিলেন ততখানি ছুঁতেও পারেননি। সেই হতাশা রাখবে কোথায়। ফেসবুক কী পাঠককে বই থেকে দূরে ঠেলছেনা পাঠককে। বিনি পয়সায় প্রতিদিন কয়েক'শো কবিতা পড়তে পারছে, পয়সা দিয়ে বই কেনার ঝক্কি আর কেইবা নিতে চায়! প্রকাশনা জগৎ এমন আর ভালো বইয়ের খোঁজ করে না। ভালো লেখক বা কবিকে তুলে ধরে না, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'—এই ব্যাবসায়িক আদর্শবাদ আমাদের ভালো প্রকাশকদের কোথাও থামিয়ে দিয়েছে। বাড়ির পাশেই গজিয়ে উঠছে ছোটখাটো প্রকাশনী। ফর্মা অনুযায়ী বই ছাপা খরচের হিসেব সাঁটা দেয়ালে। প্রকাশকরা আর সেই দায়বদ্ধতা নিতে চাইছে না। সম্পাদকরাও অধিকাংশত হয়ে উঠেছে প্রকাশক। কিংবা নির্দিষ্ট সব গোষ্ঠী তৈরি করে সেই গোষ্ঠীর লেখকদের বাইরে বেরতে পারছে না। ফেসবুক আসলে আমাদের জগৎটাকে শুধু বড় করেনি। কোথাও কোথাও ছোটোও করে দিয়েছে হয়তো।

দু একজন কবির কথা হয়তো বলতে পারি যারা নিয়মিত লিখছেন কিন্তু কাগুজে পত্রিকায় প্রকাশ করেন না কোনোদিন, যেমন তনুজা চক্রবর্তী। 'সৃষ্টিশীল লেখক' নামক কবিতায় লিখছেন—

'কবি সৃষ্টিশীল কিছু লেখ....
কাব্যরসে জবদবে করে মাখানো কবিতা পরিবেশন করো....
ইচ্ছে মতো ফেরিওয়ালার কাছে বেচে দিয়ে
ভারমুক্ত হওয়া যায়—
আমি কলম দিয়ে সাদা পাতায় ধান চাষ করি গোবন্ধু—
ছবি আঁকতে পারিনা।
ধান চাষে বোধ হয় সৃষ্টির গন্ধ নেই!.....

তনুজা চক্রবর্তী নিতান্ত গৃহলূ। হয়তো তাঁর কবিতা একটি দুমলাটের ফাঁকে ঠাঁই পাবে একদিন। তুষ্টি ভট্টাচার্য চমৎকার কবিতা লেখেন। কবিতা নিয়ে অসাধারণ সব মতামত দেন। লেখেন চমৎকার। যেমন—'সুরক্ষিত নেকসে' কবি লিখছেন—

'বিষয় থেকে বিষয়হীনতার দিকে যেতে গিয়ে দেখেছি
ভল্টের ভেতরে থেকে যাওয়া চোরা গর্ত দিয়ে
নেমে গিয়েছে অ্যাকাসিয়ার শেকড়।
উপড়ে নেওয়ার বদলে জড়িয়ে নিয়েছি আঙুলে
অদৃশ্য আঙুল-ছাপা মেঘে
অন্ধকার পড়েছে হীরের নেকলেস।'

আবার এমন অনেকেই আছেন যারা নামের আগে কবি উপাধি যোগ করেন যেমন কবি প্রদীপ দে, কবি কৌশিক গাঙ্গুলী। এঁদের অনেকেই স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। লেখেন

ভালো। বনগাঁর কবি সুশান্ত ভট্টাচার্য ফটোশপে টাইপ করে কবিতা প্রকাশ করেন প্রায়। চমৎকার সব কবিতা লেখেন, যেমন 'মানুষ বড় বোকা' কবিতায় লিখছেন—

'সত্যি ভূতের পালক
যদি নতুন করে গজায়
তুমি বলতে যুদ্ধ চলুক
রাজায় এবং রাজায়।
প্যারাসুটে নামছে সেনা
ভূতের কান্না শোনো
ধূলোয় ঢেকে যাচ্ছে কারা
এক থেকে দশ গোনো।'

অথচ এই সুশান্ত ভট্টাচার্য কবিতা 'লাইক' পায় খুব যৎসামান্য। হয়তো সেই অভিমান অনেকেরই আছে। হয়তো তেমন অনেক কবির পরিচয় আমি এখনও পাইনি কিংবা তারা আমার বন্ধু তালিকায় অনুপস্থিত। তবু সবুজ আলোর সংকেত কবিতার পাশে এইভাবে জেগে থাকবে, যতদিন ফেসবুক থাকবে।

আমরা একটা দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে ঢুকে যেতে পারি। মেঘের আড়লে তেমন ইঙ্গিতও রয়েছে। আমরা আলোচনা করতে পারি অংশুমান করের কবিতা পোস্ট নিয়ে, রাহুল পুরকায়স্থ কেন এত কম কবিতা পোস্ট করেন। সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি বিভাস রায়চৌধুরী বা সুমনগুণের মতামত নিয়ে। কিন্তু কবিতা নিয়ে তন্নিষ্ঠ আলোচনার জায়গা এটা নয়। কবিতাচর্চায় ফেসবুকের অবদানটা কোথায়—আমাদের পথটা আরও ছোটো করে নিতে চাই। কবিতা নিয়ে বিভিন্নজনের ভাবনার প্রকাশ করার জায়গা আছে অঢেল—তার নির্দিষ্ট পাঠকও আছে। কবিতা নিয়ে সাধারণ মানুষ কী ভাবছে তার খোলা মঞ্চ এই ফেসবুক।

প্রসঙ্গ একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। কবি অধ্যাপিকা সুতপা সেনগুপ্ত ১৫ মে ২০১৭ একটি পোস্টে লিখেছেন—'জানতাম, একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে গেলে পুরো সময়টা থাকাই সমীচীন। শিখেছিলাম বিপদে না পড়লে, নিজের কবিতা পাঠ করে কেটে পড়াটা অভদ্রতা। বড় হল থেকে চলে যাওয়া তাও চলে কিন্তু ছোট আন্তরিক ঘরোয়াতেও?.....খবর পেলাম গতকাল এমনই এক অনুষ্ঠান থেকে নিজের পড়া-কওয়া সেরেই চলে গেলেন—বাংলায় বললে কেটে পড়লেন সাত দশকের তিন কবি। হতবাক হয়ে গেছি তরুণরা এটাই শিখবেন তো?'

কবিতা নিয়ে এই মন্তব্য কিন্তু আমাদের এক বৃহৎ পাঠক শ্রেণির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র জানান যে সবার কবিতা শুনতে হবে-এই মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? তাছাড়া মঞ্চের বদ্ধ পরিবেশ তার পছন্দ নয়। শেষ পর্যন্ত সুতপা সেনগুপ্তের উদ্দেশ্যে লেখেন—

'আজকাল সব কবিসভাতেই দেখছি এই অধ্যাপিকাকুলের তাণ্ডব....তাঁদের থামানো যায় না কোনভাবেই..... অনুষ্ঠানসূচীতে তাঁদের নাম থাকুক বা না থাকুক, তাঁরা একরকম গুঁতিয়েই উঠে পড়েন স্টেজে এবং মাইক্রোফোন সুভদ্র কবি সঞ্চালকের কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নিয়েই বকতে থাকেন আভ্যে বাভ্যে আগডুম-বাগডুম....সমবেত কবিদেরও তাঁদের ছাত্রছাত্রীবৎ স্নেহ করেই হয়ত.....'

এইভাবে হয়ত কোথাও মুখোশ খসে পড়ে। মতামত তৈরি হয়। কেউ কবি না হয়েও নামের আগে কবি উপাধি যোগ করে। কেউ নিজের কবিতা অন্যকে ট্যাগ করে ধাতানি খায়। কেউ প্রাত্যকৃতের মতো প্রতিদিন কবিতা পোস্ট করে। কেউ কবিতার বই প্রকাশ নয় 'ফেবু কবি' হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কেউ অনামা কবির বিষয়ও ভাবচুরি করে নতুন কবিতা লেখে। কেউ অন্যের কবিতা নিজের বলে চালিয়ে দেয়। কেউ ন্যাকামো করে 'আর কবিতা লিখব না' এই পোস্ট করারপর তিন হাজার তিনশ অনুরোধ পান 'কবিতা ছাড়বেন না দাদা, আমার জন্যে লিখুন'।

আর এইসব ভিড়ে কবিতা হারিয়ে যায়, কবিতা সহজলভ্য হয়ে যায়। কবিতা নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ কার্টুন তৈরি হয়, কবিতা হতে গেলে কী কী দরকার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সেই বিখ্যাত লাইনগুলো তুলে ধরে।

ঘুরে ফিরে সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নে ফিরে যেতে চাই 'এত কবি কেন? ১৯৮৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় মন্তব্যটি করেন শক্তি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় থেকে ঋষিগোপাল মণ্ডল একটা বৃত্ত যেন তৈরি হয়। হিংসা বা ঈর্ষাবশত কীনা সে প্রশ্ন অন্য। প্রশ্নটার শিকড় অত্যন্ত গভীরে।

টি. এস. এলিয়ট যখন 'ফেবার এণ্ড ফেবারের' সম্পাদক, তখন এক তরুণকবি এসে তাঁকে বলে—'আমার কবিতার বই ছাপুন আমার দশহাজার পাঠক আছে।' উত্তরে এলিয়ট বলেন আমরা একশ জন পাঠকের জন্য বই ছাপাই, দশ হাজার পাঠকের জন্য না। ঠিক আজকের দিনে কোনো তরুণ কবি যদি কোনো প্রকাশককে গিয়ে বলেন—'আমার বই ছাপান, আমার ফেসবুকে পাঁচ হাজার বন্ধু, দশহাজার ফলোয়ার্স আছে. আমি কবিতা লিখলে দুহাজার লাইন আর তিনহাজার মন্তব্য পাই।' জানি না প্রকাশক এত লোভনীয় অফার গ্রহণ করবেন কী না! ফেসবুক কী শুধু কবি তৈরি করছে—নাকি পাঠক তৈরি করছে? সেটাও ভাবতে হবে এবার। সবুজ আলোর মায়া অস্বীকার তবু কে করবে? হয়তো দুদিন পরে কেউ 'ফেবু-ফোবিয়া', 'ফেবু ম্যানিয়া', 'ফেবু রেক্সিয়া'—এইসব মনোরোগ নিয়েও প্রবন্ধ লিখবে।

■ মলয় মণ্ডল—অধ্যাপক, কবি ও প্রাবন্ধিক

মৌসুমী সাহা

প্রকৃতির পাঠলিপি ঃ আল মাহমুদের কবিতা

'বাঙলার আকাশে যতেক খেচর
কবিতা বোঝে না তারা। কবিতা বোঝে না তাই
বঙ্গোপসাগরের কতেক হাঙর!'

অনেকটা সচেতনভাবেই প্রতিবাদী সুরে এই আত্মপ্রত্যয় কবি আল মাহমুদ-এর পঞ্চাশের দশকের অন্যতম শক্তিশালী কবি, বিশুদ্ধ বাক্‌শৈলীর এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি —বলা যেতে পারে ব্যতিক্রমী।

১১ জুলাই, ১৯৩৬ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া-র গ্রামের বাড়িতে জন্ম— 'আমি জন্মেছি গ্রামে, আমার চতুর্দিকে যতদূর চোখ যায় শুধু গ্রাম আর গ্রাম আর শস্যের মাঠ। মাঠের গা ঘেঁসে নদী।'.....('আমি ও আমার কবিতা')

তিতাসের তীরে মোড়াইল গ্রামে ছিল কবির বাড়ি, এলাকায় 'মোল্লাবাড়ি' নামে পরিচিত। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে প্রকৃতির কোলে, তিতাসের তীরে শারীরিকভাবে দুর্বল থাকায় মন দেননি খেলাধূলায়। মাঠের পাশে বসে বই পড়তে পড়তে একসময় কাজী-নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' পড়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন কবিতা লেখায়। ছেলেবেলায় লেখা প্রথম কবিতা স্মৃতিতে আচ্ছন্ন, নামটা এখন তাঁর মনে পড়ে না।

আল মাহমুদের পুরো নাম মীর আবদুশ সাকুল আল মাহমুদ। এক দাদা ছিলেন কবি মীর আবদুল ওহাব, জারী গান লিখতে পছন্দ করতেন। ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও হয়ে উঠেছিলেন খণ্ডিত বাংলার ভাষা তথা সংস্কৃতির একীভূত শুদ্ধতম রূপ—

'যদিও বোঝে না কবি রাজাদের স্বপ্নের কী মানে,
কিন্তু এটাতো জানে, হত্যাই হত্যা ডেকে আনে।'
(প্রাচীন থেকে কথা', মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো)

১৯৪৯-৫০ এর মধ্যে 'সত্যযুগ'-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'তিতাস চরের ছেলে', তখন তিনি সপ্তম শ্রেণীতে। ১৯৫২ সালে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ভাষা আন্দোলন নিয়ে কবিতা লেখার অপরাধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় সরকার থেকে, তখন কিছুদিনের জন্য ফেরার হয়ে যান তিনি।

এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক দেওয়ার পর আর সুযোগ পাননি প্রথাগত পড়াশুনো করার। ১৯৫৪-র শেষের দিকে চলে আসেন ঢাকার নবাবপুরে, আশ্রয় নেন ধোলাই খালের ধারে এক হোটেলে, কবিতা লেখার শুরু প্রায় এইসময়েই।

ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, 'চতুষ্কোণ', 'চতুরঙ্গ', 'ময়ূখ', 'কৃত্তিবাস', বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা',য় চলতে থাকে তাঁর লেখালেখি। পাশাপাশি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিকান্দার জাফরের 'সমকালে' পত্রিকার জন্যও লিখতে থাকেন নিয়মিত। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের যারা জনপ্রিয় কবি—শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, এদের মধ্যে নিঃশব্দে জায়গা করে নিয়েছিলেন আল মাহমুদ।

১৯৫৭ সালে নবীননগর উপজেলার বিলগাঁও গ্রামের সৈয়দ মোজাম্মেল হকের মেয়ে সৈয়দা নাদিরা মহম্মদকে বিবাহ করেন এবং ১৯৬০ এর পর কর্মজীবন শুরু হয় সাংবাদিকতা দিয়ে। 'বাফেলো' পত্রিকা সম্পাদনা ও দেশের পুরনো দৈনিক 'ইত্তেহাক'-এ প্রুফ রিডারের চাকরি প্রায় বছর দশেক, ধীরে ধীরে এই কাগজেই দায়িত্ব পান মফস্বল সম্পাদক হিসাবে, দশম শ্রেণী অবধি পড়েও মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই পান বাংলা একাডেমি পুরস্কার।

কবি আল মাহমুদের কবিতার অঙ্গে-অঙ্গে ছড়িয়ে আছে জীবনরস। আধুনিকতা ও তৎসহ মৃত্তিকার প্রাণময়তা তাঁর কবিতার প্রকৃত মুখশ্রী। রাখালিয়া নিসর্গ প্রত্নপুরাণ-গ্রামীণ জীবনাচার-লোকায়ত ছন্দ-সংস্কৃতিতে এমনই ভাববিভোর যে তাঁর কবিতার পরতে পরতে ভেসে ওঠে প্রাকৃতিক মগ্ন চৈতন্যের ভাষা—

'গোঁসাইপুরের ঘাটে হয়তো বা ভোর হবে কাল, কারুকর্মী মহাকাল আঁকবেন সবুজ সকাল।' ('নৌকায়'/লোক লোকান্তর)

পরিণতমনস্ক কবির স্বাতন্ত্র্যের আগাগোড়া সুরেখতা সত্ত্বেও তাঁর কাব্য রচনার শ্রেষ্ঠ উপাদান জীবনাভিজ্ঞতার মূল থেকে উৎসারিত একান্তভাবে মানবিক—

'বর্ষণ ভিজেছে মাঠ। যেন কারভেজা হাতখানি রয়েছে আমার পিঠে।' ('প্রকৃতি'/ সোনালি কাবিন)

নদীবেষ্টিত বাংলাদেশের নদী-পানির তাপ-উত্তাপে বেড়ে উঠতে উঠতে ব্যক্ত হয় কবির মনন অভীক্ষা। নদীর ছন্দ-স্পন্দনে নিবিড় হয়ে ওঠে কবির অনুভব-গাথা, যে তিতাসের জলকল্লোল প্রবাহে তাঁর কবিতার নৌকা ভাসান, সেখানেই তার ভাবদেনা সন্তরণ করে ফেরে। নিঠুর উপলব্ধির অনুভব নয়; সত্তার গভীরে তাকে ধারণ ও বহন করেন—

"এ আমার শৈশবের নদী এই জলের প্রহার সারাদিন তীর ভাঙে, পাকখায়, ঘোলা স্রোত টানে যৌবনের প্রতীকের মতো অসখ্য নৌকার পালে গতির প্রবাহ হানে'।...

কিংবা,

.....'অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শবরী তিতাস

কী গভীর জলধারা ছড়ালো সে হৃদয়ে আমার।
(তিতাস'/ লোক-লোকান্তর)

প্রকৃতিজাত উপকরণেই আল মামুদের ছন্দবিন্যাস। তিতাসপারের চোখে দেখা জীবনের টুকরো টুকরো। চালচিত্রের মধ্যেই খুঁজে পান জীবনের অন্তহীন বহমানতা, কিন্তু এ কোন্ নদী? যে নদীর উদ্দাম আক্রোশে ভাঙন ধরাতে ধরাতে এগিয়ে আসে ধীরগতিতে। প্রাত্যহিক ভাঙনে উজাড় হয়ে আসে ইদ্রিসদের গোয়ালঘর, কৈবর্তপাড়ার নলিনীদের ভিটে বাড়ি ইত্যাদি। আর যেদিন নদী এসে তাদের বাড়িটাকে আষ্টেপৃষ্টে ধরলো সেদিন—

.....'ভাঙনের রেখা পেছনে রেখে
আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছিঁড়ে পড়লাম'
('চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়',/সোনালি কাবিন')

স্মৃতিসিক্ত তিতাসের জলতরঙ্গে তরঙ্গায়িত কবির জীবনবৃত্ত; নগরবাসী হয়েও ভালো থাকার মন্ত্রে দীক্ষিত তিতাসের জলধারায়—

'নীল বইচা মাছের মতো চোখ
স্বপ্নে আমায় কুশল পুছে রোজ—
'ভালো কি আছো'? হায়রে ভালো থাকা!
নগরবাসী কে রাখে কার খোঁজ!

অথবা,

ফিরলে আজো পাবো কি সেই নদী
স্রোতের তোড়ে ভাঙা সে এক গ্রাম?
হায়রে নদী খেয়েছে সব কিছু,
জলের ঢেউ ঢেকেছে নাম-ধাম'
('এক নদী'/সোনালি কাবিন)

প্রকৃতির পাঠলিপি নিয়ে রচিত আল মাহমুদের কবিতার ব্যঞ্জনা প্রায় সাংকেতিকতার সূক্ষ্ম সীমায় পৌঁছে যায়। নিছক ঘটনা বা **incident** নয়, প্রকৃতি প্রভাবিত জীবনাণুভরে প্রচ্ছদে অনিবার্য অর্থের দ্যোতনায় অপরূপ, আত্মিক মানস প্রবণতা—

'সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কর্ণফুলীর কুলটায়
দুধভরা ঐ চাঁদের বাটি
ফেরেস্তারা উল্টায়।
তখন কেবল ভাবতে থাকি,
কেমন করে উড়বো,

কেমন করে শহর ছেড়ে
সবুজ গাঁয়ে ঘুরবো!
তোমরা যখন শিখছো পড়া
মানুষ হওয়ার
আমি না হয় পাখিই হবে
পাখির মতো বন্য।'
(মনপবনের নাও' ঃ পাখির কাছে ফুলের কাছে)

Stevenson যাকে **'notes of music'** বলেছেন, অঙ্গে অঙ্গে সেই সুরের সুরভি জেগে উঠেছে আল মাহমুদের কবিতায়। তাঁর কবিতায় সুরের আবহ, গ্রাম্য লৌকিক দেশজ শব্দ ও আটপ্রহরিয়া ছন্দের মৌলিক প্রয়োগে সার্থক সৃষ্টি—

'তাঁতীপাড়ায় রাঙা মামীর
মাকুর ঠেকা ফুটছে
মেঘনা নদীর বুবুর শাড়ির
নকশা হয়ে উঠছে।'
(মন পবনের নাও')

অথবা

'কোথায় পাবো লঙ্কা বাঁটা
কোথায় আতপ চাল
কর্ণফুলীর ব্যাঙ্ ডাকছে
হাঁড়িতে আজকাল।' (ছড়া)

কবি যখন প্রথম ঢাকা শহরে এসেছিলেন-গায়ে খদ্দরের পিরহান। পরনে খদ্দরে পাজামা ও রবারের স্যান্ডেল সঙ্গে একটা ভাঙা টিনের সুটকেস, যদিও 'এক নদী' কবিতায় তিনি জানিয়েছেন 'নগরবাসী কে রাখে কার খোঁজ' কিন্তু কবি তাঁর স্বভাবধর্ম প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়েছেন—

'আমার ভাঙা সুটকেসের ভেতর আমি নিয়ে এসেছিলাম বাংলাদেশের সবগুলো নদী, পাখি, পতঙ্গ, নৌকা, নর-নারী অর্থাৎ বহমান আস্ত একটি বাংলাদেশ যা আমি নিয়ে এসেছিলাম....তা তো একটি একটি করে আমার জাতিকে আমি দেখেছি।....বহমান জীবনের সমস্ত বাস্তবতা আমার ওই....সুটকেসে ছিল। ....আমার দ্রষ্টব্য দেখে তারা কখনও হাততালি দিয়েছে, কখনও অশ্রুসিক্ত হয়েছে'। ('কবির সৃজনবেদনা')

গ্রামীণ কবি শহরে বাস করেও দুঃসহ শহুরে যুবক হয়ে উঠতে পারেননি, তাই তাঁর সহানুভূতি-স্নিগ্ধ গ্রামীণ জীবনাভিজ্ঞতার অবতারণা ঘটেছে স্বতন্ত্র মূল্যে। 'খড়ের গম্বুজ' কবিতায় জীবনায়নের যে পার্থক্য, তা সূচিত হয়েছে প্রধানত তারই অন্তর্লীন **attitude** থেকেই—

'শস্যের শিল্পীরা এসে আলের ওপর কড়া তামাক সাজালো।
একগাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে
কে যেন ডাকলো তাকে সস্নেহে বললো, বসে যাও, লজ্জার কি আছে
বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে, আমাদেরই লোক তুমি।'

তাঁর জীবনপিপাসু কবিমন মুক্তির আকাশ খুঁজে ফিরেছে আপন অজ্ঞাতেই—

'সোনালি খড়ের স্তূপে বসতে গিয়ে—প্রত্যাগত পুরুষ সেজন
কী মুস্কিল দেখলো যে নগরের নিভাঁজ পোশাক
খামচে ধরেছে হাঁটু। উরতের পেশি থেকে সোজা।
অতদূরে কোমর অবধি
সম্পূর্ণ যুবক যেন বন্দি হয়ে আছে এক নির্মম সেলাইয়ে।
যা কিনা এখন তাকে স্বজনের সাহচর্য, আর
দেশের মাটির বুকে, অনায়াসে
বসতেই দেবে না।' ('খড়ের গম্বুজ'/ সোনালি কাবিন)

প্রকৃতির রসধারায় সিক্ত আল মাহমুদের কবিতাপথ নিসর্গজ হয়েও রহস্যাবৃত্ত—

তোমার ছাদে ওঠে তো গোল চাঁদ
সাহস থাকে ঢাকো না জোছনাকে
হাঁসের খেলা ভাসায় ভরা নদী
কাটো না জল যদি বা দোষ থাকে;
রক্তলোভী আলোছায়ার ফাঁদে—
ভাঙো না কেন ভাঙতে পারো যদি।'

('দায়ভাগ'/সোনালি কাবিন)

বিশুদ্ধ কবিতার দৃষ্টান্ত কি হতে পারে সে সম্পর্কে জীবনানন্দ রেখে গিয়েছেন অনেক ইঙ্গিত—

'কবিতা রূপ পরিগ্রহ করে একটা অমেয় পরিধির ভিতর যেন—যাকে পাতালেও দেখা যায়, এবং নীলিমায়..... ('কবিতার কথা' (১৯৪৪)

জীবনের সঙ্গে কবিতা কিভাবে সম্পর্কিত, কল্পনা বা Imagination -এর সত্য কখন জীবনের সত্য হয়ে কবির অনুভূতির বিষয় হয়ে উঠছে সেসম্পর্কে কবির নান্দনিক অভিব্যক্তি—

'কবিতা কখনও কৈশোরের স্মৃতি পার হয়ে যাওয়া হাঁটুজলে নদী, কুয়াশায় —ঢাকা-পথ, ভোরের আজান কিংবা নাড়ার দহন। পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ, উঠানে ছড়ানো জাল, বাঁশঝাড়ে ঢাকা দাদার কবর, আবার কখনও বা ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর। ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, দাঙ্গার আগুনে নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।'

কবিতা নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে গ্রামীণ সংস্কৃতির চালচিত্র ভাবাবেগপূর্ণ—

'কবিতা চরের, পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম, গন্ধভরা ঘাস /ম্লান মুখ বউটির দড়ি ছেঁড়া হারানো বাছুর /গোপন চিঠির প্যাডে নীল খামে সাজানো অক্ষর /কবিতা তো মক্তবের মেয়ে দুলখোলা আয়েশা আক্তার'। ('কবিতা এমন'/সোনালি কাবিন)

আল মাহমুদের কবিতার প্রকৃতি বড়ই মোহময়ী, প্রকৃতি ও গ্রামীণ জীবনায়নের শিল্পিত ব্যঞ্জনায় তাঁর নিখুঁত শব্দচয়ন ও শব্দাবলির বিন্যাস এতটাই matured যে, কবি ও পাঠকের মধ্যে কোনা হেঁয়ালির সম্পর্ক উৎসারিত করে না। বরং তা স্বচ্ছন্দ - পরিপাটি—পরিণতমনস্ক জীবনবিন্যাসে লালিত।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' (১৯৬৩)। এছাড়া 'কালের কলস' (১৯৬৬/৬৭), 'সোনালি কাবিন' (১৯৭৩), 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' (১৯৭৬), 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না' (১৯৮০), 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' (১৯৮০), আল মাহমুদের কবিতা (১৯৮০), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৫), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৭), প্রহরান্তের পাশ ফেরা (১৯৮৮), এক চক্ষু হরিণ (১৯৮৯), মিথ্যাবাদী রাখাল (১৯৯৩), আল মাহমুদের কবিতা সমগ্র (১৯৯৪), হৃদয়পুর (১৯৯৫), আল মাহমুদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৮) ইত্যাদি।

কবিতার যাত্রাপথে আল মাহমুদ-এর ভাবনার বহুমাত্রিক বিন্যাস। নিখুঁত-মসৃণ-মিষ্টি শব্দবিন্যাসে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কবি ডুব দেন আত্মার গভীরে। তাঁর সজ্ঞান মনের চলমানতা বাস্তবকে গোচর করেই। কবিতার নির্মাণে সর্বান্তকরণেই ছিলেন আধুনিক নিজেকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

'আমি তো নিজেকে আধুনিক কবি বলে দাবি করি।
কিন্তু অন্যেরা কী বলে জানি না'।

(সাক্ষাৎকার ও আল মাহমুদ)

আধুনিক আঙ্গিক মাটির গন্ধমাখা ভাষায় যখন নারীকে আহ্বান করেন। তখন তাঁর দৃষ্টিতে—

'ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার'

নারী প্রসঙ্গে তাঁর পরিশীলিত রোমান্টিক ভাষায় ভেসে ওঠে গভীর সংবেদন—

'ভালোবাসা দাও যদি আমি দেব আমার চুম্বন
ছলনা জানি না বলে তার কোনো ব্যবসা শিখিনি।' ('সোনালি কাবিন')

অথবা,

'তোমায় নিয়ে আপন মনে খেলা
কখনো আমি খেলিনি, ভালোবাসা

লক্ষ্যহারা রাজার মতো শেষে
ধরেছিলাম জীবনপণ পাশা।'

('বুকের কাছে'/কালের কলস)

জীবনানন্দীয় জীবনচেতনা—অতিবাস্তববাদ—নান্দনিক চেতনা—আর জসীমউদ্দীনের প্রকৃতিচেতনার সমন্বয়ে দেহবাদের প্রতিষ্ঠায় কবি যেন অশাবাদী। আঞ্চলিক ভাষার পরিশীলিত প্রয়োগ তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি মেধাধর্মী — মননসমৃদ্ধ — রোমান্টিক—

'ফিরতে চাই, পাবো কি সেই পথ?
তরমুজের ক্ষেতের পাশে ঘর
লজ্জাহীনা ফাজিল ছুঁড়ি এক
ভীষণ কালো, হাসতো থর থর!
মহাকালের কালোর চেয়ে কালো
রাত বরণী রূপসী সেই পরী,
কাঁপিয়ে, কাঁখে ঠিল্লা ভরা পাণি
দেহের ভাঁজে ভেজা নীলাম্বরী—
উঠতো হেঁটে জলের ধার বেয়ে;
কালো বাউশী যেন কলমি বনে
অঙ্গ নেড়ে অস্ত গোলা জলে
দেখেছিলাম একদা কুক্ষণে'।

আল মাহমুদের নারী ভাবনার চাষ চরের মাটিতে, প্রেম ও প্রকৃতির কাব্যময় অভিনিবেশ তথা fusion এর সমন্বয়ে কবির সচেতন মনন ও মেধার দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।

'লোক-লোকান্তর', 'সোনালি কাবিন', 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না', 'বখতিয়ারের ঘোড়া'-তে মৃত্তিকাযুবতী রূপে নারীর অন্য বিন্যাস।

'কতদূর এগোলো মানুষ!
কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে
আজও উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।

('প্রকৃতি'/সোনালি কাবিন)

নদীমথিত দেশের মানুষ আল-এর কবিতায় উদাসীন মোহময়ী নারী প্রায়শই উপমিত হয়েছে নদীর সঙ্গে। তিতাসপারের কবির মানসসৌন্দর্যের উন্মোচন নদী-বৈচিত্র্যে। উন্মাদী কবিমন সঙ্গীনীকে তালাশ করে ফেরে নদীজলের জোয়ারে—

'ঝড়ের কসম খেয়ে বলো নারী, বলো তুমি কার'?

('সোনালি কাবিন')

নদীর ঢল আর যুবতীর উচ্ছলতায় কবির রোমান্টিক বিলাস—

'নদীর কথা বলা মানেই, বুকে
আস্তে নড়ে জলের ঢেউ খোলা,
তোমার নাম ভাবলে ভাসে চোখে,
বালিশে লাল গোলাপ ফুল তোলা।'

কিংবা,

'জল ছেড়ে এসো প্রবালেই ঘর বাঁধি
মাটির গন্ধ একেবারে ভালোবেসে
জল ছেড়ে আসো মাটিতেই নীড় বাঁধি
মুক্তো কুড়াতে যেয়ো না সুদূরে ভেসে।'

নদী-মাটি-নারীকে নিয়ে অনায়াসেই এক মাদকতাময় appealing-এ আল মাহমুদ স্বতন্ত্র।

আল মাহমুদ এর উপলব্ধি বহমান নদীস্রোতধারা প্রায়, অন্তরপ্রেরণাবশে যখন আত্মমগ্ন হন, তখন বাংলাদেশের দেশ-কাল-পরিস্থিতি-জটিলতা-বিঘ্নসংকুলতা তার চৈতন্যপ্রবাহকে সঞ্জীবিত করে তোলে। আত্মভাবনার রূপায়নই অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে বাক্‌প্রতিমার মর্মমূলে। অনুভূতির টানাপোড়েনে চিত্র হয়ে ওঠে কখনও সরল অথবা যৌগিক, একবুক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে উদাসীন করুণ ক্লান্তকণ্ঠে বলে ওঠেন—

'কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর
ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, নিশান
চর্তুদিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে
নিজস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।'

এইভাবেই কবিতার মধ্যে নিজস্ব জীবনের হদিশ খুঁজে ফেরেন আল মাহমুদ। কবির আত্মবীক্ষার নির্যাস, তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তি মূলক একটি প্রবন্ধে—

'কবিতাই আমার পুঁজি।....কবিতার জন্যই বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে, বেড়ানো। শহর থেকে শহরে, দেশ থেকে দেশান্তরে উড়াল।'

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন তো তার উপলব্ধির নির্ভুল অভিজ্ঞান—'তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল/রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে/তীরের ফলার নিষিদ্ধ ভাষার চিৎকার/বাঙলা, বাঙলা/এক নিদ্রামগ্ন আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করো।'

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১-এর উত্তাল বাংলাদেশ কবির নানা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির শব্দে আবেগমহিত—

‘১৯৭১ সাল।
আমি পালিয়ে এসেছি আমার দেশ থেকে।
আমার স্ত্রী কোথায় আমি জানি না। আমার, বন্ধুরা
আছে কি নেই বেতারে সেই উদ্বেগ উচ্চারিত হচ্ছে।’
(‘বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার’/মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো)

আল মাহমুদের সৃষ্টির প্রধান উপাদান, তাঁর অনুভূতি, যা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে তাঁর ভাষাচর্যার অভিব্যক্তিতে—‘আলো-আঁধারী ভাষায় আভাসে ইঙ্গিতে তিনি তাঁর হৃদয়ের কথা আধখানা ব্যক্ত করেন, বাকি আধখানা পূরণ করে নিতে হয় পাঠককে।’ (পূর্ববাংলার সাহিত্য ঃ কবিতা/হাসান মুখশিদ)

প্রতিটি শব্দের সঙ্গে ভাষার আদান-প্রদানে দেশ-কালে অনুসন্ধানের গভীর উন্মাদনায়, সতেজ অনুভূতির সচেতন প্রয়োগে, নিজস্ব ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ও পারিপাট্যহীন ভাব-ভাবনার অনুসঙ্গে তৈরী হয়ে যায় আল মাহমুদ-এর কবিতার নিজস্ব শৈলী—

.....‘কবি চলে কবির নিয়মে
শুধু খোলা চোখ দুটি আর দুটি পায়ের পিষ্টন।’

বাংলাদেশের লৌকিক বাক্‌রীতি ও দেশজ শব্দের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ-সমাজজীবনের অঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রকৃতি প্রসঙ্গে ভাবনার আবেগ-মানবজীবনের দ্বন্দ্ব কোলাহল কুশ্রীতা থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সুরভিত সৌন্দর্যময় প্রেমের হাওয়াতে অবগাহন—জীবন নিদ্রার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর সবকিছু ছাপিয়ে বাংলাদেশের একজন বোধবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন নাগরিক আল মাহমুদের চৈতন্যপ্রবাহ বহুধা বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণে রঞ্জিত। আঞ্চলিকতা ও নাগরিকতার অখণ্ড ঐক্য-প্রত্যয়ে বিজড়িত। বিশ শতকের সময়ের আকরে কবিতার এ বিপুল সাম্রাজ্যে তিনি অন্যতম নায়ক, প্রকৃতির পাঠলিপির কারিগর।

■ ড. মৌসুমী সাহা—অধ্যাপিকা ও প্রাবন্ধিক

নীপছায়া মণ্ডল

নবারুণ থেকে পুরন্দর ঃ কবির ফ্যাতাড়ু জন্ম

‘যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায়
আমি তাকে ঘৃণা করি
যে ভাই এখন নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে
আমি তাকে ঘৃণা করি—
যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানি
প্রকাশ্য পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায়না
আমি তাকে ঘৃণা করি।’[১]

কবি নবারুণের পরিচয় আমরা এইভাবে পাই। ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না।’ ১৯৮৩ সাল। কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশের আগে থেকেই এই কবিতার নামকরণ সচেতন মানুষের মধ্যে আলোড়ন ফেলে দেয়।

হিন্দী অনুবাদের সূচনায় কবি মঙ্গলেশ ডবরাল তাই লেখেন—‘রাষ্ট্রসত্তার দ্বারা সৃষ্ট আতঙ্ক এবং সাধারণ জীবনকে আমানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি করে দেওয়ার বিরুদ্ধে রাগ এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন নবারুণ।’ ‘নকশাল বাড়ির কবি’—তকমা দিয়ে দেয় কেউ। মৃত্যু, ক্ষুধা ও রাজনৈতিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সেই তাঁর যাত্রা শুরু। আজীবন দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে গেলেন একা। এই পচা সিস্টেমের বিরুদ্ধে তিনি অনায়াসে যাতায়াত করেছেন বারবার। কবিতা থেকে উপন্যাসে। উপন্যাস থেকে কবিতায়। কবিতায় তিনি বরং অনেকটা পেলব ভাষা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু উপন্যাসে অনর্গল খুলে দিয়েছেন ভদ্রতার। তাঁর উপন্যাসগুলো পড়লে বারবার মনে হতে থাকবে রাজনৈতিক লাম্পট্য বোধ হয় ড্রেন-ভেঙে ঢুকে পড়ছে ভদ্রলোকের বাড়িতে। অথচ কবিতায় তিনি সর্বহারার পক্ষে সবসময়। ‘শীতে জমে মরে যাওয়া ভিখিরির গান’ কবিতায় লিখছেন—

‘এন. জিও-রা কি জানে যে আমার
আর দরকার নেই সহৃদয় কম্বল
বা সাহেবদের বাতিল জামার
সবারই কি শীত করছে এমন না শুধুই আমার।’

চেতনালুপ্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বোধ হয় কমিউনিজমে বিশ্বাস করতেন। বিভিন্ন প্রতীকে তিনি সেই বিপ্লবের কথা বলেছেন বারবার।

‘সাধকের কাছে প্রশ্ন’ কবিতায় লিখেছেন—

‘মানুষ যদি বিদ্রোহ করতে ভুলে যায়

তখন তাকে মনে করিয়ে দেওয়া কি পাপ?....
কত জায়গায় তো ফেলি আমি দেশলাই
একবারও ভুল করে নয়
যদি কেউ আগুন জ্বালায়।'

'একটা ফুলকির জন্যে' কবিতায় ফুলকির স্বরূপকে তিনি এভাবেই দেখান—

'একটা কথায় ফুলকি উড়ে শুকনো ঘাসে পড়বে কবে
সারা শহর উথালপাথাল, ভীষণ রাগে যুদ্ধ হবে
কাটবে চিবুক চিড় খাবে বুক
লাগাম কেড়ে ছুটবে নাটক
শুকনো কুয়োয় ঝাঁপ দেবে সুখ
জেলখানাতে স্বপ্ন আটক
একটা ব্যথা ঝর্ণা হয়ে মৌচাকেতে বিঁধবে কবে'[২]

জীবনানন্দের অনুষঙ্গ এলেও সমকালকে ছুঁতে চান, এবং অবশ্যই তাঁর কবি দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে পড়ে খেটে খাওয়া, বঞ্চিত ল্যাথখোর মানুষের সহসাথী হিসেবে। জীবনানন্দ 'রাত্রি' কবিতায় যে কুষ্ঠরোগীর জল চেটে নেবার কথা বলেছিল নবারুণ যে সেই কুষ্ঠরোগীর জবানিতে বলে—

'আমার এ কুষ্ঠরোগ
সারানো কি কলকাতা শহরের কাজ
যার হাইড্রেনে জল নেই।
তাই আমি অকুতোভয়ে
চেটে নিই তেজস্ক্রিয় ধুলো
জিভের ঝাড়নে
যাতে করে টেবিল
সব সময় ফিটফাট থাকে.....'[৩]

নবারুন ভট্টার্যের যে কয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত তাদের মধ্যে অন্যতম হল 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'; 'পুলিশ করে মানুষ শিকার', 'রাতের সার্কাস' এবং 'মুখে মেঘের রুমাল বাঁধা'। তবে একথা মেনে নিতে হবে যে কবি হিসেবে তাঁর যতটুকু পরিচিতি তার চেয়ে বেশি পরিচয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে। এক অদ্ভুত কলকাইত্যা কলোকয়াল ভাষা—যেটা আসলে কলকাতার নিজস্ব। যে ভাষা আমরা অহরহ শহরের অলিগলি, বেশ্যাপল্লি, মদের ঠেক, সস্তা সিনেমা হল, রিকসাওয়ালাদের আড্ডায় শুনতে পাই। কিংবা বলা যায় শুনতে পেয়েও, ভদ্দরলোকের মতো কালো আঙুল ও নাকে রুমাল চেপে চলে আসি—সেই ভাষাকে তিনি তাঁর গদ্যে বারবার ধরতে চেয়েছেন।

হুতোমি ভাষা বা সধবার একাদশীর ভাষার এটা অনেকটা একবিংশ যুগচিত রূপ। হয়তো পার্কস্ট্রিটীয় আধুনিকতা আর কলেজস্ট্রিটীয় জ্ঞানমার্গে সেই ভাষাকে অনেক সময় 'খিস্তি' মনে হবে। কিন্তু নবারুণ এক্ষেত্রে কোনো রকম পেলব-সাহিত্যিক ভণ্ডামির আশ্রয় নেননি। আসলে এক পচনশীল জাতির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি হয়তা বলতে পারতেন—'আমি দেখেছি আমার প্রজন্মের ভালো মনগুলো পাগলামিতেই শেষ হল নগ্ন বিকারগ্রস্ত ক্ষুধার্ত প্রজন্ম'।[৪] তিনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন কর্পোরেট নির্ভরতাকে। 'কর্পোরেট দায়বদ্ধতা' আসলে যে সেমিনার পারথবাটি তিনি সেকথা হাড়ে হাড়ে জানতেন, লিখছেন—

'আমি একটি ইতরের দেশে থাকি
যেখানে অবশ অক্ষরমালা
কবিরা গরু হয়ে যায়
উল্টোটাও যে হয়তো এমনও বলা যায় না
আমার ভাগ্য আমি নিজেই ভেঙেছি
তাই বাতিল স্টিমরোলারদের
কাছে বসে থাকি
বসে থাকি আর
রাস্তা বানাবার গল্প শুনি"

কবি যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তাঁর অনেক দায়বদ্ধতা থেকে যায়। প্রথম দায়বদ্ধতা এই যে শাসকের ভুল শুধরে দেওয়া গোলামি করা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে বিরুদ্ধাচরণ করা। মহৎ রাষ্ট্রের একটা অংশ হিসেবে কবি হয়ে ওঠে জনগণের চোখ, কান ও কণ্ঠ। অবশ্য সব কবির ক্ষেত্রে যে সেই দায়বদ্ধতা থাকবে তেমন নয়। নবারুণ প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে এতটুকুও সরে আসেন নি। তাই তিনি যে বাতিল 'স্টিমরোলারের' পাশে বসে অপেক্ষা করেন, রাস্তা বানাবার, আর ক্রমশ হয়ে ওঠেন 'বারুদ মানুষ'।

উপন্যাসে যে চরিত্রগুলো নির্মাণ করলেন, অনেক ক্ষেত্রে তারা বিচ্ছিন্নভাবে আসেনি। কবি নবারুণের টুকরো টুকরো রূপ পেয়েছে এক একটা চরিত্র। 'হারবার্ট' থেকে 'কাঙাল মলিসাট'—সব আখ্যানের মধ্যে একটি করে কবি ঢুকে বসে থাকছে। যেমন করে রবীন্দ্রনাথ নিবারণ চক্রবর্তী ও অমিতকে নির্মাণ করেন, যেমন করে জীবনানন্দ নির্মাণ করে মাল্যবানকে, জয়গোস্বামী যেমন করেন অরণিকে, নবারুণ নির্মাণ করে তার পুরন্দর ভাটকে। পুরন্দর ভাট-একেবারে এই সময়ের কবি। যার ভাষা সহজ, সরল কিন্তু শাণিত। যরি কবিতায় ঢুকে পড়ে বস্তির গালাগালি, চলতি শব্দ। অবশ্য পুরন্দর ভাট এমনি এমনি তৈরি হয় নি, এর একটা ধারাবাহিকতা আছে কোথাও। নবারুণের পিতামহ

মনীশ ঘটক ওরফে 'যুবনাশ্ব' 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' নামে যে উপন্যাসটি লেখেন সেখানে এক ভবঘুরে পাগল কবিকে দেখি উদ্ভট সব কবিতা লিখতে স্ল্যাং ভাষা মিশিয়ে। নবারুণ যখন হারবার্ট লিখছেন (১৯৯৩ সাল) তখনও তিনি হারবার্টের মধ্যে সেই পাগলাটে ভঙ্গি নিয়ে এলেন। হারবার্টের ধনদাদার বউয়ের কাছে মেয়েরা রান্না শিখতে আসে। সে দৃশ্য দেখে হারবার্ট কবিতা লেখে—'ধনদাদার হলঘরে
কেন্নীরা খল্‌বল্‌ করে।"

পুরী বেড়াতে গেলে অনেক চাঁদু ঘোষও কবি হয়ে যায়। হারবার্টও কবি হবে এতে আশ্চর্য কী; পুরীতে এসে সে একের পর এক কবিতা লিখতে থাকে।

ক. বাংলার পরে আছে উড়েদের দেশ।
রোজরাতে যায় তথা পুরী এক্সপ্রেস
খ. 'ঐ এল ঢেউ/ঐ গেল ফিরে
অবিরাম আসা যাওয়া সাগরের তীরে।'
গ. স্থলবায়ু বহে বেগে/জলবায়ু ভালো নয়
অক্টোপাশের ভয়/কি হয়, কি হয়।
ঘ. টুপিধারী নুলিয়ার রগুড়ে জীবন
কোনোই খরচা নাই প্যান্ট ও জামায়
সারাদিন জলে নেমে করে হুটোপাটি
লুটোপুটি করে আর পয়সা কামায়।'

এ হেন কবি হারবার্টের কাব্যচর্চার ভাষা পড়ে। লেখক স্বয়ং হারবার্টের প্রতিভার পাংচার হয়ে যাবার সংবাদ আমাদের পরিবেশন করেছেন। কবিতা লেখার বিষয় যেন হারিয়ে যেতে লাগে। সেই কবিতার নিদর্শন রয়েছে দুটি—

ক. ফুটপাথে ফুটপাথ
ভুট-ভুট-ভুট
ধননা অপিসে যায়
পায়ে গামবুট।'
খ. কী গরম পড়েছে যে উঃ
আরশোলা কানে করে কুঃ।

শুধু ছন্দ মিলের খাতিরে নয় হারবার্টের ভিতরের সেই নিঃসঙ্গ খ্যাপাটে মানুষটাকে ভর করার তাগিদ থেকেও এই কবিতার দরকার ছিল। শুধু খ্যাপাতো নয়; ফাজিলও বটে তাই বৃষ্টি ভেজা ঝিদের দেখে রবীন্দ্র ঘরানায় সে গেয়ে ওঠে—

'তোমরা ভিজছ কেন গা
ভিজে গা

তোরা ভিজবি কেন লো
গা এলো।'

এবং সবশেষে অমৃক সিং অরোরার গানের লাইন ঢুকিয়ে দেন—

'আমাকে তোমার
কাজললতার কালি করো।'

প্রতিভা থেকে পতিত, ভূত দর্শনের বিশ্বাস থেকে পতিত হবার পর হারবার্ট সুইসাইড করল। সুইসাইড নোট হিসেবে বুক পকেট থেকে বেরিয়ে এলো অদ্ভুত একটি কবিতা—

'চৌব্বাচার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল
দোবেড়ের চ্যাং দেকবি? দোবেড়ের চ্যাং
দেকাব? ক্যার্ব ব্যাটওয়াডার ডগফিস।'

সুইসাইড নোট হিসাবে কবিতা লিখে যাওয়ার নিদর্শন আমাদের হাতে বাস্তবেও আছে। কবি অধ্যাপক অচ্যুত মণ্ডল। তিনিও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতেন। অচ্যুত বলতেন—'আত্মহত্যাই চূড়ান্ত স্বাধীনতা।' সুইসাইডের পর যে কবিতাটি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় সেটি নিম্নরূপ—

'একটা কথা বললে বেরিয়ে যাব এ্যকখুনি
অটো করে চাঁদে চলে যবো।
এতদিন চাঁদে যাইনি কেননা
বুড়িদের চরকা কাটা আমার পছন্দ হয়না
দেশাত্মবোধক জোচ্চুরি বলে মনে হয়।
এখন চাঁদে জল আছে
আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে আজ রাত্রে
রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি তাই
কখন একটা অটো আসবে—অটো চেপে চাঁদে যাবো।'[৫]

চলে যাবার এই সুতীব্র বাসনা হারবার্ট আর অচ্যুত মণ্ডলে এসে কবিতার রূপ নেয়। হয়তো কাকতালীয় ভাবে এই সমাপাতন।

নবারুণ যখন 'ভোগী' উপন্যাস লিখছেন সেখানেও মিছিল চরিত্রের মধ্যে নিজের কবি সত্তাকে তুলে আনলেন। 'জুরাসিক পার্ক' সিনেমা দেখে মিথিল কবিতা লিখেছে—

'মনে পড়ে মিমি মেমারিতে নেমে
খুঁজেছিলে তুমি সালামি এবং
বার্বি পুতুলী পোষাকবিহীন
ঘড়িতে নাইটি একটায় ঢং

মথরেণু মেখে করেছিলে গান
আমার জবাব—কি লেসবিয়ান।'[৬]

আমরা দেখতে পাবো কবি নবারুণের সঙ্গে তাঁর তৈরি কবি চরিত্রদের কবিতার মধ্যে অনেক ফারাক। তবে ফ্যাতুড়ু কবি পুরন্দর ভাট নির্মাণ বোধ হয় তাঁর জীবনের অন্যতম মাইলস্টোন। প্রথম দিকের ছোটোগল্পে মদন ও ডি. এস. —এই দুজন ফ্যাতুড়ু থাকলেও 'কাঙাল মলিসার্ট' থেকে পুরন্দরের আবির্ভাব। একদিন সাক্ষাৎকরে তিনি বলেছেন—"আমি নিজেকে প্রান্তিক বলে মনে করি এবং এতে আমার কিছু এসে যায় না। রিয়েল লাইফে ফ্যাতাড়ুর মত প্রথা ভাঙতে তো পারিনা, তাই ফ্যাতাড়ুদের সৃষ্টি করি।" সরাসরি বলার দায়ভাগ থেকে বেরিয়ে এসে অন্য চরিত্রের মুখ দিয়ে কথা বললে তার মধ্যে একধরনের নিরপেক্ষ দূরত্ব তৈরি হয়। পুরন্দর ভাট নবারুণের মুখের অর্গল খুলে দেয়। শ্মশানঘাটে বসে পুরন্দর কবিতা লেখে—

'কত না ফুলের তোড়া
কত ফটো তোলা তুলি
ভাঙিলে লাগে না জোড়া
কত বৃথা কোলাকুলি।'....
টুটিছে কত না জোড়া
ফুটিছে কত না শাঁখা
বড় বাবু ও বেয়ারা
দেখি পাশাপাশি রাখা।'

তিন ফ্যাতাড়ু বস্তীবাসী মাতাল হলেও কবিতার সমঝদার এরা। কবিতা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। পুরন্দর একবার একটা কবিতা লেখে, যার নাম—'যার যা কাজ।' ডি. এস. অমনি বলে ওঠে—'ওরকম নাম কবিতায় চলে না। 'যার যা কাজ'। দেখলেই লোকে পাতা উল্টে চলে যাবে।'

পুরন্দর কবিতাটা পাঠ করে—

'শশধর ধরেছে শশক
মহীতোষ মেরেছে মশক
উভয়েই স্ব স্ব কাজে পটু
পেট থেকে বাড়া ইস্তক।'

এই কবিতা শুনে ভদি বলে—'বাঃ বাঃ বেড়ে হয়েছে। এই এই হল কবিতা। রস আচে, অলঙ্কার আচে, গভীর অর্থ আচে, চনমনে ছন্দ আচে। এই নাহলে পদ্য। আজকাল কী সব বালের ছাল লেখা, কোনো কাক-কাঁকুড় বালাই নেই।' সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি পুরন্দর স্লোগানের মতো তুলে আনে—

'বাগানে শোভিছে কত
সি. পি. এম ফুল
তলায় ঘাপটি মেরে
বাড়ে তৃণমূল।'

বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে চূড়ান্ত ব্যঙ্গ—'কী নির্জীব, কী নির্জীব/ নির্ঘ্যাৎ ওটি বুদ্ধি জীব।'

পুরন্দর ভাটও ব্যর্থ হয়ে সুইসাইড করেছে বলে খবর রটে ছিল। তার লাশ পাওয়া যায়নি যদিও। দেওয়ালে টাঙানো তার ছবিতে মালা পরানো ছিল। তলায় ছিল একটি কবিতা সুতো দিয়ে বাঁধা। কবিতাটির নাম 'চুতিয়া পৃথিবী' নামের তলায় কবির নাম পুরন্দর ভাট (১৯৪৮-১৯৯৯)। কবিতার ছত্রে ছত্রে ব্যর্থতা ও হতাশা—

'আমার জীবনে নাই কেন কোনো ড্রিম
তাই দিব আমি কার্পাস ক্ষেতে হামা।
আমার জীবনে পাই কেন কোনো ড্রিম
টিকটিকি আমি, পোকা খাই, পাড়ি ডিম
আমার মরণে হয়নাতো হেড লাইন
প্রাসাদ গাত্রে মুতিয়া ভাঙিব আইন।'

পুরন্দর ভাট কবিতার একটি লবজ-যে ভাষায় কেউ কোনো দিন কবিতা লিখবে না। সেই ভাষাতে তুলে ধরি। এর মধ্যে রয়েছে ননসেন্স ও স্ল্যাং। সুকুমার রায়ের পর ননসেন্সকে এই ভাবে বাংলা কবিতায় ছড়িয়ে দিতে আর কেউ পারেনি, পারবেওনা। যে ধরনের কবিতা পুরন্দর লেখে সে কবিতা জীবনানন্দ সভাঘরে ঠাণ্ডা মঞ্চে পাঠ করলে লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। আকাদেমির সভা ঘরে পাঠ করলে লাথিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারে। এ কবিতা পথের ধারে মর্যাদা পায়। স্ল্যাংকে কত অদ্ভুত উপায়ে কবি পুরন্দর ওরফে নবারুণ ব্যবহার করেন তাঁর কবিতায়, তা মুগ্ধ হয় দেখতে হয়।

'উড়িতেছে ডাঁস, উড়িছে বোলতা, উড়িতেছে ভীমরুল,
নিতম্বদেশ আঢাকা দেখিলে ফুটাইবে তারা হুল।
মহাকাশ হতে গু-খেকো শকুন হাগিতেছে তব গায়,
বাঙালি শুধুই খচ্চর নয়, তদুপরি অসহায়।'
লেখে 'দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদ
এই মূলো এই পাদ
সিপিএম-তৃণমূল লীলা
নীরবেতে কাজ সারে
দেখে যায় আড়ে আড়ে
জলে ডুব দিয়ে গডজিলা।'[৭]

স্বপ্নময় চক্রবর্তী নবারুণ সম্পর্কে একটি যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন, তিনি নবারুণের দেহত্যাগের পর লেখেন—'নবারুন চেয়েছেন ওঁর কথাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাক, আর সেই গুড়ো ছাই ঝরে পড়ুক সাফ চকচকে গাড়ির বনেটে, গার্ডেন পার্টির ঝিঙ্কু টেবিলের খাবারের ওপর। ছাই ঝরুক ইজ্জতের গায়ে।".... নবারুণ কথা বলেছেন উচ্চ উচ্চারণে, কবিতায়, গল্প-উপন্যাসে। জিরাফ যদি কথা বলতে পারত, উঁচু থেকেই বলত।'[৮]

ফ্যাতাড়ু কবি পুরন্দর আর ফিরবে না হয়তো। যদি আমাদের বোধের জানালা খোলা থাকে হয়তো দেখব তার শিকধরে দাঁড়িয়ে আছে পুরন্দর। হয়তো স্বপ্নে এসে শুনিয়ে যাবে তার নতুন কবিতা। চোখ মেলালেই শুনতে পাবো—'ফ্যাৎ ফ্যাৎ সাঁই সাঁই।'

তথ্যসূত্র ঃ

১। এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না—প্রথম প্রকাশ—'এই দেশ এই সময়', ১৯৭২।
২। একটা ফুলকির জন্য; এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'—নবারুণ ভট্টাচার্য, ১৯৮৩।
৩। কুষ্ঠরোগীর কবিতা; এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না—ঐ
৪। অ্যাল্যেন গিন্‌সবার্গের 'হাউল' কবিতার বাংলা অনূদিত কটি লাইন।
৫। ওয়েবজাইন 'মিলন সাগর' থেকে অচ্যুত মণ্ডলের কবিতা সংগৃহীত।
৬। ভোগী; উপন্যাস সমগ্র—নবারুণ ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং; ১৩৭২
৭। সুশীল সমাজে ফ্যাতাড়ু; ফ্যাতাড়ুর কুম্ভীপাক—নবারুণ ভট্টাচার্য, দে'জ
৮। বিষন্ন মন্থনে; স্বপ্নময় চক্রবর্তী, গল্পপাঠ ঃ কথা সাহিত্যের অন্তরসূত্র, ৯ আগস্ট, ২০১৪

■ নীপছায়া মণ্ডল—অধ্যাপিকা ও প্রাবন্ধিক

রিজওয়ানা নাসিরা

কবি রাম বসু ঃ মানবতাবাদী ও প্রতিবাদী কবি

বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী কবি হিসেবে যাঁদের নাম আছে তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কবি রাম বসু। চল্লিশের-পঞ্চাশের দশকের বলিষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি স্মরণীয়। তাঁকে একজন বিশুদ্ধ সাম্যবাদী কবি হিসেবে স্বীকার করতেই হবে। রাজনৈতিক ভাবনা ও সমাজ-সচেতনতা তাঁর কবিতার অবলম্বন। তিনি মনে করতেন কবিরা কবিতার মাধ্যমে দেশ, সমাজ, জাতির ও রাষ্ট্রনেতাদের ভুল ধরিয়ে দিতে পারেন। মানুষের শুভ চৈতন্যবোধকে জাগিয়ে তোলাই কবির কাজ। তাঁর কবিতায় সেই ভাব-ভাবনা স্পষ্ট। তিনি জীবনদর্শনে বামপন্থী এবং কবিস্বভাবে জীবনদরদী মানবতাবাদী কবি। জনতার সঙ্গে মিশে যাওয়াতেই তাঁর আনন্দ। তিনি তাঁর কবিতায় নানাভাবে মানুষের শক্তিকেই চিনিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মানুষই তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু। কবি বিষ্ণুদের মতোই তিনিও প্রকৃতি ও মানুষের মিলিত সত্তায় মানবাত্মার জয়মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। কবি বিষ্ণুদের মতোই তিনিও সংবেদশীল মনের কবি। বিষ্ণুদেরই আদর্শ ও কাব্য ভাবনাকে সামনে রেখেই তাঁর কবিতা রচনা শুরু। তাই শত জ্বালা-যন্ত্রণায়, বেদনায় হতাশায় বিধ্বস্ত হয়েও তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন; সংগ্রামী চেতনায় মানবিক চৈতন্যের জাগরণে মানব সমাজের পরিবর্তন ও বিশ্বমানবাত্মার মুক্তি কামনা করেছেন। মানবতাবাদ ও গণ-আবেদন তাঁর কাব্য-কবিতার মূল বিশেষত্ব।

কবি রাম বসু জন্মেছেন ১৯২৫ খ্রীঃ ২৪ পরগণা জেলার তারাগুনিয়া গ্রামে। জন্মসূত্রে পল্লীবাংলার নিসর্গ প্রকৃতি, নদ-নদী প্রভৃতির বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্য-কবিতার রসদ জুগিয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল—'তোমাকে' (১৯৫০), 'যখন যন্ত্রণা' (১৯৫৪), 'দৃশ্যের দর্পণে' (১৯৫৬), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৫৭), 'অন্তরালে প্রতিমা' (১৯৬৫), 'হে অগ্নিপ্রবাহ' (১৯৬৭), 'মলিন আয়না' (১৯৬৯), 'কানামাছি' (১৯৭২), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭২), 'সময়ের কাছে সমুদ্রের কাছে' (১৯৭৯), 'মন্ত্রখুঁজি' (১৯৮১), 'দুটি কাব্য নাটক ও কিছু কবিতা' (১৯৮৫) প্রভৃতি।

কবি রাম বসুর 'তোমাকে' কাব্যগ্রন্থে যন্ত্রণা, ক্রোধ ও প্রতিরোধ ব্যক্ত হয়েছে। 'যখন যন্ত্রণা' ও 'দৃশ্যের দর্পণে' কাব্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বের ভারতভাগের যন্ত্রণা তীব্রতর ভাষায় প্রকাশিত। তবে নৈরাশ্যজনিত হাহাকার নয়, চরম আশাবাদ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যন্ত্রণার পাঁক ঠেলেও কবি মানুষের সুখ-শান্তি খুঁজেছেন। আর তাই তিনি 'নৈঃশব্দের দেশ' কবিতায় বলেছেন—"হে আমার দেশ আমার জন্ম-জন্মান্তরের সার্থকতা।"

'অন্তরালে প্রতিমা', 'হে অগ্নিপ্রবাহ' কাব্যে এবং 'মলিন আয়না' কাব্যনাট্যে সমগ্র

দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রকাশিত হয়েছে। তখন ১৯৬২তে চলছিল ভারত-চীনের যুদ্ধ, ১৯৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও ভাগ হওয়া। এই সময় নীতি-আদর্শ-লক্ষ্য কী হওয়া উচিত সে ব্যাপারে কবি-মনও আলোড়িত। অসহিষ্ণুচিত্তে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন—'নিজের হাঁটু ছাড়া আর ভরসা করতো কিসে?' মানুষের প্রতি ভরসা ও আস্থা রেখেও যেন তিনি দোদুল্যমান। তাই তিনি অন্তরালে খুঁজেছেন অন্বিষ্ট প্রতিমাকে।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে তৈরী হয়েছে যুক্তফ্রন্ট, হয়েছে নকশাল আন্দোলন ও গুপ্তহত্যা, পুলিশের অত্যাচার-অনাচার-অবিচার, জন্ম নিয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসহীনতা, একে-অপরকে দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে। এই সময়পট ধরা পড়েছে কবির ''সময়ের কাছে সমুদ্রের কাছে' কাব্যগ্রন্থে। সময় চেতনার সঙ্গে কবির গভীর জীবনবোধও মিশে আছে এই কাব্যগ্রন্থে। 'যার শেষ নেই' কবিতায় কবির হত্যা, যন্ত্রণা, বিষাদ এবং আত্মপ্রত্যয় সুন্দরভাবে প্রকাশিত এবং সেই সঙ্গে সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর মানবিকতা ও জীবনমুখিনতাও সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলেছেন—

"আমি সাহসের কণ্ঠ আবিষ্কার করতে চাই।
আমি বলতে চাই আমি বজ্র আমি পল্লব।
.....
আমি নতুন মানুষ চাই, নতুন মানুষ।"

—এই 'নতুন মানুষ' হল মানবিকতা সম্পন্ন মানুষ, বিবেক-জাগ্রত মানুষ। আজীবন তিনি এই মানুষেরই খোঁজ করেছেন।

'মন্ত্র খুজি মাটিতে আকাশে' কাব্যনাট্যে কবি বাঁচার কথা, জীবনের গভীর অর্থ সন্ধানের কথা নানাভাবে বলেছেন। কবি জাগাতে চান দংশিত বিবেককে, ভিতরের মানুষটাকে; 'বাঁচার ভ্রান্ত অর্থ' ফেলে তিনি 'উজ্জ্বলঅর্থ' খুঁজতে চান। তাই তিনি বলেছেন—

"আমাদের নতুন পাঠ নিতে হবে
নক্ষত্রের কাছে
মৃত্তিকার কাছে
সময়ের কাছে"।

তিনি আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন নতুন পৃথিবীর, নতুন মানুষের ও নতুন জীবনের।

কবি রাম বসু সময়-সচেতন কবি। এক এক সময়, সময়ের অভিঘাত তাঁর কবিতার রসদ জুগিয়েছে এবং সেই সময়োপযোগী শাশ্বত কবিতা রচনায় তাঁর যশ ও সিদ্ধি। সময়োপযোগী কবিতা লিখে তিনি যেমন শিল্পীর দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন, তেমনি আবার আত্মানুসন্ধানও করেছেন। তিনি তাই 'সময়ের কাছে দায়বদ্ধ এক কবি'। শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"চল্লিশের দশক রাম বসুর জীবনের সেরা সময়। অগ্নিগর্ভ চল্লিশের দশক তাঁর কবিতার উন্মেষকাল। সেই সময়ে রাম বসুর কবিতা দুরন্ত আশা ও আবেগে ঝলসে উঠেছিল।" (সংকেত ঃ রামবসু সংখ্যা, ২০০০)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মানবের রক্তাক্ত দানবীয় লীলায়, মন্বন্তরে বুভুক্ষার যন্ত্রণার্ত চিৎকার, মারী-মড়কে মরণোন্মুখ সময়ের প্রেক্ষাপটে রামবসু বাংলা কবিতায় নতুনত্বের বীজ বপন করেছিলেন। মানুষের পক্ষ নিয়ে মানুষের দরবারে মানবতার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া কবিতার অন্য কোনো সদর্থক ভূমিকায় আস্থা ছিল না তাঁর। সময়ের বিপন্নতার মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংকল্পেই তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিল বাঙ্ময়। মানবতাবাদী কবি রামবসু মানুষের মানবত্ব ও বিবেককে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন মানুষের 'চেতনা'র জাগরণ ঘটলে সে প্রতিকূল সমস্যা প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেতন হবে এবং প্রতিরোধ করবে—যা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মূল কথা। রাম বসুর ''তোমাকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে' কবিতায় কবির সেই জীবনদর্শনের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। সমাজে নিজের প্রাপ্য বা অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মূল সুর এই কবিতাটিতে স্পষ্ট। জীবনবাদী ও মানবতাবাদী কবি রাম বসুর প্রতিবাদী ও সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে এখানে। কবিতাটির কথক সম্ভবত কবিই—যিনি খেটে খাওয়া সাধারণ সবহারা মানুষের একজন প্রতিনিধি হিসেবে এখানে থেকেছেন। সাধারণ সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের বিপন্ন ও বিপর্যস্ত অবস্থা কাটিয়ে মুক্ত ও সুখানন্দময় জীবন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এবং আত্মশক্তি জাগরণের কথা এখানে বিঘোষিত।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও স্বার্থপর মানুষের লোভানলে সর্বহারা মানুষ অন্ন-বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে। এই কবিতায় কবি তা স্পষ্ট করেছেন সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে—

"আমাদের পেটে তো ভাত নেই
পরণে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও,—"

শুধু 'না'-এর 'হ্যাঁ' মুখে ধ্বংস হতে থাকে এইসব সর্বহারার দল। কবি বিশ্বাস করেন—এই অবস্থার পরিবর্তন হবেই। তাই তিনি বলেন—

"শোন—
বাইরে এসো
বাঁকের মুখে পরাণমাঝি হাঁক দিয়েছে
শোন—বাইরে এসো।"

'বাঁকের মুখে' অর্থাৎ পরিবর্তনের সূচনা এবার। কালের চক্রে এবার পদদলিতদের উঠে দাঁড়াবার সময় এসেছে। এই 'পরাণ মাঝি' Symbolic বা প্রতীকী নাম। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সুপ্ত আছে পরাণ মাঝি বা পরম ত্রাতা বা আত্মশক্তি বা আত্মবোধ। যার

আহ্বানে আমরা জেগে উঠি। সময়ের বা যুগের বিবেক এই পরাণ মাঝি। এর ফলে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সাধারণ মানুষ সোচ্চারে বলতে পারে—

"আমরা হেরে যাব না
আমরা মরে যাব না
আমরা ভেসে যাব না।"

—এইভাবেই কবি রাম বসু অপরাজেয় মানুষের জয় ঘোষণা করেছেন। নানা প্রকারের শাসন শোষণ ও ত্রাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের চেতনার জাগরণ এবং সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়াসের মধ্যেই নিহিত আছে 'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে'—এর গূঢ় গভীর ব্যঞ্জনা, কবি বলতে চেয়েছেন জীবনের দুর্যোগ-দুঃ সময়কে এড়িয়ে নয়, তাকে সহ্য ও বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চললে আত্মশক্তি জাগরণে সমস্যা ও সংকট মুক্ত হওয়া যায়।

কবি রাম বসু সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। আর মানবিক সামাজিকতার কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন বলেই তাঁর কবি-মানসিকতায় ছিল সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি। তাই সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে তিনি সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন সুন্দর' কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে। তিনি নিজের দেশকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই দেশের উদ্দেশ্যে বলতে পেরেছিলেন।

"আমার হৃদয় স্পন্দন তোমার পদধ্বনি।
হে আমার দেশ আমার জন্ম-জন্মান্তরের সার্থকতা।"
('নৈঃশব্দের দেশ', 'যখন যন্ত্রণা')।

মানবাত্মার বিনষ্টি দেখে তিনি বেদনাহত হয়ে প্রতিকারের পথ খুঁজেছেন। সেদিক দিয়ে তাঁর মধ্যে অনেকটা জীবনানন্দীয় মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়।

১৯৩৯-৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, '৪৩-এর বন্যা, '৪৪-এর দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর, '৪৬'-এর দেশভাগ—বাংলাভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বাধীনতার নামে দেশী পুঁজিপতিদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর, তেভাগা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, পুলিশী তাণ্ডব মানবাত্মার অপমান, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অবক্ষয়, জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি তাঁর কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে তিনি 'সময়'কে তাঁর কবিতায় শাশ্বত রূপ দিয়েছেন। এই সময়পটে তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে প্রাকৃতিক নির্মল উদ্দীপ্ত জনজাগরণের উচ্ছ্বাস। তিনি শত যন্ত্রণা ও বেদনা-বিধ্বস্ততার মধ্যেও প্রকৃতির সহজাত সৌন্দর্য বিনষ্টির কথা ভাবতে পারেননি। তাঁর কাছে প্রকৃতি যেন এক জীবনদায়িনী ঔষধ, প্রেম ও ভালবাসার শুদ্ধসত্ত্ব। কৃষকদের উপর জমিদার, জোতদার, মজুতদার, আড়তদারদের অত্যাচার ও অবিচার তাঁর কবিতায় বাণীরূপ পেয়েছে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো তিনিও ছিলেন সর্বহারা ক্ষুধার্ত মানুষের সহমর্মী কবি।

কবি রাম বসুর কাছে কবিতা ছিল সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার। সমাজ থেকে অত্যাচার-অনাচার, শোষণ-বঞ্চনা দূর করতে মানুষকে সংঘবদ্ধ করার দায় গ্রহণ করেছিলেন তিনি। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ায় তিনিও মনে করতেন সমাজে দুটি শ্রেণী আছে—শোষক ও শোষিত। শোষকের কবল থেকে শোষিতকে মুক্ত করতে, শোষিতকে অধিকার-সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি কবিতা লিখেছেন। তিনি মনে করতেন মানুষ অমিত শক্তির অধিকারী। তাঁর সাহস ও শক্তির প্রচণ্ডতাকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই জয় ও সার্থকতা নিশ্চিত আসবে। ভাবনায় ও কর্মে তিনি মেহনতী মানুষের দুর্ভোগ ও সংগ্রামের সঙ্গে সহৃদয়তার সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। তিনি মনে করতেন 'কবি সময়ের দংশিত বিবেক'। তাই শুধু আনন্দ আস্বাদনের জন্য তিনি কবিতা লেখেননি, লিখেছেন সমাজ-পরিবর্তনের অব্যর্থ লক্ষ্যে। আর এই কারণেই তিনি রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে অন্য এক স্বতন্ত্র কবি।

তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল সুগভীর। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনিও নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন প্রকৃত জীবনদেবতার কবি রূপে। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি বুঝেছিলেন প্রকৃতি আছে বলেই জীবন সুন্দর ও মনোহর। তিনি প্রকৃতির উচ্ছ্বলতায় পেয়েছেন প্রাণের উচ্ছ্বলতা ও মানবসভ্যতার প্রাণোন্মাদনা। তাই ভেঙে পড়া মূল্যবোধের সময় সংকটেও তিনি জীবনরসের এক প্রেমিক কবি। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লেখা 'ভাষণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার্পণ করে প্রার্থনা কামনা করেছেন—

"আমার প্রণাম নাও রবীন্দ্রনাথ
আমাকে আশীর্বাদ করো রবীন্দ্রনাথ।"

এই 'ভাষণ' কবিতাতেই কবি তাঁর কাব্য রচনাকালীন বা কাব্যারম্ভকালীন পটভূমি প্রকাশ করেছেন—

"আমি যখন লিখছি
তখন মানুষ পশুর মতো বিতাড়িত হচ্ছে গ্রামান্তে
মার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে সঙ্গীন বিদ্ধ হচ্ছে
বস্তিতে লাইনে জন্তুর দাপটে আগুন ঠিকরে উঠছে
আমি যখন লিখছি
প্রত্যেক নিঃশ্বাসে হলুদ পাতার মতো মৃত্যু ঝড়ে পড়ছে।"

বক্তব্যের দিক দিয়ে তাঁর কাব্য-কবিতায় দুটি বৈশিষ্ট্য মূল কথা। যথা—(১) অরাজকতাময় শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম এবং (২) প্রেম। মানবপ্রীতির ফলে তাঁর কবিতার মূল বক্তব্য হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী অভিযান। প্রেম ছাড়া কখনোই বিপ্লব বা বিদ্রোহের মানসিকতা আসে না। তাই তাঁর এই প্রেম ও সংগ্রাম

অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই তাঁর কাব্য-কবিতা শুধু মননের সামগ্রী নয়; মন ও মননের নিবিড় মিলনে গড়ে উঠেছে তাঁর কাব্যাঙ্গিক। তাঁর কবিতার বেশিরভাগটাই নাটকীয় একোক্তির (Monologue) মতোই—কবি নিজের বা কবিতার মধ্যে নিহিত বক্তার উক্তি যেন। নাট্যগুণ, নাটকীয় চমক তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে সরস ও আকর্ষণীয়। সর্বোপরি বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা,আবেগ ও আবেশ তাঁর কবিতাকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। তাঁর কবিতার মূল সুর গণ-আবেদন ও গণ-জাগরণ। আর তা প্রকাশের আঙ্গিক-কৌশলটি হল তাঁর কবিতার গদ্য। তাঁর গদ্যের গদ্য অপেক্ষা কবিতার গদ্য বেশি আস্বাদ্য। তাঁর কবিতার গদ্যভাষা সহজ-সরল ও কাব্যময়। কবিতার গদ্যভাষায় যেন তাঁর নিজের স্বতস্ফূর্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর এই গদ্যভাষায় তিনি সমাজবদ্ধ শব্দ বা অপ্রচলিত তৎসম শব্দের ব্যবহার বর্জন করে বেশি পরিমাণে তদ্ভব ও দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাক্‌রীতিতে কাব্যস্পন্দন সৃষ্টি করেছেন। একই পদ বা পদগুচ্ছ পঙ্‌ক্তির পৌনপুনিক ব্যবহার তাঁর কবিতার বিশেষত্ব। এইভাবে বিষয়, ভাব, ভাবনা, নীতি-আদর্শ, লক্ষ্য ও প্রকাশ, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, উপস্থাপন কৌশল, শব্দ বা ভাষার ব্যবহার, বাক্‌রীতি প্রভৃতি দিক দিয়ে কবি রাম বসু রবীন্দ্রভাব বৃত্তের বাইরে অন্য এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কবি হিসেবে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। অশোক কুমার মিশ্র —'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০০)', প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০২, কলকাতা।

২। কৃষ্ণগোপাল রায়—'অভিনিবেশ : একালের কবিতায়', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪০৮

৩। ব্রহ্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও পঙ্কজকুমার মণ্ডল—'প্রসঙ্গ একালের কবিতা অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা, মার্চ ২০১২ (২য় সংস্করণ)

৪। তরুণ মুখোপাধ্যায়—'বাংলা কবিতা : অনেক আকাশ', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, মার্চ -২০০৩

৫। শীতল চৌধুরী—'আধুনিক বাংলা কবিতায় নিবিড় পাট', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০০৪ (পুনর্মুদ্রণ)

■ ড. রিজওয়ানা নাসিরা—অধ্যাপিকা ও প্রাবন্ধিক

মেহেবুব হোসেন

যুদ্ধক্লান্ত নিঃসঙ্গ বিবিক্ত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বাল্যকাল যাঁর ব্যয়িত যুদ্ধের নান্দীরোলে, 'বিংশ শতাব্দির সমানবয়সী' সেই কবি সুধীন্দ্রনাথ (১৯০১-৬০) মানব সভ্যতার বীণটির চক্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেই 'অগ্রজের প্রতি অটল বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবির মতো সুধীন্দ্রনাথের জীবন যুগ্ম যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক আর্থিক মন্দা, মন্বন্তর ও দাঙ্গা ইত্যাদি বিভীষিকার চক্রব্যূহে নিঃসঙ্গ চৈতন্যে আর্ত একাকী। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণবাদ, মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অন্তিমে যখন শক্তিবাদের সূচনা করে ১৯১৪র, অতঃপর ফ্যাসিবাদ, সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রবাদের মাঝে ১৯৩৯ এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জাতকের জন্ম দেয় তখন আসন্ন সর্বনাশের মুখোমুখি উদ্বিগ্ন নচিকেতা' কবি সুধীন্দ্রনাথই ভাবতে পারেন—

মনে হল আশা নাই
মনে হল ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার
মনে হল ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
মনে হল
সংকুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন। (সমাপ্তি/ক্রন্দসী)

এক্ষেত্রে অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত সুধীন্দ্রনাথের কবি মানস প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—'তৃতীয় দশক থেকেই সুধীন্দ্রনাথ এবং তার সমমনস্কদের কাছে এই শতাব্দী বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়েছে। এই বিষাদ, গ্লানি, পরাভব অথচ জিজ্ঞাসার অপরাজেয় আবির্ভাবে সুধীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট।'

বিজ্ঞান-দর্শনজাত সমকালীন নৈরাশ্যনুভব তাঁর মতো আর কোনো রবীন্দ্রোত্তর বাঙালি কবির কবিতায় দৃষ্টিগোচর হয়না, কাব্যিক উপস্থাপনায় এর আঙ্গিকগত তীব্রতাও তুলনারহিত। তাঁর প্রত্যয়ে ঈশ্বর মৃত। প্রকৃতি নির্মম এবং উদাসীন, রাষ্ট্রপট ও ব্যাভিচারী—তাই সচেতন মানুষের শেষ গন্তব্য অন্তহীন নৈরাশ্য। তাঁর জীবনে আটাশের 'ইতি'র বিশ্বাস 'ইতি' টেনে উনত্রিশের মন্দির সাথে স্বপ্নভঙ্গের শুরু জীবনভাণ্ডে একমাত্র সঞ্চয়, নৈরাশ্য-নিখিল নাস্তি-পরম শূন্যতা অনন্ত আশা।

সুধীন্দ্রনাথের সাতটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী', উত্তরফাল্গুনী', সংবর্ত ও দশমী' প্রভৃতি পাঁচ কাব্যে ব্যক্তিগত প্রেমের স্মৃতি, প্রেম-পরিতৃপ্তির অপ্রাপ্তিজনিত উষ্মা থাকলেও এসব কিছু ম্লান হয়েছে সত্তার অসহিষ্ণু আর্তনাদে কালের ব্যভিচারে এলিয়ট—মার্লামের কাব্যিক-মন্ত্রে; বাঙালী কবির অক্ষর শয্যায়। কবির নৈরাশ্য-চেতনার

তীব্রতার সূচনা 'ক্রন্দসী'তে আর তীব্রতম তীক্ষ্ণতায় সংহত হয়েছে 'সংবর্ত কাব্যগ্রন্থে। 'ক্রন্দসী' কাব্য থেকে এই শূন্যতাময় সংশয়ী তমসার অনন্ত তমসা কেবল ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তির ফলে উদ্ভূত হতাশা সংকলিত নয়, বিশ্ববীক্ষাজনিত এক সামগ্রিক উপলব্ধি এই নিখিল নাস্তি। মধ্যবিত্ত মননের পারমাণবিক মৃগয়া বিলাসের রণক্ষেত্রে পলায়ন প্রবৃত্তি ছাড়া স্বস্তির স্বাদ শূন্য, একমাত্র বিকল্প ভবিতব্য উটপাখির আত্মপ্রাপ্তি—

'কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে
মরুভূমি, ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই; নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।'
(উটপাখি/ক্রন্দসী)

নিশ্চিত প্রত্যয়ভূমি নিশ্চিহ্ন। মানুষের মনকে মিথ্যা সান্ত্বনার দেওয়ার মতো মরীচিকা মায়ার বিজ্ঞাপন সামনে কোথাও নেই। হাতে কেবল ছলনাময় বালুরাশির বিস্তারিত মরুভূমি। যুদ্ধ-বিলাস ক্লান্ত মানুষ নিঃসঙ্গ নিরলম্ব অনিকেত। জীবন গণিকার মতো ঘৃণ্য সংক্রামক জরায় ক্ষয়িত। মহাকালের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হওয়ার জন্য সমস্ত কিছুই অপেক্ষমান। একথা যেমন বিশ্বজনীনতার ক্ষেত্রে, তেমনি কবির ব্যক্তিজীবনেও—

'কিছুরই কি নেই অব্যাহতি
জীবনের মরুপ্রান্তে স্মরণের অখ্যাত বসতি,
তারেও করিবে ছারখার রক্তলোভাতুর তব দিগ্বিজয়ী শকট দুর্বার
হে কাল, হে মহাকাল?' (কাল/ক্রন্দসী)

সমকালীন সাম্রাজ্যবাদী বিপনন সর্বস্ব যান্ত্রিকতায় সবও মননহীন অপচয়িত জীবন ব্যয়—

'সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা
সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই
ঝেড়ে ফেলে বাঁচা,
কেবল বাঁচা।' (বিরাম/ক্রন্দসী)

ক্রন্দসীর 'নরক', 'মৃত্যু', 'প্রশ্ন', 'সমাপ্তি' 'প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতায় ঈশ্বরের প্রতি, চতুর মানুষের অমানসিক শৃঙ্খলে কবি বিশ্বাস হারিয়েছেন। 'অসুরের তরে' অধিক সময় কবি অতিরিক্ত মিত কাতর ভগবানের প্রতি। কবির কাছে সমস্ত জাগতিক সভ্যতা বিষাক্ত হয়ে গেছে। কবি এর থেকে মুক্তি চান মৃত্যুর অনন্ত শূন্যতার মধ্যে। বিতর্কিত পার্থিব সিদ্ধির জন্য সিদ্ধিদাতা গণেশের পাশব উল্লাসে জনতার তৃপ্ততা, ক্রিমিকীটের 'নিত্য জন্ম-পঙ্কিল মলের ভাণ্ডে আত্ম নিমজ্জন', চারপাশের শকুনের কলহ, এসব থেকে কবি মুক্তি চান মৃত্যুর শূন্যতায়। সেই নির্জন শান্তিই কবির একমাত্র কাম্য।

গড্ডলের ধর্মটি বাদে কবি আর আস্থাশীল নন। 'জনতার জঘন্য মিতালিতে' ক্ষুব্ধ কবি অস্বীকার করেন 'লুব্ধ ক্ষুব্ধ বামনের এ সমষ্টিবাদে'। মৃত্যুই তাঁর বিকল্প আশ্রয়ভূমি।

বিংশ শতাব্দীর সমষ্টিগত ভয়ানক বিপর্যয়কালের বাংলা কাব্যিক তথ্যভাষ্য সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' কাব্যখানি। স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দানবিক উত্থান, গৃহযুদ্ধ, বত্রিশ মাসের পর মাদ্রিত পতন, লোরকার কলম হনন, ১৯৩৯ তে জার্মান বাহিনীর পোল্যাণ্ড বধের গৌরচন্দ্রিকায় ষ্ট্রেসেমান বিয়াঁর লোকানোচুক্তির (১৯২৯) মানবতার সনদ ভেঙে যায়। মুসোলিনীর আবিসিনিয়া আক্রমণ, ট্রস্কির সোভিয়েট নির্বাসন, তৃতীয় শক্তির উত্থান পতন, হিটলারের ভূপতি হওয়া। নিখিলসত্তার বিদারণভূমি ঐতিহাসিক তথ্য সমগ্র সংবর্তের শরীর জুড়ে।

'তিরিশের দশকে যে কবিকণ্ঠ ছিল আবেগায়িত পঙক্তিমালার স্বতঃস্ফূর্ত নির্গমন, পঞ্চাশের দশকে যেখানে তীব্র ও গভীর সমাজ সচেতনতা, বিশ্বরাজনীতির সমস্যাসংকট। সংবর্ত অন্তর্জগত নয়। বহির্জগতের দ্বন্দ্বজাত চিত্র, প্রতিবেশ সতর্ক, প্রশ্নবিদ্ধ, পরিণত পুরুষের অভিজ্ঞান, যাঁর রয়েছে নিজস্ব উপলব্ধি, দর্শন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুদৃঢ় তলোয়ার, কালান্তরে যা শান্তিতর। প্রেম ও নৈঃসঙ্গ্যবৃত্তে ভ্রাম্যমান কবির ব্যাক্তি চৈতন্যে এখন জাতীয় মানুষের ছায়াসঞ্চার, কিন্তু এই বিশ্ববীক্ষা পূর্বার্জিত দর্শনের ব্যতিক্রম নয়, কবির দৃষ্টিকোণে পূর্ববৎ নেতির আধিপত্যঃ মাত্র যে কটি কবিতা 'সংবর্ত' গ্রন্থভুক্ত তা যেন প্রতীকরূপ ধারণ করেছে এই দীর্ঘ সময়ের হতাশা ও নৈরাশ্য কবলিত কবিমানসের প্রতিচ্ছবি।"

বিশ্বের প্রলয়কালীন মেঘ 'সংবর্ত' যেন কাব্যে আধারিত। কবি উপলব্ধি করেন রাজনীতি এবং আদর্শবাদের নামে আগ্রাসী অঙ্গ শক্তি সভ্যতার সনদগুলিকে অনায়াসে কীভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে। 'নান্দীমুখ' কবিতায় কবি লিখেছেন 'বিপ্রলব্ধ বিশ্বমানব বিষাদে/ অঙ্গুলি তুলি দেখায় অলঘ নিষাদে।' তাঁর নির্মেদ অভিজ্ঞান-মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন 'আসন্ন প্রলয়' তাই অবশ্যম্ভাবী। মহাযুদ্ধের শেষ দিকে এই প্রলয়ের আশঙ্কা সত্যি হল 'প্রত্যাবর্তন' কবিতায়—

"অনুবিদারণে শতসহস্র মানুষ হত,
ব্যক্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি
বেতনগ্রস্থ বিকলাঙ্গের দুটি ক্ষত,
পরিত্যাজ্য হিরোসিমা, নাগাসাকি।'

কোনো ঈশ্বরই আমাদের পরিত্রাতার ভূমিকায় নেই। ঈশ্বর ব্যর্থ, ঈশ্বরের অন্বেষণ আত্মঘাতী পরিহাস মাত্র। আজ রাষ্ট্র ও সমাজের অদৃশ্য যূপকাষ্ঠে কত প্রিয় প্রাণপুত্তলির বলিদান সম্পন্ন হচ্ছে। ঈশ্বরের পূজায় নিবেদন করার জন্য মানুষের একমাত্র নৈবেদ্য আর্তনাদ—

'ওই শোনো,
নির্জিতের নিরুপায় কণ্ঠস্বর, শোনো
উদায়াস্ত তোমাকেই খুঁজে,
অবশেষে ফিরে আসে আত্মঘাতী পরিহাসরূপে।' (উজ্জীবন/সংবর্ত)

বিশ শতকের প্রভূত শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ ব্যক্তিকে স্বৈরেচ্ছা শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায় বলেই সমাজতন্ত্রী, স্বেচ্ছাতন্ত্রী, গণতন্ত্রীর মুখোশকে মানবের সামনে মেলে ধরে। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিই মরে সমষ্টির পীড়নে—

'অসাধ্য সাম্রাজ্য রক্ষা, অব্যর্ধ প্রলয়,
এবং যে ব্যক্তিস্বত্ব সভ্যতার সম্মত আশ্রয়,
তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে
একা হিটলারের নিন্দা সাধে আজ বাধে কি বিবেকে?' (সংবর্ত/সংবর্ত)

প্রগতি, সভ্যতা, মানবমুক্তি, সমাজবাদ সব শেষপর্যন্ত ভণ্ডামি।

'রুশের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মমি,
হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন,
মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন,
কবন্ধ ফরাসী দেশ
সে এখনও বেঁচে আছে কিনা,
তা সুদ্ধ জানিনা। (সংবর্ত)

যুদ্ধ ও বিপ্লব কোনো নতুন পরিবর্তন অনেনি, শুধু ধ্বংসকে মাদকতার পাত্রে নিমজ্জিত করেছে। মানুষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মানবমুক্তির তাড়নায়—

'এরই আয়োজনে, অর্ধশতক ধরে
দু দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে;' (১৯৪৫/সংবর্ত)
কিন্তু পরিণামে প্রশান্তি আসে নি—
কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনীমুখর একনায়কের স্তবে।' (১৯৪৫/সংবর্ত)

তাই কবি ত্রিশঙ্কু আশ্রয় ভূমির অনিকেত বিশ্বাসে 'যযাতি'র পুরাণ প্রতিমায় গম্ভীর স্বীকারোক্তি করেন উক্ত কাব্যে—

জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্য ধর্মের স্তবে।
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ ততোধিক বিমুখ অতীতে।' (যযাতি/সংবর্ত)

কবির কাছে যযাতির যত অকাল বার্ধ্যকের সমস্যা নেই। কিন্তু জগত তাঁর কাছে

অর্থহীন। পঞ্চাশের পূর্বে যে শূন্যতা পাকা ছিল সম্ভোগের আকর্ষণে। আজ পঞ্চাশোর্ধে তাও গেছে সরে। কবির কাছে তাই চরাচরে 'নেতির বিস্তার' এখন প্রকট। কবির নৈরাশ্যবাদিতার জবানবন্দী যেন উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিনিচয়। এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' (১৯২২), জাঁ পল মাত্র এর অহং এর উত্তরণ (১৯৩৭) [La Transcendancede l, Ego]

বিবমিষা (১৯৩৮) [la nausee]
মক্ষিকা (১৯৪৩) [la Monches]
বেরোবার পথ নেই (১৯৪৪) [Huis clos]

অস্তিত্ববাদ আর মানবিক আবেগ (১৯৪৬) [L' existentialisnest Unhumanism] প্রভৃতির প্রসবণে সুধীন্দ্রনাথের যযাতির বিকল্প কি আর আশ্বাসবাণী থাকতে পারে? রাষ্ট্রীয় সময়ের শাসনে ব্যক্তিমানবের ত্রিশঙ্কু মহাপ্রস্থানযাত্রা ছাড়া গন্তব্য নেই। যুদ্ধকালীন ও উত্তরপর্বের আধুনিকতার বেদনা ও যন্ত্রণাকে সুধীন্দ্রনাথ স্বকীয় ভঙ্গীতেই রূপ দিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'নাটকী নায়করূপে নিজেকে আজীবন দেখেছি'। নেপথ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি চেতনার বিষয়ে তিনি সচেতন হয়েছেন, আধুনিক বুদ্ধিজীবীর করুণ আত্মরতি বিষয়ে তিনি সজাগ। উপলব্ধি করেছিলেন—দৈবাৎ জীবনরঙ্গ মঞ্চে অনুপ্রবেশ করলেও ঘুমন্ত কঞ্চুকী'র ভূমিকা তাঁর।

'তাই অসহ্য লাগে ও আত্মরতি
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।'

মালার্মের neant এর মতো জীবনবিবিক্তির অনন্ত আশার সন্নিবেশ ছাড়া সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে ইতিবাচক জীবন দর্শনের প্রকাশ দুর্নিরীক্ষ্য। যুদ্ধের প্রত্নগহ্বরে উত্থিত সুধীন্দ্রীয় কাঠিণ্য জাত সংহতে শব্দের সংবর্তই বাংলা কবিতার সম সময়ের অন্যতম চিলে কোঠা, তৎসম শব্দ আর ওয়েষ্ট ল্যান্ডের নির্মেদ নির্জনে ওমের প্রদাহ বিকল্প, পাঠকের হাতে আর কিছু দিতে কৃপণ সুধীন্দ্রনাথ। সময়ই তাঁকে সেভাবে নির্মাণ করেছে যেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়/কবিতার কালান্তর
২। সিদ্দিকা মাহমুদা/সুধীন্দ্রনাথ কবি ও কাব্য
৩। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়/ কবিতা নিয়ে
৪। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত/ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ। দে'জ
৫। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়/সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ জীবন ও সাহিত্য

■ মেহবুব হোসেন—অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

পুতুল বৈদ্য

স্বাধীনতা তুমি ঃ শামসুর রাহমান

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তর্গত সুবে বাংলা বা পূর্ব বাংলার পথচলা শুরু। কিন্তু বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় বিতর্কের টানাপোড়েন। গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে মূল্য না দেওয়ার জন্য ১৯৪৮ সালে ১১ই মার্চ ঢাকা শহরে ছাত্রসমাজ শুরু করল প্রতিবাদ মিছিল, সাধারণ ধর্মঘট, বিক্ষোভ। বাংলা ভাষার দাবিতে এভাবে শুরু হয় সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করে তুলল পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আলি জিন্না-র বাংলাদেশ সফর। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর তীব্র অবজ্ঞা প্রকাশে। ঐ একই বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে শুরু হয় বাংলা ভাষাপ্রেমী মানুষের আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি কার্জন হলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহারের উদ্যোগে প্রথম 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে' এ সভাপতির ভাষণে ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন—"আমি হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ রেখে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।" তাঁর এই ভাষণ ভাষা আন্দোলনকারীদের আরও উদ্দীপ্ত করে তোলে। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ডাক দেওয়া হয় সাধারণ ধর্মঘটের। অন্যদিকে সরকার জারি করে ১৪৪ধারা। ছাত্রসমাজ এই ধারা অমান্য করলে শুরু হয় সংঘর্ষ। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত, আবুল জাব্বার, সালাম, রফিকউদ্দীন আহমেদ। একুশের এই রক্তাক্ত দিন পূর্ববাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক জগতে শুরু করল পালাবদলের ইতিহাস। এই সংগ্রামের জের টেনে চলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য লড়াই। ১৯৬৫ থেকে দীর্ঘ ছয় বছর রক্ত ঝরার ফলস্বরূপ বাংলাদেশ পেল স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামে নতুন দেশের নতুন ভোরের সূচনা।

এই উত্তাল সময়কে কেন্দ্র করে বহু কবি কবিতা রচনা করেছেন। এই সময়ের কবিরা হলেন—আবুল হোসেন (১৯২১), মাজহারুল ইসলাম (১৯২৫), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আল মাহমুদ (১৯৩৬), জিয়া হায়দার (১৯৩৬), শহীদ কাদরী

(১৯৪২), রফিক আজাদ (১৯৪৩), নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫) প্রমুখ। এই সব কবিদের কবিতার বিভিন্ন বিষয় থাকলেও মূল বিষয় ছিল দেশপ্রেম, বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা হয় কবিতা, গান, গল্প ইত্যাদি। আব্দুল গফ্‌ফার চৌধুরী লেখন—

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি?'

আল মাহমুদ লেখেন—

'ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুরবেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতের রক্ত।'

গল্প লেখন শওকাত ওসমান 'মৌন নয়', আনিসুজ্জামানের 'দৃষ্টি', জহির রায়হানের 'কয়েকটি সংলাপ ও একুশের গল্প' ইত্যাদি।

তবে ভাষা আন্দোলনের পুরো মাসটা শামসুর রাহমান ছিলেন প্যারাটাইফয়েডে শয্যাশায়ী। তিনি সশরীরে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নি, কিন্তু যোগ দিয়েছিলেন মনাসিকভাবে। ফলে তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে স্বদেশ, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসার উচ্ছ্বাস। অবিভক্ত বাংলাদেশের পুরনো ঢাকার মাহুৎটুলিতে (মাতামহের বাড়ি) কবি শামসুর রাহমানের জন্ম ২৪শে অক্টোবর ১৯২৯ সালে। কবির পিতা মুখলেসুর রাহমান চৌধুরী; মাতা মোসাম্মাৎ আমেনা। ছাত্র জীবনে ১৯৪৫-এ প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৪৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন কবি। ১৯৫৩তে বি. এ. পাশ করেন। এম. এ. প্রথম পর্ব দিলেও শেষ পরীক্ষার জন্য আর সচেষ্ট হননি তিনি। এই সময় থেকে কবিতা লেখা তাঁর নেশা হয়ে ওঠে। সাংবাদিকতা ছিল কবির পেশা। তিনি দৈনিক বাংলা সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদক ছিলেন। এসময় থেকে প্রকাশিত হতে থাকে একে একে তাঁর পঞ্চাশটি কাব্যগ্রন্থ। কবি শামসুর রাহমানের কবিতা লেখা শুরু হয় ছোটবোনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। কুড়ি বছর বয়সে লেখা প্রথম কবিতা জীবনানন্দ দাশকে অনুসরণ করে '১৯৪৯' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'সোনার বাংলা' পত্রিকায়।

শামসুর রাহমান লেখেন দায়বদ্ধতা থেকে। কার প্রতি কবি দায়বদ্ধ? তা জানা যায় কবির নিজের লেখা থেকে—"...আমার মধ্যে যন্ত্রণা আছে, আমার মধ্যে ক্রোধ আছে, ঘৃণা আছে, ভালোবাসা আছে, সেটাই আমি প্রকাশ করি।... একজন কবি বা শিল্পীর দু'ধরনের দায়বদ্ধতা আছে, এক তার শিল্পের প্রতি এবং সমাজের প্রতি। আমি কবিতার কাছে দায়বদ্ধ, সমাজের কাছে দায়বদ্ধ, আমি শিল্পের কাছে দায়বদ্ধ। আমার দায়বদ্ধতা

থেকেই আমি লিখি।" ('কবিতা ভাবনা ও কবিতা'/এবং মুশায়েরা) তিনি কখনও অন্যায়কে মেনে নিতে পারেননি। সর্বদা শোষিত, বঞ্চিত, পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাদের হয়ে কথা বলেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তাঁর এই দায়বদ্ধতা থেকে তিনি ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনেও নিজের দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবেননি। এই সময় তাঁর কবিতা যে হাজার হাজার তরুণদের সামনে চলার পাথেয় হয়েছিল তা বোঝা যায় তাঁর 'নিজবাসভূমে', 'বন্দী শিবির থেকে', 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', 'এক ধরনের অহংকার' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের কবিতা থেকে। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আত্মিক বন্ধনের গভীর প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিণী বর্ণমালা'র কবিতার ছত্রেছত্রে। বাংলা বর্ণমালা কবি সত্তায় নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বল করে ঃ

'আজন্ম আমার সাথী তুমি,
আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গড়ে পলে পলে
তাইতো ত্রিলোক আজ সুন্দর জাহাজ হয়ে ভেড়ে
আমারই বন্দরে।'

বাংলা ভাষা কবির আজন্ম অহংকার। এই ভাষার মাধ্যমে কবি বহির্বিশ্বের নানা সংবাদ ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। সেই মাতৃভাষার অধিকার যদি কেউ কেড়ে নিতে চায় তখন কবি বলে ওঠেনে—

'তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশ শো' বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পগুলি
বুকে নিয়ে আজো সগৌরবে মহীয়সী।'
(বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'/নিজবাসভূমে)

১৯৫২ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার জন্য অনেকে শহীদ হন। আর এই আত্মত্যাগের রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি বাংলা ভাষা বুকে ধারণ করে রয়েছে। এই মহীয়সী বাংলা ভাষাকে যারা অবমাননা করে তাদের প্রতি কবির ঘৃণা ঝরে পড়তে দেখা যায়—

'এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি খেউড়ের পৌষমাস!
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।' (তদেব)

কবি প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন। এই গণ আন্দোলন কবির লেখার বিষয় ভাবনায় আনে পরিবর্তন। শামসুর রাহমান শুধু নিজের এবং পরিবারের সুখ-দুঃখের কথা বলেন না, বলেন আরও অনেকের কথা। পলাশতলীর হাড্ডিসার ক্লান্ত শ্রমিক-কৃষকের কথা, মেঘনার মাঝির কথা, চটকলের শ্রমিকের কথা, উদাস কুমোরের

কথা। এই সঙ্গে অনুভব করেন জীবনের মানে—মাঠে, ঝাঁ-ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো, ফসলের গুচ্ছ বুকে নিয়ে নিবিড় জড়ানো, টেপির মায়ের জন্যে হাট থেকে ডুরে শাড়ি কেনা, অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা, স্ফুলিঙ্গের মতো সব ইস্তাহার বিলি করা আনাচে-কানাচে। একইসঙ্গে কবি-চেতনার রঙ হল একুশের কৃষ্ণচূড়াঃ

'বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ববাংলা।'
('ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯'/ নিজবাসভূমে)

কবি দেখেন রাজপথে সালামের হাত থেকে ঝরে পড়ে অবিনাশী বর্ণমালা। আর গাঢ় উচ্চারণে বরকতকে বলতে শোনেন—

'এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ে হরিৎ উপত্যকায়। সেইফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।' (তদেব)

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। আর আসাদের রক্তে রঞ্জিত শার্টকে কেন্দ্র করে কবি লিখে ফেললেন 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের মুখে ফিরতে থাকে—

'গুচ্ছগুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।'
('আসাদের শার্ট'/নিজ বাসভূমে)

আসাদের শার্টের সঙ্গে মিশে আছে বোনের ভালোবাসা মায়ের স্নেহ। সেই শার্ট আজ রাজপথের মিছিলের প্রধান বিষয়। মানুষের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষতা আর লজ্জা সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে প্রাণের পতাকায় পরিণত হয়েছে আসাদের শার্ট।

১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার অবস্থা ছিল উত্তেজিত, অস্থির, ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে শুরু হয়ে যায় গণহত্যা, যা অন্য কোন দেশ মেনে নিতে পারেনি। তাই ভারতবর্ষ পূর্ববাংলাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধ চলে টানা নয় মাস ধরে। অবশেষে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পায় স্বাধীনতা। আর স্বাধীনতা

পাওয়ার জন্য কত মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছিল সেদিন। তাই কবির জিজ্ঞাস্য ঃ

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাষাতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন?'
('তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'/বন্দী শিবির থেকে)

এই স্বাধীনতা আসার নামে 'সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো', 'হরিদাসীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল', 'ছাত্রাবাস-বস্তি উজাড় হলো', 'ছাই হয়ে গেল গ্রামের পর গ্রাম', 'অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের উপর', 'হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে বসে আছে পথের ধারে।' কত মানুষ স্বাধীনতার জন্য অসহায় হয়ে বেঁচে রয়েছি। আর এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে কবি দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেন—

'পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা।'
("তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'/ বন্দী শিবির থেকে)

কবি শামসুর রাহমান বিশ্বাস করতেন সবশেষে অবশ্যই জয় হবে সত্যের। শেষপর্যন্ত ভাষাপ্রেমী মানুষের রক্তঝরার সার্থকতা পূর্ণ হলো। এল তাদের বহুদিনের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা পেয়ে কবি শামসুর রাহমান নিজের মনের আবেগকে স্থির রাখতে পারেননি। তাই 'স্বাধীনতা' তুমি কবিতায় উন্মোচন করেছেন স্বাধীনতার স্বরূপকে। 'স্বাধীনতা' শব্দটি তাই তিনি বারংবার উচ্চারণ করেন। স্বাধীনতাকে আরো তিনি কত রূপে রঙে সাজিয়ে তুলেছেন। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ মনে করেন 'স্বাধীনতা তুমি' শব্দটি ধ্রুপদের মতো উচ্চারিত হয়ে শ্লোগান হয়ে ওঠেনি। বরং—"স্বাধীনতাকে তিনি সাজিয়েছেন নানা রঙে-রূপে-সুরে, আর সেই রঙ-রূপ-সুর, তিনি সংগ্রহ করেছেন বাঙলার স্বপ্ন-নিসর্গ জীবন থেকে"। (নিঃসঙ্গ শেরপা/হুমায়ুন আজাদ)। বাংলা ভাষা ও স্বাধীনতা কবির সমস্ত সত্তা জুড়ে। শ্লোগান-মিছিল থেকে ফসলের মাঠে কৃষকের হাসিতে কবি স্বাধীনতার সুখ অনুভব করেন। শ্রাবণের অকূল মেঘনার বুক মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন, শুধুমাত্র স্বাধীনতার জন্য। উঠোনে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন, বোনের হাতের মেহেদীর রঙ কিংবা কবির কবিতার খাতায় বাংলা ভাষার জন্য স্বাধীনতা সার্থকতা খুঁজে পায়। কবির ভাষায় ঃ

'স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উজ্জ্বল সভা।'
('স্বাধীনতা তুমি'/বন্দী শিবির থেকে)

কবির সত্তা জুড়ে স্বাধীনতার আনন্দ, অহংকার, তাঁর কবিতার শরীরে প্রকাশিত। কবি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ, স্বপ্ন বাংলা ভাষার জন্য ঃ

'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে
কত চেনা ছবি;
মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন ছড়া—
ঘুমপাড়ানি ছড়া কোন্ সে সুদূরে; সত্তা তার
আশাবরী। নানি বিষাদসিন্ধুর স্পন্দে দুলে
দুলে রমজানি সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া, আর
একুশের প্রথম প্রভাতফেরি—আলৌকিক ভোর।'
('বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে'/কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি)

কবি শামসুর রাহমান বাংলা দেশের নয়, বাংলা ভাষা-মায়ের মরমী সন্তান। তাই বাংলা ভাষা তথা বাংলার মায়ের স্বাধীনতা তাঁর জীবনের সত্তায় চরিত্র রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ এক অনন্ত অনুসরণীয় শাশ্বত অনুকৃতি।

তথ্যসূত্র ঃ

১। আহমদ রফিক ও ঘোষ বিশ্বজিৎ (সম্পাদিত)। ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর। মাওলা ব্রাদার্স। দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১১, ঢাকা।

২। রাহমান শামসুর। কালের ধুলোয় লেখা। অন্য প্রকাশ। দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, ঢাকা।

৩। রাহমান শামসুর। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫। কলকাতা।

৪। ত্রিপাঠী দীপ্তি। বাংলা দেশের আধুনিক কাব্যপরিচয়। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। কলকাতা।

৫। মুখোপাধ্যায় তরুণ। কবি শামসুর রাহমান। এবং মুশায়েরা। প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ২০০৫। কলকাতা।

■ পুতুল বৈদ্য—অধ্যাপিকা ও প্রাবন্ধিক

সুদীপ্ত ঘোষ

বিনয় মজুমদারের কবিতায় গণিত ও বিজ্ঞান ভাবনা

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনার যে দশকগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হয় তার মধ্যে পঞ্চাশের তথা পাঁচের দশকটি অবশ্য আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। ইতিপূর্বে আধুনিক কবিতার প্রসঙ্গে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ছিল স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুত কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটাতে বাংলা কবিতাকে কম মূল্য দিতে হয় নি। অবধারিতভাবেই তিরিশের দশকের কবিদের নতুনত্বের সন্ধানে ছুটতে হয়েছিল দেশ-বিদেশে নানা অনুসঙ্গ আর প্রতীকের সন্ধানে। আর অবশ্যই সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের-অমোঘ প্রতিঘাতে সৃষ্ট কবিতা হয়ে উঠেছিল জটিল ও পাঠকের নাগালের বাইরে। তবে পঞ্চাশের দশকের কবিরা ভীষণ ভাগ্যবান। তাঁদেরকে অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয় নি। সদ্য স্বাধীন দেশের যুবকদের চোখে তখন স্বপ্নের মায়া কাজল। ছিল না রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বগ্রাসী সম্মোহনে আহুতি দেওয়ার ভয়। তাঁরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে সৃষ্টি করলেন আধুনিক কবিতার নতুন দিগন্ত। এনে দিলেন জনপ্রিয়তার জোয়ার। জোয়ার এলো আলোক সরকারের 'শতভিষা' ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার হাত ধরে এক ঝাঁক মেধাবী প্রতিভাধর মৌলিক কবিদের কবিতার সূত্রে।

পঞ্চাশের দশকের নব্য-আধুনিক প্রজন্মের কবিরা পাশ্চাত্যমুখিতা থেকে সরে এসে স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের কাব্যভুবন গড়েছেন। তা যেমন কখনও লোকায়ত জীবনের নির্যাস, কখনও কখনোবা কবির একান্ত আত্মিক অনুভূতি সর্বস্বতা থেকে জাত। এই কবিকুলকে ল(্য করেই কাব্যসমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা' গ্রন্থে বলেছেন —

''স্বাধীনতা - উত্তরকালের কবিরা, উৎকেন্দ্রিক পশ্চিমীদের প্রভাবিত কিছু ব্যতিত্র(মকে হিসাবে না নিলে, কোন বিদেশী গু(র কাছে নাড়া বাঁধেন নি। তাদের কবিতা মূলত আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী।''

সমালোচকের পূর্বোক্ত(বক্ত(ব্যের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় — পঞ্চাশের শেষ দিকে (১৯৫৮) আবির্ভূত কবি বিনয় মজুমদারের (১৯৩৪-২০০৬) কাব্য রচনাতে। তাঁর কবিতা একান্তই আত্ম-মনন নির্ভর উপলব্ধির কবিতা। আর পঞ্চাশের দশকের যুগ ধর্ম মেনেই এ যুগের অপরাপর কবি শক্তি(চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো বিনয়ের কবিতার বিষয়ও তাঁর যাপিত জীবন। এ(ত্রে বিষয় এঁদের থেকে কোন অংশে কম নন। 'অবিনীত' প্রবন্ধে বিভাস রায়চৌধুরীর বলেছেন —

''শুধু কবিতার নতুন রসের জোরেই বিনয় মজুমদার পাঠক মনে ঠাঁই পেয়েছেন।'' এই কথা কতটা সত্য তা আমরা বিনয়ের কাব্য-কবিতার আলোচনাতে সহজেই ল(্য করবো। বিনয় মজুমদার বাংলা কবিতার ভুবনে সংযোজন করেছেন নানা নতুন নতুন দিক। পাঠককে দিয়েছেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা তথা অনুভূতির আস্বাদ। সে শুধু কাব্যের বিষয় ভাবনাই নয়, কাব্যাঙ্গিকের দিক দিয়েও। তাঁর কবিত্বকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয় সেইসব মৌলিক দিকগুলি।

।। ২।।

গণিত তথা ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞানভাবনা বিনয়ের কাব্যভাবনার একটি বিশেষ দিক। আমাদের জানা — কারিগরি বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র বিনয়ের আবাল্য ভালোবাসা গণিত। কবিতার প্রতি নিমগ্নতাকে না ধরলে গণিতপ্রীতি বিনয়ের জীবনের অস্থি-মজ্জায় জড়িয়ে আছে। বিনয় ছোটবেলা থেকেই প্রিয় বিষয় গণিতে ভালো ফল করতেন। এবং তাঁর বড় দাদা অনিলবরণ মজুমদারের দেওয়া সূত্র অনুযায়ী জানা যায় — বিনয় প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এস.সি. (গণিত) বিষয় নিয়ে পড়তে বাধ্য হন একরকম পারিবারিক চাপে পড়ে। কেননা, বিনয়ের কম্পালসারি ও অ্যাডিশনাল দুটো অংকেই লেটার ছিল। যদিও ব্যক্তি(গতভাবে তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল কলা বিভাগ। আর তিনি দুই বিভাগের জন্যই বিবেচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিনয় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েড পাশ করেন আই.এস.সি. (গণিত) নিয়ে। এবং উচ্চতর পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন শিবপুর বি.ই. কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। কিন্তু বিনয়ের গণিত-প্রীতি একটুও দমেনি।

বিনয় পরে গণিতের বেশ কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। যথা - জিওমেট্রিকাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইউনিটাল অ্যানালিসিস (১৯৬৫), ইন্টারপোলেশান সিরিজ (১৯৬৫), (টস্ অফ্ ক্যালকুলাস (দ্য ওনলি এক্সাক্ট এক্সপোজিশন্ অফ দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার) প্রভৃতি। এইভাবে বিনয়ের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গণিত তাঁর প্রাণবায়ুর মতই অনিবার্য ও অপরিহার্য হয়ে থেকে গেছে। স্বভাবতই তার প্রভাব কবিতায় এসেছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে। এখানেই আবহমান বাংলা কবিতার পরম্পরায় বিনয় স্বতন্ত্র। তাঁর কবিপ্রতিভার এই স্বাতন্ত্র্য কবিবন্ধু-অধ্যাপক অমিতাভ দাশগুপ্তেরও ল(্য এড়িয়ে যায়নি। 'বিনয় নেই, কবির মৃত্যু নেই' প্রবন্ধে বলেছেন —

''গণিতের পঠন-প্রক্রি(য়া বা স্ট্রাকচার বরাবরই বিনয়ের কবিতাকে ও আঙ্গিককে এক ধরণের আদল দিয়েছে। যাকে বলে 'অ্যাক্সিওমেটিক ট্রুথ' এইরকম অনিবার্যতায় সে লিখে ফেলত - ''

এই প্রসঙ্গে কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত পূর্বোক্ত(প্রবন্ধে আরও সংযোজন করে বলেন—

''আমার ধারণা ৬০'এর দশকের শু(তে বাংলার এক কোণায় কবিতা ও গণিতের এমন এক সমাহার হয়েছিল যা হয়তো ইতিহাসে আর কখনও হয়নি।''

বিনয়ের অংক-প্রীতি এতটাই তীব্র যে তিনি একটি গোটা কাব্যই লিখেছেন গণিত নিয়ে — 'আমিই গণিতের শূন্য' নামে। তাছাড়া তাঁর অনেক কাব্যের কাব্যভাবনায় ছড়িয়ে আছে গণিত ভাবনা। বিনয় জানেন গণিতের সাহায্যে অনেক বিষয়ের সমাধান ঘটানো গেলেও সবকিছুর সমাধান গণিতে এক লহমায় হয় না —

''অনেক কিছুই আছে যা গণিত দিয়ে
সমাধান করা অতীব কঠিন এক কাজ।''

অন্য একটি কবিতায় আছে অংকের অতীব গু(ত্বপূর্ণ শূন্য বিষয়ক তত্ত্ব। নিজেকে বিনয় ওই শূন্যের তত্ত্ব উদ্‌গাতা বলে গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন —

''আমিই গণিতের শূন্য। গণিতের বইতে শূন্য
ছাপা হয় এইভাবে ০-এই ছাপা শূন্য আমি।''

বিনয়ের 'এক পংক্তি(র কবিতা'য় সূক্তি(রচনার আদলে অনেক পংক্তি(তেও গণিত-জ্যামিতির সাধারণ ব্যবহার ল(করা যায় । যেমন —

ক) ''কবিতা লিখলেই মানুষ, গণিত আবিষ্কার করলেই বি(ের মালিক''
খ) ''সবচেয়ে ভালো জ্যামিতি ময়ূরের পেখমে''
গ) ''নিখুঁত জ্যামিতি থেকে উঠে এসে অবশেষে ফুল ফুটে গেছে'',

গণিত-বিজ্ঞানকে কবিতার বিষয় হিসাবে সার্থক প্রয়োগ বিনয়ের কাব্যভাবনায় ল(করা যায়। যেমন —

''যেকোন গণিতসূত্র নিয়ে তার পরবর্তীদের
বাঁ পাশে আনার পরে সে সমীকরণে
সমান চিহ্নে(র পরে — ডান পাশে শূন্য হয়ে যায়।''

।। ৩ ।।

বিনয়ের পূর্বে তিরিশের দশকের প্রখ্যাত কবিজনেদের অন্যতম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষু(দের কবিতায়ও বিজ্ঞানের বিষয় এসেছে। যদিও বিনয়ের সঙ্গে এর গোত্রগত অমিল ল(করা যায় । বিনয় বিজ্ঞান তথা গণিত চেতনাকে যেভাবে কবিতায় আত্তীকরণ করেছেন সেভাবে নয়। তাঁদের কবিতায় বিজ্ঞান বিষয় হিসাবে এলেও একটু অন্যভাবে এসেছে। তৎকালীন কবিতায় বিজ্ঞান চেতনার প্রভাব সম্পর্কে 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা' গ্রন্থে সমালোচক মনোজ মুখোপাধ্যায় বলেছেন —

''ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব বাংলা আধুনিক কবিতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। কেবল ফ্রয়েডই নন, 'ম্যার্ক্স, প্‌-্যাঙ্ক, নীলসবোর, আইনস্টাইন প্রমুখ নব্য বিজ্ঞানী, ফ্রেজার মর্গান প্রমুখ নতৃত্ত্ববিদ, এডলার, ইয়ুং প্রমুখ মনোবৈজ্ঞানিক এবং মার্কস, এঙ্গে

লস প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকের' চিন্তা-চেতনা ও আবিষ্কারগুলি উনিশ শতক থেকে প্রচলিত ধ্যান ধারণাগুলিকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানমুখী ও যুক্তি(বাদী চিন্তাধারা এবং পরিবর্তিত সমাজ পরিবেশ সর্বোপরি আধুনিক মানুষের মনোভঙ্গি সমকালীন কবিতাকে প্রভাবিত করলো।''

এর ফলশ্রুতিতে কবি বিষু(দে 'লিবিডো ডেভলপমেন্ট থিয়োরী'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লেখেন 'টক্কা-ঠুংরি' কবিতাটি। শুধুমাত্র, লিবিডো তত্ত্বকেই নয় পাভলভের কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের তত্ত্বও আধুনিক কবিতাকে ভরিয়ে তুললো।

তৎকালীন কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স বা অভ্যাসের প্রতিফলনে বাংলা কবিতায় প্রেমও পেল নতুন অভিব্যক্তি(। কবি বিষু(দে তাঁর 'চোরাবালি' (১৯২৬-১৯৩৭) কাব্যের 'গার্হস্থ্যাশ্রম' কবিতার 'কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স্' কবিতায় লিখলেন —

''অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি তাই তো আসি
তোমার উষ(প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।
অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি,
সহজের পেশা, আরামের নেশা, তাই তো আসি''

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও 'দশমী' (১৯৫৬) কাব্যের 'প্রতী(া' কবিতায় পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতি তথা পরমাণুতত্ত্বের উদ্ভবে আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে লেখেন —

''প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ ত্রাতার বদলে :
বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থানু,
পৃথিবী অনাথ, যথেচ্ছ পরমাণু(''

তবে শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির কথায় এঁদের কবিতায় ঠাঁই পেয়েছে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। যেখানে বিনয়ের স্থান স্বতন্ত্র।

।। ৪।।

বিজ্ঞান কবিতার আলোচনায় অধ্যাপিকা সুমিতা চত্র(বর্তী তাঁর 'আধুনিক কবিতার চালচিত্র' গ্রন্থে বলেছেন —

''জীবনবোধ ও উপলব্ধিকে অভিব্যক্ত(করবার সময়ে অনুভবলোকের ভাষা আর বিজ্ঞান চেতনার ভাষা — একাঙ্গ হয়ে যায় — এই ব্যাপারটিই আমরা সাধারণভাবে ল(করব বিজ্ঞান-কবিতার আলোচনায়। সে জাতীয় কবিতায় একদিক থেকে কিন্তু বিনয় মজুমদার অবশ্য উল্লেখ্য হয়ে থাকেন। খুব বেশি না হলেও দু'একটি কবিতায় তিনি অত্যন্ত সফলভাবে গণিত ধারণার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।''

আবার অনেক সময় বিনয় আপাত বিভ্রমের রহস্য ভেদ ক'রে সত্যের উন্মোচন ঘটান তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে বিজ্ঞানের প্রতীতিকে কাজে লাগিয়ে —

''অভিজ্ঞতা থেকে ত্র(মে আকাশের বর্ণহীনতার

সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে(বাতাসের
নীলাভতাহেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।''

কিংবা, ওই কবিতাটিতেই ছিল প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য ক'রে লেখা —

''এতকাল মনে হতো, তুমিও এসেছো অভিসারে —
চাঁদের উপর দিয়ে স্বচ্ছ মেঘ ভেসে-ভেসে গেলে
যেমন প্রতীতি হয়, মেঘ নয়, চাঁদ চলমান।''

এইভাবে গণিতচিন্তা তথা বিজ্ঞানের ভাবনায় বিনয়ের এমন সব কবিতায় ব্যক্তি(গত উপলব্ধিকে আরও সার্থকভাবে পাঠক মনকে উস্কে দিতে দেখা যায় । এই ব্যাপারে সমালোচক জ্যোতির্ময় দত্ত তাঁর 'বিনয়কে' প্রবন্ধে বলেছেন —

''বিনয়ের মাথার ভেতরের সফটওয়্যার কী ছিল তখন ? সফটওয়্যারটা বাংলা কবিতা, স্পষ্টতই জীবনানন্দের পুরোটা ঠাশা। কিন্তু সার্কিট্‌রি ? সেটা বিজ্ঞানের।''

একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ড. দেবেশকুমার আচার্য্যের কথাতেও —

''পেশায় ইঞ্জিনিয়ার বিনয় মজুমদার তাঁর কবিতায় এনেছেন বিজ্ঞানমনস্কতা।''

আর পাঠককে বিনয় তাঁর মনোভাবনার ছবি অবয়বে ধরিয়ে দিয়ে অমূর্ত সূক্ষ্ম-অনুভূতিকে কাব্যভুবনে সুন্দরভাবে মেলে ধরেছেন। এরই অনুরণন শোনা যায় কবি সমালোচক বিভাস রায়চৌধুরীর 'ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবতার শব' রচনার বক্ত(ব্যেও —

''প্রেম না পাওয়া দিয়ে আত্র(ান্ত করেছে কবির হৃদয়,অধিকন্তু মস্তিষ্ক । তাই আমরা সবিস্ময়ে 'ফিরে এসো, চাকা'-র বিভিন্ন কবিতায় দেখি, বেদনার্ত কবি অনেক সময় নানা বিভ্রমকে চিহ্নি(ত করেছেন এবং পর(ণেই সেই বিভ্রমকে ভেদ করেছেন বিজ্ঞানের সত্য দিয়ে। পুরো রসায়নটিই বাংলা কবিতার পাঠকদের কাছে নতুন। কবির চোখে তাঁরাও জেনে গিয়েছেন চেনা দৃশ্যাবলীর মধ্যে মিশে থাকা এক অতিরিক্ত(সত্যকে।''

এমনই চমকপ্রদ বিনয়ের কবিপ্রতিভার অনন্য মহিমা।

।। ৫।।

বিনয়ের কবিতার মধ্যে অন্তরালবর্তী বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে ইংরেজ রোমান্টিক কবি শেলীর 'Ode to the West Wind' কবিতাটির কোথায় যেন এক অদ্ভুত মিল আমাদের মনে এসে যায়। বিনয় তাঁর 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যের ৫৩ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন —

''উষ(, ি(প্ত বাতাসেরা, মেদুর মেঘেরা চিরকাল
ঊর্দ্ধমুখী(অবয়বে অমেয় আকাংখা তুলে নিয়ে
ঘুরেছি অনেক কাল পর্বতের আশ্রয় সন্ধানে(
পাইন অরণ্যে, শ্বেত তুষারে-তুষারে লীলায়িত

হতে চেয়ে দেখি কারো হৃদয়ে জীবন নেই(তাই
জলের মতোন বয়ে চ'লে যাবো ত্র(মশ নিচুতে।''

আর অনুরূপভাবে, শেলী তাঁর 'Ode to the West Wind' কবিতায় পশ্চিমী বাতাসকে বিপ-বের ভাবনায় বিজ্ঞানচেতনাতে ভর ক'রে আহ্বান জানিয়েছেন(জীর্ণ পুরানোকে ঘুচিয়ে দিয়ে নতুনকে আবাহনের জন্য । পশ্চিমী বাতাসের জয়গানে মুখর শেলী তাঁর কবিতায় বলেছেন —

"...Thou dirge
of the dying year, to which this closing night
will be the dome of a vast sepulchre
vaulted vapours, from whose solid atmosphere
Black rain, and fire, and hail, will burst : Oh, hear !"

এখানে স্পষ্টতই বোঝা যায়, আলোচ্য দুই কবিই তাঁদের কবিতার মধ্যে শৈল্পিক মুন্সিয়ানায় বৃষ্টিপাতের মত প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তা অবশ্যই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনার সূত্রে আসেনি, এসেছে কবিতার অনুষঙ্গের প্রয়োজনে মিলিয়ে মিশিয়ে।

বিনয় নিজস্ব বিজ্ঞানবোধের অতিচেতনায় সকল জ্ঞানকে একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে দন্ডাকারে রূপ পেতে দেখেন। তিনি নিজে যার নাম দেন জ্ঞানদন্ড। কবি কল্পনায় ধরা দেয় জ্ঞানদন্ডের স্বরূপ —

''যাদের অনেক জ্ঞান, অনেক প্রকার জ্ঞান জমা হয়ে শরীরে রয়েছে
তাদের সকল জ্ঞান একসঙ্গে ধ'রে নিলে, ডান হাতে ধ'রে নিলে দেখি
কেবল একটিমাত্র দন্ড ব'লে মনে হয়, সব জ্ঞান মিলে দন্ড হয়।
বহুকাল ধ'রে আমি জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি — সকল বৈশিষ্ট্য ভেবে দেখে
জ্ঞানের সমস্ত রূপ — রূপটিকে দন্ড বলি, জ্ঞানীদের জ্ঞানদন্ড বলি।''

বিজ্ঞানের এক স্বকীয় বোধ বিনয়কে এইরকম কবিতা সৃষ্টিতে প্রাণিত করে। বিনয়ের কবি প্রতিভার এই ধরণটিকে ব্যাখ্যা ক'রে কবি বীরেন্দ্রনাথ র(িত তাঁর 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা পাঠ' প্রবন্ধে বলেছেন —

''তাঁর (বিনয়) বস্তু নিরী(ার ধরণ, এবং আত্মবিশ্লেষণের প্রকৃতি, স্বরূপত যুক্তি(যুক্ত(ও ন্যায়সম্মত। কাব্য অভিজ্ঞতার (ে ত্রে, বোধ ও পর্যবে(ণের সূত্রে তিনি বিশেষ (Particular) ও সামান্যের (Universal) যথাত্র(মিক প্রস্তাব-সিদ্ধান্তত্র(মটি অনুধাবনের যে পদ্ধতিগত প্রয়াস পান, তা যথার্থই তাঁর কবি মানসতায় বিজ্ঞানচেতনার পরিচয়।''

কবি ভাবনায় গণিত এতটাই সর্বাত্মক যে, বিনয় তাঁর প্রাণপ্রিয় কবিতা ও গণিতকে এই জ্ঞানদন্ডের উভয় প্রান্তে রূপ পেতে দেখেন। তিনি মোহিত হয়ে যান এই দন্ডের

একপ্রান্তে গণিত, আর অপর প্রান্তে কাব্য-কবিতাকে প্রত্য(করতে পেরে —

''আমাদের জ্ঞানদন্ডে একপ্রান্ত শুদ্ধতম গণিত নামক শাস্ত্র আর
অন্যপ্রান্ত আমাদের সকলের পরিচিত কবিতা ও কাব্য — কাব্যগুলি।''

গণিত আর কবিতা এইভাবে বিনয়ের ভাবনায় প্রায় সমগোত্রীয় হয়ে যায়। আর তাই তিনি কোথাও কোথাও কবিতার যুক্তি(ত্র(মকে সাজিয়ে দেন যেন গাণিতিকের ধরণে। এমনই বিনয়ের কবি ভাবনার স্বাতন্ত্র্য।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সিকদার অশ্রুকুমার ঃ হাজার বছরের বাংলা কবিতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি,
কলকাতা — ২০।
২। দেশ (পা(ক), হর্ষ দত্ত (সম্পা), এ.বি.পি. প্রাঃ লিঃ ৭৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২রা জানুয়ারি, ২০০৭।
৩। মরম, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, বিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪১৩। মরম (সুজিত বি(াস সম্পা.)।
৪। বিনয় ঃ কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড) ঃ তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী, ২০০৬ বইমেলা, প্রতিভাস।
৫। মজুমদার বিনয় ঃ কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ, বইমেলা-২০০৭। প্রতিভাস।
৬। মুখোপাধ্যায় মনোজ ঃ প্রথম প্রকাশ ২৩ জুন, ২০০১, বামা পুস্তকালয়।
৭। দে বিষু(ঃ বিষু(দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, অষ্টম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং।
৮। দত্ত সুধীন্দ্রনাথ ঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং।
৯। চক্র(বর্তী সুমিতা ঃ আধুনিক কবিতার চালচিত্র, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৬, সাহিত্যলোক।
১০। যোগসূত্র বিনয় মজুমদার সংখ্যা, যোগসূত্র (বিনয় ঘোষ সম্পা) জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৩।
১১।আচার্য্য দেবেশকুমার ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিকযুগ (১৯৫০-২০০০) প্রথম প্রকাশ, ১৮ আগষ্ট, ২০১০, ইউনাউটেড বুক এজেন্সি।
১২।কবিতা প্রতিমাসে, উৎসব সংখ্যা, ২০০৭, প্রতিভাস (বীজেশ সাহা সম্পা.)।
১৩।Palgrave's golden Treasury, 19th Impression, 1997, Oxford University Press.
১৪।নৌকো, ২০ বছর পূর্তি উৎসব সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০০৪, নৌকো (অমলেন্দু বি(াস সম্পা.)।
১৫।কবিতা প্রতিমাসে, ডিসেম্বর ২০০৬, প্রতিভাস (বীজেশ সাহা সম্পা.)

■ ড. সুদীপ্ত ঘোষ —প্রাবন্ধিক

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol. III Issue-VI

নিত্যানন্দ মণ্ডল

শঙ্খ ঘোষের কবিতা ঃ 'অন্ধবিলাপ'

কবি শঙ্খ ঘোষ ১৯৩২ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের চাঁদপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। অধ্যাপনা দিয়ে কর্ম জীবনের শুরু একাধিক স্থানে অধ্যাপনা করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমসাময়িক কবি, সমসময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রাজনৈতিক ঘুর্ণাবর্তের অস্থিরময় সময়কে তিনি তাঁর কবিতাতে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেই সাথে পৌরাণিক ভাবাবেগকে তাঁর কবিতার কাহিনি নির্মাণেও তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের হদিশ দিয়েছেন নিজেই। তাই তার স্বীকাররোক্তি—'আগস্ট মাসের এক সন্ধ্যাবেলা, কলেজ থেকে ফিরবার পথে, মনে পড়ল হঠাৎ গীতার প্রথম লাইন। আর তার 'সমবেত' শব্দটা পর্যন্ত পৌঁছেই যেন দেখতে পেলাম এক সমাবেশের ছবি, আর ওয়ালের গান্ধীমাঠ, হ্যাঁ মনে হলো সেও এক ধর্মক্ষেত্র। মনে পড়ল ভূমিসেনা ব্রহ্মর্ষিসেনা লোরিক সেনাদের নাম। মনে হলো, অন্ধ অন্ধ, ইতিহাসকে যে দেখতে পায় না সে তো অন্ধই। গীতার প্রথম শ্লোকের অনুবাদটা পালটে যেতে লাগল ভিতরে ভিতরে। বাড়ি ফিরে এসে, দুদিন ধরে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেল নতুন একটা লেখাকে। সবসময়েই তখন মনে মনে ফিরছে এই ধর্মক্ষেত্র। রণক্ষেত্র।" (কবিতার মুহূর্ত ঃ শঙ্খ ঘোষ, পৃঃ ৯৮)

স্বভাবতই শঙ্খ ঘোষ সমসময়ের ঘটনাধারাকে অবলোকন করেছিলেন। তাঁর সেই দেখা, জানা শোনার ক্ষেত্র থেকে হঠাৎ করে তিনি মুখ ঘুরিয়ে পৌরাণিক ঘটনাধারার অবতারনায় রত হন। তাঁর মনে ধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তার সাথে সমসময়ের ঘটনাধারার যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন। যে চেষ্টা থেকে তিনি রচনা করলেন 'অন্ধবিলাপ' কবিতা। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, বিভিন্ন পুরাণ অনুসঙ্গকে একছত্রে বসাতে চেষ্টা করলেন। আসলে ভারতীয় পুরাণ কাহিনি বারে বারে কবিদের হাতে পড়ে নতুনভাবে উঠে এসেছে। শঙ্খ ঘোষের কবিতাতে তা আর একবার নতুন ভাবে ধরা দেয়। শঙ্খ ঘোষের জানা শোনা দেখা ঘটনাধারা তাই এককথায় অনবদ্য। আর তাঁর সৃষ্টি রহস্যকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

মহাভারতের এক প্রধানতম চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ বলে যিনি সকলের কাছে পরিচিত।

সেই পরিচিত ব্যক্তিত্ব শঙ্খ ঘোষের হাতে পড়ে ক্রমশ পাল্টে যেতে থাকে। মহাভারতের চরিত্র শ্রীমদ্ভভাগবদগীতাতে একভাবে পরিবেশিত হয়। আবার শঙ্খ ঘোষের হাতে যেন তার নবজন্ম ঘটে। শ্রীমদ্ভভাগবদগীতার প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের অভিব্যক্তি—

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব ঃ।
মামকা ঃ পাণ্ডবাশ্চৈর কিমকুর্বত সঞ্জয়।"

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যভাগের উত্থিত ভূমির নামই হল ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। বর্তমানে দিল্লী নগরী এখানে অবস্থিত। যা ব্রহ্মাবর্ত নামেও পরিচিত। এই কুরুক্ষেত্র পূর্বে সমস্ত পঞ্চক নামে পরিচিত ছিল। কথিত আছে যে, পরশুরাম এই স্থানে শোণিত দ্বারা পিতৃতর্পণ করেছিলেন। এই স্থানে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ কুরুরাজ কর্ষণ করে উর্বরা ভূমিতে পরিণত করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র। দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমে কুরুরাজকে কর্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু কুরুরাজ তাতে নিবৃত না হয়ে কর্ষণ করেন। তার দৃঢ়সংকল্প ও অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে বর প্রদান করেন যে এই স্থানে যে তপস্যা করতে করতে অথবা যুদ্ধ করে প্রাণ ত্যাগ করবে সেই স্বর্গ লাভ করবে। এই বর লাভের পর কুরুরাজ হাল চালনা বন্ধ করেন। সেই থেকে এই স্থান ভারতের প্রাচীন তীর্থস্থান ও পুণ্যভূমি রূপে পরিচিত। দান-ধ্যান, তপস্যা ও যজ্ঞ প্রভৃতি কাজের জন্য অতি উত্তম স্থান এটি। কুরুক্ষেত্র সম্পর্কে "জাবালোপনিষদে " পাই "যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং যজনং সর্বেষাং ভূতানা ব্রহ্মসদনয়।" অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র দেবতা গণের নিকট দেবজন স্বরূপ এবং অন্যান্য প্রাণিবর্গের নিকট ব্রহ্ম বা মোক্ষলাভের স্থান। শতপথ ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়—

"তস্মাদাহু ঃ কুরুক্ষেত্রং দেব জনম"—বর্তমানে কুরুক্ষেত্র আপামর ভারতবাসীর কাছে একটি প্রধান তীর্থভূমিরূপে পরিচিত।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়ার কারণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। অথচ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্পর্কে তার জানার কৌতূহল ছিল প্রবল। সেই কারণে মহাঋষি ব্যাসদেব তাকে দিব্যদৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে রাজী ছিলেন না। কারণ তাঁর আত্মীয়স্বজন পুত্রে পরিজনদের মৃত্যু দৃশ্য স্বচক্ষে দেখা তার পক্ষে কষ্টকর ছিল। সেই কারণে তার অমাত্য তথা মন্ত্রী সঞ্জয়কে ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন। এই দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থেকেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা অবলোকন করতে সমর্থ হন। সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে যা কিছু দেখত, শুনত ও জানতে পারতো তাই ধৃতরাষ্ট্রকে সবিস্তারে বর্ণনা করতো। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ তথা তার পুত্রের পক্ষের বীর গণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণ তথা পাণ্ডুপুত্রের পক্ষের বীরগণ ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে

সমবেত হয়ে কি করছে। এই প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় যা বলেছিলেন তাই দিয়েই শ্রীমদ্ভভাগবতগীতার সূচনা।

ধৃতরাষ্ট্র হয়তো ভেবেছিলেন যে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবগণ প্রবেশ করলে তাদের মনোভাব পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে তারা যুদ্ধ নাও করতে পারে। কিংম্বা পাণ্ডুর পুত্রগণের হৃদয়ে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হতে পারে। ফলে পাণ্ডবরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি যোদ্ধাগণের হৃদয়ে ধর্মভাবের আধিক্য হেতু তারা যুদ্ধ না করলে অনায়াসে দুর্যোধনের বাসনা পূরণ হতে পারে। কী সে কারণে ধৃতরাষ্ট্র অতি উদ্গ্রীব হয়ে সঞ্জয়ের কাছে জানতে চাইলেন যে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধারা কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল না তারা যুদ্ধ ত্যাগ করে ধর্মের পথ অবলম্বন করলো।

ধৃতরাষ্ট্রের মনের গহনের এই অভিসন্ধির সূত্র ধরে কবি শঙ্খ ঘোষ রচনা করলেন তার 'অন্ধবিলাপ" কবিতাটি। যেখানে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন—

"ধর্মক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে সমবেত লোকজনেরা
সবাই মিলে কী করল তা বলো আমায় হে সঞ্জয়
অন্ধ আমি দেখতে পাইনা আমিই তবু রাজ্য শিরে
কাজেই কোথায় কী ঘটছে তা সবাই আমায় জানতে হবে।"

—এই জানার আগ্রহ থেকেই ধৃতরাষ্ট্র তার মনের সমস্ত দূরভিসন্ধির অলিগলি পথের সন্ধান দিয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও হস্তিনাপুরের বর্তমান রাজা। তার কথা কেউ পালন করে না তবু তার দম্ভ ষোল আনা বজায় আছে। প্রজারা তাকে অন্ধ বলে বিদ্রুপ করলেও তার গায়ে লাগে না। রাজ্যের অবস্থা বা দিনদিন হীন থেকে হীনতর পথে এগোচ্ছে তবু ধৃতরাষ্ট্র রাজা বলে গর্ববোধ করেন।

আসলে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রস্নেহে আরো অন্ধ হয়ে গেছে। তাই দুর্যোধনাদি শত পুত্রের শত-সহস্র অন্যায় তিনি মুখবুজে সহ্য করেন বলা ভালো প্রশ্রয় দেন। নিজেও পুত্রদের শাসন না করে হিংসার আগুনে ঘৃতাহুতি প্রদান করে অন্যায়ের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি জ্বালাতে তৎপর হন। শুধু তাই নয় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের নিজের মতো করে গড়তে পেরেছেন বলে গর্ববোধ করেন। তাঁর পত্নী গান্ধারীর অভিসন্ধিকেও বাস্তবে পরিণত করতে পুত্ররা সর্বদা প্রস্তুত। শুধু তাই নয় এই কাজকে সুষ্ঠ রূপে সুসম্পন্ন করার জন্য মামা শকুনির অবস্থানও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

'বিনযুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্রমেদিনী"—এই উক্তির সূত্র ধরে শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেন—

"সামান্য এক ছটাক জমি ছাড়বে কেন আমার ছেলে আমার সঙ্গে ভূমিসেনা আমার সঙ্গে ভূস্বামীরা।"

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পক্ষে সমস্ত বড়োবড়ো রথি মহারথি তথা কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, বিদুর, কর্ণ প্রভৃতিরা থাকতে দুর্যোধনের তো কোন ভয় থাকার কথা নয়। সমস্ত রথি মহারথিরা তার পক্ষে থাকার কারণে দুর্যোধন শত সহস্র অন্যায় করার সাহসও পেয়েছে।

ফলে শঙ্খ ঘোষের ধৃতরাষ্ট্র বলতে পারেন—

"অধর্ম? কে ধর্ম মানে? অমার ধর্ম শত্রু নাশন
নিরস্ত্রকে মারব না তা সবসময় কি মানতে পারি?"

পাণ্ডবরা তাদের নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে যুদ্ধ করেছে। আর ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত অন্যায়কে আশ্রয় করে অধর্ম করে যাচ্ছে। তার রাজ্য শাসন, তার প্রজাপালন, তার শাসন দমন নীতি সবই হিংসার ও ঈর্ষার বশবর্তী। তবে ধৃতরাষ্ট্র একোন্ ধর্ম পালন করছে। ন্যায় ধর্ম না রাজধর্ম এই প্রশ্ন বারবার উঁকি দেয়। আর শ্রীমদ্ভাগতবতগীতার দুষ্টের দমন ও সৃষ্টের পালনের সেই নীতি বাক্য হয়তো শ্লথ হয়ে পড়ে।

শঙ্খ ঘোষ পুরাণের এই প্রসঙ্গের সাথে ইতিহাসকে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। জেনারেল জায়ারের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল পঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ান ওয়ালাবাগে ঘটে গেল এক নারকীয় হত্যা কাণ্ড, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চনার ইতিহাস এটি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে শিখ, গোর্খা, বালুচি ও রাজপুতরা জড়ো হলে জালিয়ানাওয়াবাগে তিন দিক ঘেরা জায়গায় ব্রিটিশ নিয়োজিত ভারতীয় পুলিশ নির্বিচারে ১৬৫০ রাউণ্ড গুলি চালনা করেন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৩৭৯ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং ১১০০ জন মানুষ আহত হন। আর বেসরকারী হিসাব অনুসারে কমপক্ষে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগে। এখানে কোন্‌ধর্ম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে প্রশ্ন বারবার আমাদের মনে জেগে ওঠে অথচ কোন সদুত্তর মেলে না।

প্রায় সম সময়ে বিহারের আরওয়ালে তিনদিক ঘেরা গান্ধীমাঠে, ১৯শে এপ্রিল ন কাঠা জমির জন্য তেইশজন মানুষকে গুলি করে মেরে ছিল বিহার পুলিশ। সরকার ও পুলিশের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে সামন্ত শ্রেণীর বর্বরতা যেখানে পৌঁছে গিয়েছে তাতে একটি মাত্র কুরুক্ষেত্র নয় বহু বহু কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। আর কৌশল করে তাদের গুণ্ডা বাহিনীর নাম রাখা হচ্ছে ভূমি সেনা, ব্রহ্মর্ষি সেনা, লোরিকসেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্র সেন। স্বাভাবিক অধিকারকে লুণ্ঠন করতে যাদের জুড়ি মেলা ভার। বিহারের পুলিশ প্রধানের ঘোষণা ছিল— ডাইনে বাঁয়ে নয়, প্রতিবাদকারীদের একেবারে বুক লক্ষ্য করেই ছুড়তে হবে গুলি। প্রতিবাদের একটি গুলির বদলে পুলিশের দশটি গুলি

চাই। এই ছিল ঘোষণা।" (কবিতার মুহূর্ত শঙ্খ, ঘোষ অনুষ্টুপ পকাশনী, ২ই নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯ পৃঃ ৯৮)

আর দার্শনিক কবি শঙ্খ ঘোষের অভিব্যক্তি "তিন দিকে তিন দেওয়াল ঘেরা সাতান্ন রাউন্ড গান্ধী মাঠে ভিজল মাটি ভিজল মাটি ভিজুক মাটি রক্তপাতে।"

যে কথার কোন প্রমাণ থাকে না। কাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। নিজেই যেখানে শাসক ও শোষক। সেখানে কাকেবা জবাবদিহি করতে যাবে।

"ন্যাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়" এর মতো বর্তমান অবস্থা ধৃতরাষ্ট্রের। তাই কোন কিছুতেই আর তার কিছু যায় আসে না। নিজের এবং নিজ পুত্রদের সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মবিশ্বাস একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তাই ধৃতরাষ্ট্রের সদর্প উক্তি—

"এই যে আমার একশো ছেলে—কেউ বশে নয় এরা আমার
এই রকমই অন্ধ আমি, আমিই তবু রাজ্য শিরে।"

—তবু ধৃতরাষ্ট্র গর্ব করে বলে। হে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র কি ঘটছে তা আমায় বল। আমার পুত্ররা হিংসার পথ অবলম্বন করে আর কতটা অগ্রসর হতে পারল তা আমাকে শোনাও, শুধু তাই নয়। ক্ষমতাহীন আমি, অন্ধ আমি তবু আমি, আমিই। আমার তুলনা কারও সাথে করা চলবে না। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। তবু শেষের সে দিন যে ভয়ংকর তা ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পেরে আঁতকে ওঠে। মনে সাহস যোগাতে থাকে। আর বুকে বল বৃদ্ধি করার জন্য আত্মতৃপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে চায়। সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন কবি শঙ্খ ঘোষের এই উপস্থাপনরীতি মানুষের চোখ খুলে দেয়, পুরাণের অনুষঙ্গে বাংলা কবিতা ধারালো হয়ে ওঠে। যে কবিতাকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাজনৈতিক লড়াইয়ের অস্ত্র করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ পুরাণ অনুষঙ্গকে সেই তাৎপর্যে কবিতাকে করেছেন অনন্য।

■ ড. নিত্যানন্দ মণ্ডল— অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক